বন্ধুত্ব
প্রেম
বিয়ে

জানবেন—জীবনের প্রতিটি সংকটে সম্পর্ককে
প্রাণবন্ত ও কল্যাণময় রাখার সহজ প্রক্রিয়া

মহাজাতক

নারী-পুরুষের সম্পর্ক জটিল ও রহস্যময়। ৩৩ বছর ধরে কোয়ান্টামের শত শত প্রোগ্রামে সদস্যদের করা অসংখ্য প্রশ্নের মধ্য থেকে এই সম্পর্কের নানা পর্যায়—বন্ধুত্ব, প্রেম ও বিয়ে বিষয়ক বাছাইকৃত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এ বইতে। এ থেকে নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিণতি ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকবে আপনার সামনে।

জীবনের প্রতিটি সংকটে সম্পর্ককে প্রাণবন্ত ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কী তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ভালবাসা, সমমর্মিতা ও সুখে ভরে উঠবে আপনার জীবন।

মহাজাতকের লেখা অন্যান্য বই

- সাফল্যের চাবিকাঠি কোয়ান্টাম মেথড
- শুদ্ধাচার
- আত্মনির্মাণ
- কাজ প্রেম দেশ
- জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
- কোয়ান্টাম ভাবনা ফিউশন (অণু বই)
- নিত্যদিন শত টিপস প্যারেন্টিং (অণু বই)
- আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
- 1001 Autosuggestions to change your life

বন্ধুত্ব প্রেম বিয়ে

বন্ধুত্ব প্রেম বিয়ে

মহাজাতক

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

বন্ধুত্ব প্রেম বিয়ে

মহাজাতক

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম । কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮
E-mail : info@quantummethod.org.bd

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক

প্রথম প্রকাশ

নভেম্বর ২০২৫

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ
ইসলাম ভবন (২য় তলা)
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৪৫০ টাকা
[এ বই থেকে প্রাপ্ত আয় সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত]

ISBN : 978-984-35-8445-8

Bandhutta Prem Biye
(Friendship Love Marriage)

By : **Mahajataq**

Published by

Quantum Foundation
quantummethod.org.bd

Price : $15
[All earnings dedicated to charity]

উৎসর্গ

মহাজাগতিক সফরসঙ্গী
নাহার আল বোখারী
ও তার সহযোদ্ধাদের—
যাদের আন্তরিক প্রয়াসে
জীবনকে উদযাপন করতে
শিখেছে লাখো মানুষ।

সূচিপত্র

বন্ধুত্ব	■	১৩
বন্ধুত্ব ॥ সীমা কতটুকু?	□	১৫
বন্ধুত্ব—বিপরীত লিঙ্গের সাথে	□	২৭
ডিজিটাল মরীচিকা	□	৩৩
প্রেম	■	৫১
প্রেমে পড়া	□	৫৩
প্রেমে ব্যর্থ	□	৮৪
প্রেম করে বিয়ে	□	৯০
প্রণয় থেকে পরিণয়	□	১০০
বিয়ে	■	১০৩
বিয়ে কী? কেন?	□	১০৫
পাত্র/ পাত্রী নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গি	□	১১৭
ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিয়ে	□	১৩২
নিকটাত্মীয়ের সাথে বিয়ে	□	১৩৩
প্রবাসী পাত্র/ পাত্রী	□	১৩৪
বিয়ের বয়স	□	১৩৫
পাত্র-পাত্রীর বয়সের ব্যবধান	□	১৪২
বিয়ের মনছবি	□	১৪৬
বিয়ের সিদ্ধান্ত	□	১৪৯
বিয়ের ব্যাপারে দ্বিধা	□	১৬৭
বিয়ে ॥ মা-বাবার দায়িত্ব	□	১৭২
মা-বাবার অমতে বিয়ে	□	১৮১
এনগেজমেন্ট	□	১৮৬
বিয়ের খরচ ॥ ভ্রান্ত বনাম সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি	□	১৮৮
প্রসঙ্গ যৌতুক	□	১৯৬
দেনমোহর/ কাবিন	□	২০০
জীবনসঙ্গী ও কোয়ান্টাম	□	২০৬
বিয়ে হচ্ছে না	□	২০৭
বিয়ে না করলে	□	২২০
প্রসঙ্গ বহুবিবাহ	□	২২৩
পরকীয়া	□	২৩০
ডিভোর্স	□	২৪৮
বিবিধ	□	২৬২
বিবাহ কণিকা	□	২৮১
বিয়ের কিছু শুদ্ধাচার	□	২৮৪

লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন ...

অন্ধকারকে মানুষ ভয় পায়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। তাই অজানা আশঙ্কা চেপে বসে তার মনে। ভোরের আলোয় আঁধার কাটতে শুরু করলে অজানা আশঙ্কাও কেটে যায়। সে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। নেমে পড়ে কাজে। এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

সকল অন্ধকারের নিকৃষ্ট অন্ধকার অবিদ্যা। অবিদ্যা জন্ম দেয় নেতিবাচকতা অশান্তি লোভ লাম্পট্য শোষণ বঞ্চনা প্রতারণা ব্যর্থতা রোগ শোক হতাশা। অফুরন্ত সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেও তারুণ্য ও যৌবনের শক্তি পরিণত হয় প্রতারক শোষক লম্পট শোষিত বা দাসে।

অবিদ্যার অন্ধকার দূর হয় বিদ্যার আলোয়। বিদ্যার সূচনা হয় মুক্ত বিশ্বাস থেকে। আর মুক্ত বিশ্বাসের পথে অন্তরায় হচ্ছে অহেতুক প্রশ্ন। শয়তানের কৌশল হচ্ছে বিশ্বাস থেকে বিরত রাখতে না পারলে সংশয় সৃষ্টি করে দেয়া। আর অহেতুক প্রশ্ন ঢুকে পড়ে মানুষের স্বভাবজাত কৌতূহল বা জানার আগ্রহের সদর দরজা দিয়ে। সৃষ্টি হয় সংশয়।

অবিদ্যার অন্ধকার দূর করার জন্যেই কোয়ান্টাম ডাক দিয়েছে মুক্ত বিশ্বাসের। বলেছে, হে মানুষ! শক্তি আপনার মধ্যেই রয়েছে। অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করুন। কোনো অভাব থাকবে না। যা দেখে আপনি বিস্মিত হন, সে বিস্ময় সৃষ্টি করার ক্ষমতা আপনার মধ্যেই আছে।

হাজারো মানুষের কৌতূহল আর আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি এসেছে অসংখ্য প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নগুলোর জবাব থেকে দ্বিধা সংশয় ভেসে গেছে বাস্তবতা ও বিদ্যার আলোয়। কোয়ান্টাম মেথড চর্চার গত ৩২ বছরের এমনি অসংখ্য প্রশ্নের জবাব নিয়েই এ বই। আপনার মধ্যে সন্দেহ সংশয় যদি কিছু থাকে, তা দূর হবে অনায়াসে। কৌতূহল ও জানার আগ্রহ পাবে পূর্ণ তৃপ্তি। উপলব্ধি করবেন জীবনের আসল সত্য। লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন—

আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী।
আমি পারি আমি করব।
আমার জীবন আমি গড়ব।

এই সিরিজের পরবর্তী বইগুলো হচ্ছে—

পরিবার

বইটিতে পাবেন পরিবার এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার উত্তর। বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে হাজার বছরের সাধকদের জ্ঞানের নির্যাস আর আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে। এসব উত্তরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আপনাকে নৈতিকতা, ধৈর্য ও সুবিবেচনার সাথে পারিবারিক যে-কোনো সমস্যা-সংকট থেকে উত্তরণের উপায় জানতে সহায়তা করবে সুস্পষ্টভাবে। সূত্রগুলোর প্রয়োগ এবং চর্চায় আপনার পরিবার হয়ে উঠবে সুখী, সার্থক ও আলোকিত।

প্যারেন্টিং

এ বইয়ে পাবেন প্যারেন্টিং সংক্রান্ত প্রশ্নাবলির উত্তর। এ থেকে সন্তান লালনের নানা দিক এবং করণীয়-বর্জনীয়গুলো আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ‘মাইন্ডফুল প্যারেন্টিং’-এর পরীক্ষিত সাফল্যসূত্র অনুসরণ করলে আপনার সন্তান গড়ে উঠবে অনন্য মানুষরূপে। আর আপনার জীবনের প্যারেন্টিং অধ্যায়টিও হয়ে উঠবে সফল ও আনন্দময়।

প্রেমময় জীবনের পথ-নকশা

সবাই ভালবাসা পেতে চায়। চায় বন্ধুত্ব ও প্রেমে ভরপুর জীবন। অর্থাৎ মানুষ সুখী হতে চায়। কেউ হয়। কেউ হয় না। কেউ আবার হয়েও তা ধরে রাখতে পারে না। কেন? আসলে কেউ সুখ খোঁজে অর্থে, কেউ ক্যারিয়ারে, কেউ বন্ধুত্বে, কেউ প্রেমে, কেউ বিয়েতে, কেউ পরিবারে, কেউ-বা ডিজিটাল দুনিয়ায়। অনেকে আবার ভাবে—সে এমনি এমনি সুখী হয়ে যাবে। সুখ এসে ধরা দেবে নিজেই। কিন্তু সে বোঝে না—সুখ হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া, যেমন দুঃখও একটা প্রক্রিয়া। সুখের প্রক্রিয়ায় সচেতনভাবে প্রবেশ না করলে সুখী হওয়া যায় না।

সুখের একটা বড় উৎস পারিবারিক শান্তি এবং সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সভ্য সমাজে বিয়ের মতো সামাজিক অঙ্গীকার বা চুক্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। বিয়ে মানে হলো, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ শ্রদ্ধা ভালবাসা সমঝোতা বিশ্বস্ততা এবং একে অপরের সাথে মানিয়ে চলা। মানুষের দৈহিক, মানসিক, বংশধারা রক্ষা এবং আত্মিক—এ চারটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সমন্বিত করার প্রয়োজন পূরণ হয় বিয়ের মধ্য দিয়ে।

আসলে শিক্ষা ক্যারিয়ার বন্ধুত্ব প্রেম বিয়ে পরিবার—এ সবই জীবনের একেকটা অংশ। এগুলো জীবনের প্রয়োজন বা জীবনধারণের উপকরণ মাত্র। কিন্তু ভোগবাদী পণ্যদাসত্ব, সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়া ও ডিজিটাল আগ্রাসনের এই যুগে ভোজন এবং জৈবিক চাহিদা পূরণ—শুধু এগুলোকেই যেন জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এরই ফলস্বরূপ বন্ধুত্ব, প্রেম ও বিয়ের ব্যাপারে অযৌক্তিক প্রত্যাশা, ভ্রান্ত ধারণা এবং অবিদ্যার সয়লাব চারদিকে।

এখনকার প্রেম পরিণত হয়েছে প্রেমরোগে নয়তো প্রেমাসক্তিতে, যা মাদকাসক্তির মতোই বিধ্বংসী। 'প্রেম' এখন যথেচ্ছ যৌনাচার, পরকীয়া আর লাম্পট্যের আরেক নাম। এই মোহগ্রস্ততায় আচ্ছন্ন ছেলেমেয়েরা ধ্বংস করছে নিজেদের ভবিষ্যৎ, তলিয়ে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণহীন সম্পর্কের চোরাবালিতে।

আর দায়িত্বশীলতার অভাব এবং ঋণ করে হলেও বিয়েতে লোক দেখানো চাকচিক্য ও অপচয়ের প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দাম্পত্য পবিত্রতা। যা হওয়ার কথা ছিল সুখী পরিবারের সূত্রপাত, তা-ই হয়ে উঠছে চরম অশান্তির কারণ। প্রেমের সাময়িক মোহ কেটে যাওয়ার পর সম্পর্কগুলো হয়ে উঠছে বিষাক্ত, বেজে উঠছে ভাঙনের সুর। আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে পারিবারিক সহিংসতা, নিগ্রহ এবং ডিভোর্সের হার।

বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স অনুযায়ী, ২০১১ সালে দেশে ডিভোর্সের হার ছিল প্রতি হাজারে ০.৭, যা ২০২১ সালে বেড়ে হয়েছে প্রতি হাজারে ১.৪। ২০২৩ সালে গ্রামাঞ্চলে প্রতি হাজারে ১.৫টি আর শহরে প্রতি হাজারে ১টি ডিভোর্সের ঘটনা ঘটেছে। এ-ছাড়া ২০২২ সালে রাজধানীতে প্রতি ৪০ মিনিটে ১টি করে ডিভোর্স হয়েছে। ডিভোর্সের প্রবণতা বেড়েছে গ্রামেও। রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশন এবং জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে ডিভোর্সের এই চিত্র পাওয়া গেছে।

এই বিপন্ন অবস্থার পুনরুদ্ধারে, বিয়ের আগে ও পরে নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্বাভাবিক সীমা বজায় রাখা এবং দাম্পত্য সুখের জন্যে প্রয়োজন এ সম্পর্কিত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শাশ্বত ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক পুনর্জাগরণ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যদের বিভিন্ন সময়ে করা শত শত প্রশ্নের জবাবে উঠে এসেছে সুখী জীবনের হাজার বছরের পরীক্ষিত সূত্রগুলো। সহজবোধ্য ও বাস্তবসম্মত প্রশ্নোত্তরের সময়োপযোগী এ সংকলনটি প্রেমময় জীবনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই পথ-নকশা।

বন্ধুত্ব

বন্ধুত্ব ॥ সীমা কতটুকু?

প্রশ্ন : আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমার মেয়েবন্ধু যেমন আছে তেমনি ছেলেবন্ধুও আছে। তারা আমার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। শুধু আমার নয়, অন্য মেয়েবন্ধুদেরও সাহায্য করে। তাহলে তারা কি আমার বন্ধু নয়?

উত্তর : বন্ধুত্বের ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের মনে আগ্রহ সৃষ্টির অন্যতম কারণ মিডিয়ার প্রভাব। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। গত ৫০ বছরে ইউরোপ, আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীদের শত শত গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে—বন্ধুত্বের নামে শুরু হলেও সময়ের সাথে সাথে তা প্রেম বা কাম হিসেবে দৈহিক সম্পর্কে গড়ায়।

সাধারণভাবে মেয়েরা যেহেতু সহজসরল, ছেলেরা বন্ধুত্বের টোপ ফেলে তাকে পটাতে থাকে। যে মেয়ে এরকম ফাঁদে পড়েছে, তাকে কাঁদতে হয়েছে। কারণ আমাদের সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিবাহ-বহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ক সমর্থন করে না। তাছাড়া কেউ সহযোগিতা করলেই সে বন্ধু হয়ে যায় না। নিঃস্বার্থ বন্ধু বা সহযোগী পাওয়া এত সহজ নয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই বুঝবেন, সহযোগিতা কর্মজীবনে কতটা থাকে। এমনও দেখা গেছে, বন্ধুকে চাকরির ইন্টারভিউয়ের কথা বলে নি যাতে প্রতিযোগী কম হয়।

আর মেয়েরা একটু হাসি দিলেই অনেক ছেলে সেবা করার জন্যে একপায়ে দাঁড়িয়ে যায়। নোট তৈরি ও সংগ্রহ করা, ফটোকপি করে দেয়ার জন্যে মেয়েরাও অনেক সময় ছেলেদের সাথে সম্পর্ক রাখে। ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সহপাঠীর সাথে সহজ সুসম্পর্ক থাকবে। সুসম্পর্ক মানে প্রেম বা বন্ধুত্ব নয়।

প্রশ্ন : ক্লাসে বিপরীত লিঙ্গের সহপাঠীর সাথে আমাকে যখন গ্রুপওয়ার্ক করতে হয়, তখন আমি তাকে সহপাঠী হিসেবেই দেখছি এবং স্বাভাবিক সুসম্পর্ক বজায় রাখছি। কিন্তু আধুনিক ধারণায় সে-তো আমাকে বন্ধুই ভাবছে। এ-ক্ষেত্রে তাকে কীভাবে বোঝাব?

উত্তর : তাকে বোঝাতে হবে—এটা মনে করা মানে দুর্বলতা আসলে নিজের মধ্যেই। আর আধুনিক ধারণা হলেই যে তা ভালো হবে, কল্যাণকর হবে

তা-ও তো নয়। যেমন, বন্ধুত্ব বা আধুনিক ধারণায় বয়ফ্রেন্ড/ গার্লফ্রেন্ড বলতে তাকেই বোঝায় যার সাথে যৌন সম্পর্ক রয়েছে; যা শুরু হয় তথাকথিত বন্ধুত্বের নামেই। তাই বন্ধু হওয়ার পর মনে হয়—একটু ঘুরে বেড়ানো যাক! একসময় প্রেমের প্রস্তাব এবং এরপর আরো আধুনিক হওয়ার জন্যে শারীরিক সম্পর্ক। এই যদি হয় আধুনিক হওয়ার প্রক্রিয়া, তাহলে কি আপনি তা-ই করবেন?

আসলে ভেড়ার পাল হওয়ার মধ্যে নয়; বরং আধুনিকতা নির্ভর করে একজন মানুষের চিন্তাচেতনা কতটা কল্যাণকামী তার ওপর। যেমন, প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষেরা উলঙ্গ থাকত তাদের পোশাকের কোনো ধারণা ছিল না বলে। কিন্তু এখন ইউরোপ-আমেরিকায় এমন ন্যুড পার্ক বা ন্যুড বিচ রয়েছে, যেখানে মানুষ নগ্ন অবস্থায় যায়। সেখানে এটাই আধুনিকতা। আধুনিকতার নামে তারা আসলে ফিরে গেল সেই অসভ্য, বর্বর যুগেই। তাই কোনোকিছুকে আধুনিক বলা হলেই তা গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় নয়। কাজেই সে আপনাকে ভুল বুঝছে কিনা, রাগ করছে কিনা—এসব আপনার ভাবার কোনো দরকার নেই। তার সাথে স্বাভাবিক সুসম্পর্ক বজায় রাখাই যথেষ্ট।

প্রশ্ন : বন্ধুদের বাজে আড্ডা থেকে দূরে থাকব কেমন করে? নিজের জন্যে ক্ষতিকর জেনেও বন্ধুদের এড়িয়ে যেতে পারি না। পরামর্শ দেবেন।

উত্তর : প্রেম এবং বন্ধুত্ব আমাদের সমাজে অনেক বেশি অত্যাচারিত ও নিগৃহীত শব্দ। একজনের সাথে কথা হলেই কিন্তু সে বন্ধু নয়। বন্ধু সে-ই, যে আপনার জন্যে জান দিতে পারে। যদি এখনকার বন্ধুত্বের বাস্তবতা দেখতে চান তো জান দেয়ার প্রশ্ন উঠলে তথাকথিত এই বন্ধু হয়তো আপনাকেই গুলির সামনে দাঁড় করাবে।

যে-কাউকে বন্ধু মনে করাটা একটা অবিদ্যা। বন্ধু সে-ই হতে পারে যার সাথে আপনার চিন্তা, চেতনা, আদর্শের মিল আছে। কিশোর বয়সে স্কুলের বা মহল্লার সহপাঠী হলেই তাকে বন্ধু মনে করার কোনো কারণ নেই। বন্ধুত্ব সবসময় চেতনা ও আদর্শের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। সৎসজ্ঘ আপনার বন্ধু। বয়স যা-ই হোক, আপনার বন্ধুত্ব হবে সৎসজ্ঘে।

বন্ধুত্ব এমন একটি সম্পর্ক, যার ভিত্তি হলো চেতনা। চেতনার বাইরে যে বন্ধুত্ব, তা প্রয়োজনের। সত্যিকারের বন্ধুত্ব হয় যখন দুজন একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। চেতনার বাইরে বাস্তবে যাদের বন্ধু বলি—এরা বন্ধু নয়,

পরিচিতজন। চেতনার মিল হলে আমরণ বন্ধুত্ব হয়। মৃত্যুর পরেও এ বন্ধুত্বের টান চলমান থাকবে। এ বন্ধুত্ব এমন যে, আপনি আগে বন্ধুর প্রয়োজন দেখবেন, তারপর নিজের প্রয়োজন। একজন বন্ধু আসলে জীবনযুদ্ধে সত্যিকারের সহযোদ্ধা, যে বন্ধুর জীবন রক্ষায় নিজের জীবন বিপন্ন করতে পারে। একজন বন্ধু বা সহযোদ্ধা বন্ধুর জন্যে কতটা করতে পারে ইতিহাসে তার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ম্যাজিনো লাইনে এক প্লাটুন জার্মান সৈন্য হঠাৎ করেই ফরাসি অ্যামবুশের শিকার হলো। একেবারে ঘেরাও হয়ে গেল তারা। তাই কমান্ডার পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত নিল। দুই জন জার্মান সৈনিক ক্রমাগত গুলি করে পুরো দলকে পশ্চাদপসরণের পথ করে দিলো। দুই জন ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল। কমান্ডার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে বেতার যোগাযোগের মাধ্যমে দুই সৈনিককে বলল, আমরা এখন গুলি করে কভার দিচ্ছি, তোমরা ক্রলিং করে পেছাতে থাকবে। দুই সৈনিক বন্ধু ইরিখ এবং হেরমান পিছু হটতে লাগল। একটু আড়াল পেতেই দুজন ভোঁ দৌড়।

হেরমান দলের কাছে পৌঁছার পর খেয়াল হলো, ইরিখ তার সাথে আসে নি। ডাক্তার ব্যান্ডেজ করে দেয়ার পর আহত হেরমান কিছুটা সুস্থ বোধ করার পর কমান্ডারকে বলল, স্যার, আমি ইরিখকে আনতে যেতে চাই। কমান্ডার বললেন, কোনো লাভ নেই। ইরিখ বেঁচে থাকলে নিজেই চলে আসত। শুধু তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করবে। হেরমান বলল, তবুও আমি যাব।

হেরমান পরিখা পার হয়ে একেবারে সামনের সারির কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পেল গুরুতর আহত ইরিখ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পুরো শরীর রক্তে ভিজে গেছে। হেরমান তাকে কোলে করে এনে পরম যত্নে পরিখায় শুইয়ে দিলো। কমান্ডার অচেতন ইরিখকে পরীক্ষা করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বলেছিলাম কোনো লাভ হবে না। সে মারা গেছে। আর তোমার গায়ে আবারো গুলি লেগেছে।

হেরমান বলল, আমার ক্ষতটা সার্থক হয়েছে স্যার। কমান্ডার বললেন, কীভাবে? তোমার বন্ধু তো মারা গেছে! হেরমান তখন বলল, স্যার, আমি যখন বন্ধুর কাছে পৌঁছলাম, তখনও সে বেঁচে ছিল। আলতো করে হাতটা তুলে একটু হেসে বলল, বন্ধু! আমি জানতাম তুমি আসবে। তার ওই হাসি আর কথা সারাজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে আমার।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিন বন্ধু—তিন সাহাবী হারিস ইবনে হিশাম (রা), আয়াস ইবনে আবি রাবিয়া (রা) এবং ইকরিমা ইবনে আবু জেহেল (রা) মারাত্মকভাবে আহত হয়ে রণক্ষেত্রে মৃতপ্রায় পড়ে আছেন। হারিস ‘পানি

পানি’ বলে চিৎকার করে উঠলেন। একজন সৈনিক তার কাছে পানির মশক নিয়ে এলেন। হারিস পানি পান করতে গিয়ে দেখলেন, ইকরিমা পানির মশকের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সৈনিককে বললেন, আমার চেয়ে ইকরিমার পানির প্রয়োজন বেশি, আগে তাকে পানি দাও। সৈনিক পানির মশক নিয়ে ইকরিমার দিকে দৌড় দিলেন।

ইকরিমা পানি মুখে দিতে গিয়ে দেখলেন, আয়াস কাতর চোখে পানির মশকের দিকে তাকিয়ে আছেন। ইকরিমা অনুভব করলেন, পানির তৃষ্ণা ও প্রয়োজন আয়াসেরই বেশি। তিনি সৈনিককে বললেন, আগে আয়াসকেই পানি দাও। সৈনিক পানির মশক নিয়ে আয়াসের কাছে পৌঁছার আগেই আয়াস মারা গেলেন। এরপর পানির মশক নিয়ে ইকরিমার কাছে এসে সৈনিক দেখলেন, তিনিও মারা গেছেন। সৈনিক মশক নিয়ে ছুটে ফিরে এলেন হারিসের কাছে। ততক্ষণে তিনিও মারা গেছেন।

বন্ধুত্ব আসলে সেটাই, যেখানে বন্ধুর প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চেয়েও বড় মনে করা যায়। বন্ধুর জন্যে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করা যায়। আর সেটা তখনই সম্ভব যখন চেতনা ও লক্ষ্য হয় অভিন্ন।

প্রশ্ন : আমার বন্ধুরা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাদেরকে আমার প্রচুর সময় দিতে হয়। তাদের যে-কোনো সমস্যায় আমার ডাক পড়ে, আমি ‘না’ করতে পারি না। এতে আমার পড়াশোনাসহ সব কাজে ক্ষতি হচ্ছে।

উত্তর : যারা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করাটা আত্মঘাতী। কারণ অসৎসঙ্গ বা ক্ষতিকর বন্ধুত্বের কারণেই বহু প্রতিভাবান তরুণ-তরুণী মাদকাসক্ত, ক্যাডার, সন্ত্রাসী, ভ্রষ্টাচারী এবং অপরাধীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ক্ষতিকর বন্ধুত্ব বা অসৎসঙ্গ এমন এক দুষ্টচক্র, যেখানে একবার ঢুকে গেলে সেখান থেকে বের হওয়া খুব কঠিন।

তাই যে-কারো সাথে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হওয়ার আগেই তার দৃষ্টিভঙ্গি, চলাফেরা ও জীবনাচার সম্পর্কে খোঁজ নেয়া উচিত এবং উচ্ছৃঙ্খল হতাশ মিথ্যাবাদী পরচর্চাকারী আত্মগর্বী আড্ডাবাজ নেশাখোর এবং রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

তারুণ্যে বন্ধুদের প্রভাব যেহেতু বেশি পড়ে, তাই সৎ সুশৃঙ্খল মেধাবী এবং একই চিন্তার অনুসারীদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা উচিত। সবার সাথেই স্বাভাবিক সুসম্পর্ক থাকবে, কিন্তু বন্ধুত্ব তাদের সাথেই করবেন, যারা আপনার জ্ঞানার্জনে ও মেধার বিকাশে সহায়ক সৎসঙ্গ হিসেবে কাজ করবে।

প্রশ্ন : আমার খুব কাছের মেয়েবন্ধু ভুল বুঝে দূরে সরে গেছে। সে বয়সে আমার ছোট। আমি তাকে খুব পছন্দ করি। তাকে আমি আমার অবস্থান বুঝিয়েছি। কিন্তু সে বুঝেছে কিনা জানি না। কারণ সে কথা কম বলে। এখন তার জন্যে দোয়া করা ছাড়া আমার কী করার আছে?

উত্তর : সম্পর্ক কখনো একতরফা হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ দুপক্ষের আবেগ, আকর্ষণ এবং আগ্রহের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। কারণ একপাক্ষিক সম্পর্ক আসলে কষ্ট ছাড়া আর কিছু দেয় না। আর একপাক্ষিক সম্পর্ক কখনো ব্যক্ত করাই উচিত নয়। যেমন, একটা ফুলকে ভালো লাগতেই পারে। কিন্তু ফুলটাকে নিজের কাছে রাখতে না পারলে কষ্ট পাওয়ার কোনো মানে নেই।

আপনি দূর থেকে দোয়া করুন, ফুল, তুমি কত সুন্দর! বংশপরম্পরায় এভাবে প্রস্ফুটিত হও! কাছে রাখতে গিয়ে কেন নিজের কষ্ট বাড়াবেন? জীবনটাকে কখনো জটিল করবেন না।

প্রশ্ন : বন্ধুবান্ধব, সহপাঠী, শিক্ষক ও মা-বাবাসহ অনেকের নামে আমার অভিযোগ আছে। কিছু ছেলেবন্ধু খুব ঝামেলা করে আর মেয়েবন্ধু করে হিংসা। আমার মেজাজ খারাপ থাকে সবার ওপর। মনে হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে যে পরিবেশ দরকার তা পাচ্ছি না। এগুলো আমার হতাশার কারণ। কী করলে উপকৃত হবো?

উত্তর : জীবনে সবসময় খেয়াল রাখবেন, কোনো সফল মানুষ কখনো অভিযোগ করে না। বরং লক্ষ্য অর্জনের জন্যে হাসিমুখে পরিশ্রম করে। যে-কোনো প্রতিকূল পরিবেশকে তারা নিজেদের অনুকূলে নিয়ে আসে। কী পাচ্ছে না সেটা নিয়ে তারা কখনো হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয় না, বসেও থাকে না। তাই এখন থেকে অন্যে কী করল সেদিকে কখনো তাকাবেন না। মা-বাবা কী দিচ্ছে বা শিক্ষক ও বন্ধুরা সহযোগিতা করল কিনা, ছেলেবন্ধু বা মেয়েবন্ধু কী ঝামেলা করল, এগুলো ভেবে মনের অফুরন্ত শক্তি ও সময়ের অপচয় করবেন না।

সবসময় নিজের দিকে তাকাবেন। শুধু ভাববেন যে, এই প্রেক্ষাপটে আমি কী করতে পারি? এই প্রতিকূলতাকে আমি কীভাবে জয় করতে পারি? যে বড় হতে চায়, কারো বিরুদ্ধে কোনোকিছুর ব্যাপারে তার কোনো অভিযোগ থাকে না। কারণ অভিযোগকারী কখনো বড় হয় না। যে অভিযোগ হজম করতে পারে, এর প্রতিকার করতে পারে সে বড় হয়।

আমরা যদি নবীজীর (স) জীবন দেখি, তিনি কারো বিরুদ্ধে কখনো কোনো অভিযোগ করেছেন কি? ছোটবেলা থেকে তিনি কি কম অবহেলিত হয়েছেন? কিন্তু কোনো অভিযোগ করেন নি। বরং তিনি সবাইকে সেবা দিয়েছেন, ক্ষমা করেছেন। যতটুকু পারেন সবার উপকার করেছেন। সবার কল্যাণের জন্যে কাজ করেছেন, সঁপে দিয়েছেন নিজেকে। অতএব যত প্রতিকূলতা আছে এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে গ্রহণ করুন। তাহলেই আপনি অনেক বড় হবেন ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখবেন, সবকিছু নিজের অনুকূলে থাকলে আপনি যতদূর এগোতে পারতেন, বর্তমান প্রতিকূলতাগুলো জয় করতে পারলে আল্লাহ চান তো আপনি আরো অনেক দূর যেতে পারবেন।

প্রশ্ন : কিশোর বা তরুণ বয়সে একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে কেমন সম্পর্ক থাকা উচিত?

উত্তর : সুসম্পর্ক থাকবে। বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড শব্দটার মানে আমরা মনে করি বন্ধু। আসলে পাশ্চাত্যে এ শব্দগুলো সেই বন্ধু বা বান্ধবীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যার সাথে বিয়ে-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু আমরা এই অর্থটা না বুঝেই ছেলেবন্ধুকে বয়ফ্রেন্ড আর মেয়েবন্ধুকে গার্লফ্রেন্ড সম্বোধন করে খুব গর্ব নিয়ে ভাবি যে, ইংরেজি বলে খুব স্মার্ট হলাম বোধহয়।

কাজেই তরুণ বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিক সুসম্পর্ক থাকবে। সেটা যদি সহপাঠী হয় তাহলে সহপাঠীসুলভ, প্রতিবেশী হলে প্রতিবেশীসুলভ অথবা আত্মীয়—যে-ই হোক, সম্পর্ক এ প্রেক্ষাপটেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন : আমি যে বন্ধুদের সঙ্গে মিশি, তারা মনে করে, কাউকে আকর্ষণ করতে না পারাটা আমার যোগ্যতার অভাব। এ-ক্ষেত্রে আমার কী করা উচিত?

উত্তর : এ-ক্ষেত্রে আপনার মনে করতে হবে, তারা লেজকাটা শেয়ালের মতো—নিজেরা লেজ হারিয়ে এখন আপনাকেও মন্ত্রণা দিচ্ছে লেজ হারানোর ফাঁদে পা দিতে। বিপরীত লিঙ্গকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা আসলে কোনো মানবীয় বৈশিষ্ট্য নয়, এটা সব ধরনের প্রাণীর একটা সাধারণ জৈবিক বৈশিষ্ট্য। যেমনটি করে থাকে একটি কাক, কুকুর বা ময়ূর।

কিন্তু একজন মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো, সে মনে করে তার গুরুত্ব বা আকর্ষণ নির্ধারিত হবে তার গুণ, যোগ্যতা ও মেধা দ্বারা; তার দিকে বিপরীত

লিঙ্গের কারো তাকানো বা স্বীকৃতির ওপরে নয়। যার অন্তর্গত শক্তির অভাব আছে, সে-ই অন্যের স্বীকৃতি চায় বা বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করাটাকে যোগ্যতা বলে মনে করে।

প্রশ্ন : আমার হীনম্মন্যতা হচ্ছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে। গুরুজী, আমি আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু এই সম্পর্ক কেন যেন কোয়ান্টামের বাইরে হচ্ছে না। আমি যাকে ভালবাসি সে আমাকে সত্যিকারের বন্ধু মনে করে না। মনে মনে অনেক কষ্ট পাই। ব্যাপারটা আমার মা-বাবাকে বলার পর তারা বলে যে, কোয়ান্টামে বন্ধু থাকাই ভালো, কারণ সমচেতনার বন্ধু আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর স্কুলে সমচেতনার বন্ধু পাওয়া কঠিন। দোয়া করবেন, আমি যেন অন্তত কোয়ান্টাম বন্ধুত্ব ধরে রাখতে পারি। আমাদের বন্ধুত্ব যেন আন্তরিকতাপূর্ণ থাকে।

উত্তর : বন্ধুত্ব নিয়েও হীনম্মন্যতা? আসলে বন্ধুত্ব বলেন আর প্রেম বলেন, এটা হচ্ছে দেয়ার নাম। কিন্তু দেয়ার আগে চিন্তা করতে হবে কাকে দিচ্ছেন। অপাত্রে যদি দেন তো আপনাকে হতাশ হতে হবে। আর যদি সমমনা সমচেতনায় উদ্বুদ্ধ কারো সাথে বন্ধুত্ব হয়, তখন সে শুধু নেবে না, সে-ও দেয়ার চিন্তায় থাকবে। আপনার তখন চাইতে হবে না, এমনিই বন্ধুত্ব অটুট থাকবে, আন্তরিকতাপূর্ণ হবে।

কারো কাছ থেকে কখনো কোনোকিছু পেতে চাইবেন না, পাওয়ার ইচ্ছা করবেন না। সবসময় শুধু দেয়ার চেষ্টা করবেন এবং দেয়ার নিয়ত রাখবেন। দেয়ার নিয়ত করলে স্বাভাবিক নিয়মে কিছু পাবেন। তখন যা পাবেন সেটাকেই অনেক পাওয়া মনে হবে। আর যদি মনে করেন যে, আমি তাকে বন্ধু ভাবছি, তার জন্যে এত করছি, সময় দিচ্ছি, কিন্তু সে আমার জন্যে কী করছে? তখন আর বন্ধুত্বও থাকে না, ভালবাসাও থাকে না।

প্রশ্ন : আমি ইদানীং খুব নিঃসঙ্গ অনুভব করি। মনে হয় সবার বন্ধুবান্ধব আছে, শুধু আমার নেই। মাঝে মাঝে নেতিবাচক হয়ে যাই। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারি না। এ সমস্যা থেকে কীভাবে মুক্তি পেতে পারি?

উত্তর : নিঃসঙ্গতা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুধরনের প্রভাবই ফেলতে পারে। নিঃসঙ্গতা থেকে কেউ এগিয়ে যাওয়ার দীক্ষা পায়, আবার কেউ হতাশায় তলিয়ে যায়। কেউ মনে করতে পারেন, ভাইবোন থাকলে বোধহয়

নিঃসঙ্গতা থাকবে না। কেউ মনে করেন, প্রেম করলে নিঃসঙ্গতা থাকবে না। কেউ মনে করেন, বিয়ে করলে নিঃসঙ্গতা থাকবে না। কিন্তু বাস্তবে ভাইবোন থাকার পরও নিঃসঙ্গতা দূর না-ও হতে পারে। আর প্রেম বা বিয়ে নিঃসঙ্গতাকে আরো বাড়িয়েও দিতে পারে!

নির্বোধরাই নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে গিয়ে ভুল পদক্ষেপ নেয়। হয়তো একজনকে ফোন করে, আরেকজনকে মেসেজ করে, রাতভর কথা বলার সুযোগ নিয়ে মোবাইল নিয়ে মশগুল থাকে। আর এভাবে তারা নিজের অস্থিরতা ও নিঃসঙ্গতাকেই আরো বাড়িয়ে তোলে। আর যারা বুদ্ধিমান, তারা নিজের নিঃসঙ্গতাকে দূর করার জন্যে ভালো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়। এই ভালো হতে পারে কোনো কাজ, হতে পারে বই বা হতে পারে সঙ্ঘ। তাই ভালো কিছুর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন। আপনার নিঃসঙ্গতা থাকবে না।

প্রশ্ন : আমি ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি। আমার বান্ধবীরা এখন অনেক বদলে গেছে। তারা শুধু ছেলেদের নিয়ে কথা বলে। ক্লাস শেষে লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ ওই সময় ছেলেরা ক্লাসে যায়। আমি এ ব্যাপারে আগ্রহী নই বলে তারা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমার কথা হলো, এই বয়সে যদি এসব করি, বড় হয়ে কী করব? আমারও কি ওদের সাথে যোগ দেয়া উচিত? ওদেরকে কি আমি বন্ধু বলব, নাকি বন্ধু নামের ফাঁদ?

উত্তর : ছেলেদের অধঃপতন হলো কখন? যখন তারা মেয়েদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকত। পড়াশোনায় জ্ঞানেবিজ্ঞানে সবকিছুতে তারা পিছিয়ে পড়তে লাগল। এখন মেয়েরাও যদি ছেলেদের জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তারাও পিছিয়ে যাবে। এই বাস্তবতা আমরা চাই না। আমাদের প্রত্যাশা—ছেলেমেয়ে উভয়েই সমানভাবে এগিয়ে যাক। সমানে সমান না হলে কখনো পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না।

আর যে বয়সে যা প্রয়োজন সে-বয়সে সেটা করাই সমীচীন—আপনি যে এটা বুঝতে পেরেছেন, এজন্যে আপনাকে অভিনন্দন। এখন পড়াশোনা করে নিজেকে গড়ে তোলার সময়। এটা যারা করবে না, তারা ঝরা পাতার মতো জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। কারণ রূপ সাময়িক, আর গুণের কদর চিরন্তন। তাই পড়াশোনা করে যোগ্য হোন, নিজের পরিচয় সৃষ্টি করুন।

মনে রাখবেন, বন্ধুত্ব জোর করে হয় না। বন্ধুত্ব সবসময় সমমনা মানুষের মধ্যে হয়। সমমনা কাউকে না পেলে নিজেই নিজের বন্ধু হোন। একজন ধ্যানীর বন্ধু হচ্ছে তার ধ্যান—আত্মনিমগ্নতা। আর জ্ঞানীর বন্ধু হচ্ছে

বই। ধ্যানী ও জ্ঞানীরা সবসময় ব্যতিক্রম। আপনি যাদের কথা বলেছেন এরকম বন্ধুত্ব আপনার জন্যে আসলে ফাঁদ। তারা আপনাকে টেনে নিচে নামাবে। কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্য ধরে রাখলে আপনি অনেক বড় হবেন।

প্রশ্ন : আমার সবচেয়ে কাছের বান্ধবীকে আমি মানসিকভাবে কষ্ট দিচ্ছি। এর পেছনে দায়ী আমার ঈর্ষা ও পজেসিভনেস। এতে সে কষ্ট পাচ্ছে, আমিও অপরাধবোধে ভুগছি। সুন্দর একটি সম্পর্ক আমার কারণেই কালিমাযুক্ত হয়েছে। এই বৃত্ত থেকে বের হওয়ার উপায় জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। যখনই আপনি কর্তৃত্ব করতে চাচ্ছেন, পজেসিভ হয়ে যাচ্ছেন, তখন সে আর বন্ধু থাকছে না। আগেকার দিনে যেমন রাজকুমারীর 'সই' থাকত, এটা অনেকটা সে-রকম সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে। রাজকুমারীর 'সই' বলতে বোঝায়, যে সবসময় রাজকুমারীর আজ্ঞাবহ অর্থাৎ তার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। আপনিও যদি তেমন কাউকে চান, নিজেই কষ্ট পাবেন। সে আপনার দিক থেকে মানসিকভাবে কিছুটা দূরে চলে গেলেও আপনার খারাপ লাগবে। এজন্যে বন্ধুত্ব বা যে-কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে কখনো পজেসিভ হবেন না। এটা একধরনের মানসিক ব্যাধি।

মনে রাখবেন, পৃথিবীতে আপনি একা এসেছেন এবং একাই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন। আপনার বান্ধবী আপনার সাথে যাবে না। আর কোনোকিছু পাওয়ার নাম বন্ধুত্ব নয়; বরং এটা দেয়ার নাম। আপনি যখন কোনো প্রত্যাশা ছাড়া শুধু দিতে চাইবেন, তখনই এটাকে বন্ধুত্ব বলা যাবে।

অনেকেই জানেন কাহ্‌লিল জিবরানের বিখ্যাত গল্প—দ্য টেম্পেস্ট। লেবাননের গল্প এটি। পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে সাধনায় মগ্ন একজন দরবেশ। একদিন প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে একটা পাখি তার ঘরে এসে পড়ল। পাখিটি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, ডানাও ভেঙে গেছে। দরবেশ পাখির সেবা করতে শুরু করলেন। আস্তে আস্তে পাখি সুস্থ হয়ে গেল।

কয়েকদিন পর পাখিটি উড়ে গেল। ততদিনে পাখির ওপর দরবেশের মায়া পড়ে গেছে। কিন্তু এই মায়াটাকে তিনি আসক্তিতে পরিণত না করে বরং শুকরিয়া আদায় করলেন। ভাবলেন, ডানাভাঙা পাখির যত্ন নেয়াটা ছিল আমার কর্তব্য। সুস্থ হওয়ার পর পাখিটিকে উড়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেয়াটাও আমার কর্তব্য।

বন্ধুত্ব হচ্ছে এরকম সমমর্মিতার নাম—পাখির যত্ন নেয়া এবং উড়তে সাহায্য করার মতো। আপনি সত্যিকারের বন্ধু হবেন তখনই, যখন অন্যজন

উড়ে গেলেও আপনার কোনো আফসোস থাকবে না, পজেসিভ হওয়া তো দূরের কথা। বরং শুকরিয়া থাকবে যে, তার যতদিন প্রয়োজন ছিল, আমি তাকে সমমর্মিতা দিয়েছি, ভালবাসা দিয়েছি। আজ তার সামর্থ্য হয়েছে, সে উড়ে গেছে। সে যেখানেই থাকুক, ভালো থাকুক। তা না করে যদি ঈর্ষান্বিত হন এবং পজেসিভ আচরণ করেন, তাহলে এটি কারো জন্যে সুখকর হবে না।

অতএব আপনি সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাকুন। বান্ধবীর যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তাকে দিন। আপনি যেহেতু নিজেই মনে করছেন—আপনার আচরণ সঠিক হচ্ছে না, আমরা দোয়া করি যাতে এখান থেকে আপনি পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেন।

প্রশ্ন : আমি ড্রাগের আসক্তি থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছি না। কিছুদিন ভালো থাকি, কিন্তু আবার শারীরিক মানসিক সমস্যা তৈরি হয়। গত তিন মাস যাবৎ ড্রাগ থেকে দূরে আছি। কিন্তু এখনো সমস্যা হচ্ছে। কী করণীয়?

উত্তর : আসলে ড্রাগ এবং বন্ধুত্ব—এ দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ ড্রাগ কেউ একা নেয় না। যে বন্ধুদের সাথে আপনি ড্রাগ নেন, সেই বন্ধুদের সাথে দেখা হলে বা যোগাযোগ হলেই আপনার ড্রাগ নেয়ার ইচ্ছাটা জেগে উঠবে। আপনি ড্রাগের প্রতি আবার আসক্ত হয়ে যাবেন।

অতএব যারা ড্রাগ থেকে মুক্তি পেতে চান, তাদের জন্যে জরুরি হচ্ছে, যে বন্ধুদের সাথে আপনার ড্রাগের সম্পর্ক, তাদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিন। তাদের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকুন। তাহলেই আপনি ড্রাগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। যন্ত্রণা কম হবে।

প্রশ্ন : আমি বেশ মিশুক বলে মানুষের সাথে খুব সহজে বন্ধুত্ব ও ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়। আত্মীয়, পরিচিত ছোট ভাই, বড় ভাইয়েরা যে-কোনো বিপদে পড়লে আমাকে জানায় সাহায্য করার জন্যে। কাউকে 'না' বলতে পারি না। ফলে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারি না। এ অবস্থায় আমার মেডিটেশন, লেখাপড়া এবং নিত্যনৈমিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির কাজগুলো ব্যাহত হচ্ছে। ছুটির দিনগুলোতে বেশিরভাগ সময় এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকি, এমনকি ঈদের দিনও বাড়ি গিয়েছি সকালে। এভাবে চলতে চলতে নিজেকে দলছাড়া মনে হচ্ছে। মেডিটেশনে মনোযোগ দেয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে প্রকৃতি আমাকে কম সাহায্য করছে। এ অবস্থায় কীভাবে আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অনন্য মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারি?

উত্তর : প্রকৃতি তো আপনাকে কম সাহায্য করবেই। কারণ আপনি প্রকৃতির বিপরীত নিয়মে কাজ করছেন। আপনি নিজে অনন্য মানুষের পথে না চললে অন্য মানুষের প্রয়োজনে আপনি খুব বেশিদিন কাজ করতে পারবেন না। আপনার জীবনে যদি রুটিন না থাকে, আত্মনির্মাণের কাজগুলো যদি করতে না পারেন, তাহলে অন্যের বিপদেও আপনি একসময় আর প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হবেন না।

কারণ প্রকৃতির নিয়মই হলো, অন্যকে সুখী করতে হলে আগে নিজেকে সুখী হতে হয়। অন্যদের সফলতার পথ দেখাতে হলে নিজেকে আগে সফল হতে হয়। প্রয়োজনে 'না' বলতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, না-পারাটা বিপজ্জনক। অনেক বছর আগে এক মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, "আপনি তো নেতিবাচক কথা বলতে নিষেধ করেছেন যে, 'না' বলা যাবে না। আমি তাই 'হাঁ' বলে দিয়েছি।"

ঘটনা হচ্ছে একজন তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে। সে ওই ছেলেকে পছন্দ করে না, কিন্তু 'না' বলা যাবে না বলে সে 'হাঁ' বলে দিয়েছে। তাকে বললাম, এ-ক্ষেত্রে 'না' বলাটাই ছিল ইতিবাচক।

এই যে অন্যের উপকার করতে করতে আপনার লেখাপড়া, মেডিটেশনসহ সব রুটিন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, এটা তো ঠিক নয়। প্রয়োজনে সাহায্য করবেন, কিন্তু মাত্রাটা বুঝতে হবে। না হলে পরে একটা সময় আসবে যখন এই ছোট ভাই, বড় ভাইয়েরা আপনাকে তাচ্ছিল্য করবে। আপনি নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারেন নি বলে অবজ্ঞা করবে। সবসময় মনে রাখবেন, আপনি শিক্ষার্থী। আপনার জন্যে প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে পড়াশোনা। এটা ঠিক রেখে আপনি যত চান অন্যদের উপকার করুন।

আপনার সামনে আসলে কোনো মনছবি নেই। আপনি শুধু ক্ষণিকের হাততালিতে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। আর আপনার মতো এমন কাউকে দিয়ে কাজ করাতে পারলে কার্যোদ্ধারের জন্যে তারা আপনাকে তেল দেবে, হাওয়া দেবে—এটাই স্বাভাবিক। একসময় কাজ শেষ, দেখবেন তেল দেয়াও শেষ। তখন আফসোস করবেন।

অতএব সময় থাকতে সচেতন হোন। নিজের পরিচয় সৃষ্টি করাটা গুরুত্বপূর্ণ। এমন কিছু করবেন না, যা আপনার পড়াশোনাকে নষ্ট করে, আপনার বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আপনার কাজের ক্ষতি করে। আর নিয়মিত মেডিটেশন করুন। মেডিটেশন করতে না পারার জন্যে কোনো অজুহাত দাঁড় করাবেন না।

প্রশ্ন : আমার রুমমেট আমার সাফল্যে সবসময় হিংসা করে। তার হিংসা কি আমার সাফল্যের পথে অন্তরায় হতে পারে?

উত্তর : অন্যের হিংসা কখনোই আপনার সাফল্যের পথে অন্তরায় হতে পারে না। আপনি সবসময় প্রার্থনা করবেন—আল্লাহ! আমাকে হিংসুকের হিংসা থেকে রক্ষা করো।

দ্বিতীয়ত, তার জন্যে দোয়া করবেন। মেডিটেশনে তাকে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাবেন যে, আপনি তার মঙ্গল চান, তার কল্যাণ চান এবং আপনাকে হিংসা করার কোনো কারণ নেই। আপনি নিজের ভেতরে এই ইতিবাচক অনুরণন সৃষ্টি করুন। দেখবেন, ধীরে ধীরে তার ওপরও আপনার ইতিবাচক চিন্তা প্রভাব বিস্তার করবে।

প্রশ্ন : আমি আমার সব থেকে প্রিয় বন্ধুকে নিয়ে ভালো থাকতে চাই। কিন্তু বন্ধু আমাকে কষ্ট কেন দিয়েছে? আমি বার বার কাউকে বিশ্বাস করে ব্যর্থ হই কেন? কেন আমি শুধু খারাপ বন্ধু পাই? আমার ভুল কোথায়? আমি আমার সব ভুল ঠিক করতে চাই। আমি আকর্ষণীয়, ভালো ও সফল হতে চাই। আমাকে কী কী করতে হবে?

উত্তর : ভুল বন্ধুত্ব তো কষ্ট দেবেই। আপনি ভুল বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়ছেন প্রজ্ঞার অভাবে। বুঝতে পারছেন না যে, কোনটা সঠিক বন্ধুত্ব। আপনার চাওয়া খুব সহজ। কিন্তু আপনি সবসময় ভুল জায়গায় নক্ করছেন। যা চাইবেন সেই লক্ষ্যে তো আপনাকে কাজ করতে হবে। আপনি কোয়ান্টামে একাত্ম হয়ে অনুশীলনগুলো করতে থাকুন। দেখবেন যে, আপনার প্রজ্ঞা বাড়ছে এবং আপনি ইতিবাচক মানুষ হতে পারছেন।

আপনি শুধু করণীয়টুকু ঠিক রাখুন। নিজে যখন ইতিবাচক থাকবেন, তখন নেতিবাচক কোনো মানুষ আপনাকে কোনোভাবে কষ্ট দিতে পারবে না। আগেই টের পাবেন কী হতে যাচ্ছে। একজন মানুষ আগে থেকে বুঝতে পারলে তার মধ্যে কারো নেতিবাচকতা কোনো প্রভাব ফেলে না। সে মনে মনে হাসতে পারে। সে তখন রি-এক্ট করে না। বরং প্রো-একটিভ থেকে নিজের কাজগুলো সবচেয়ে ভালোভাবে করে যায় এবং সফল হয়।

বন্ধুত্ব : বিপরীত লিঙ্গের সাথে

প্রশ্ন : ছোটবেলা থেকে ছেলেদের সাথে পড়াশোনা করার কারণে আমার বেশ কয়েকজন ছেলেবন্ধু আছে। কিন্তু ওদের সাথে আমার সম্পর্ক ভাইবোনের মতো। ওরা আমাকে শ্রদ্ধা করে। কথা, কাজ ও আচরণে আমরা নির্দিষ্ট সীমা বজায় রাখি। একে অন্যকে বিপদে সাহায্য করি, সান্ত্বনা জ্ঞাপন করি। ছেলেদের সাথে এরকম সম্পর্ক কি নিষিদ্ধ? এ বিষয়ে যুগের বা সময়ের দাবি কী? নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে থেকে মাঝে মাঝে দেখা হওয়া বা ঘুরতে যাওয়া, এটা কি অন্যায় হবে? পরামর্শ দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর : সহপাঠীদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। ছেলে এবং মেয়ে হলে সীমার মধ্যে থেকে তারা যদি সুসম্পর্ক রাখতে পারে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সমস্যাটা হলো বয়সটাই এমন যে, সীমা বজায় রাখা বেশ কঠিন। আপনি বলছেন, নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে থেকে দেখা করবেন, ঘুরতে যাবেন।

ধরুন, আপনি আপনার ছেলেবন্ধুর সাথে কক্সবাজারে বেড়াতে গেলেন, একসাথে অনেকটা সময় কাটালেন। কতক্ষণ সীমা বজায় রাখতে পারবেন? *মুনিগণ ধ্যান ভাঙি তব পদে দেয় তপস্যার ফল।* মুনিরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানে আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা খুব কম—একেবারে হাতে-গোনা। শুরু হয় কিন্তু বন্ধুত্ব দিয়ে। আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, আবেগিক নির্ভরতা তৈরি হয়। একপর্যায়ে সৃষ্টি হয় শারীরিক আকর্ষণ এবং তারপর শারীরিক সম্পর্ক।

আসলে এই যে ছেলেবন্ধু বা মেয়েবন্ধু এগুলো আমাদের সংস্কৃতি নয়, এগুলো পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। ডেটিংয়ে কিন্তু কোনো স্বামী-স্ত্রী যায় না। ডেটিংয়ে যায় গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডরা। যার সাথে আমাদের সংস্কৃতির কোনো সম্পর্ক নেই। আজকাল এত ছ্যাঁকা, ছেলেমেয়েদের রেজাল্ট এত খারাপ হওয়া—এর পেছনে পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির প্রভাব কোনো অংশেই কম নয়।

তাই সুসম্পর্ক অবশ্যই থাকবে, কিন্তু এই সীমা যেন লঙ্ঘিত না হয়। কারণ মেয়ে হিসেবে আপনি বেশি বিপদে পড়বেন এবং কষ্ট পাবেন। যারা চালাকচতুর তারা বোঝে যে, কোনখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আর ভালোমনা মেয়েরা, সরল মেয়েরা—যারা মনে করে স্রেফ বন্ধুত্ব, তারা বিপদে পড়ে বেশি। আপনি হয়তো বন্ধু ভাবছেন, কিন্তু সে ভাবছে বন্ধুর চেয়ে একটু বেশি। আপনি সুযোগ নিতে চাচ্ছেন না কিন্তু সে যে সুযোগের অসৎ-ব্যবহার করবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

অতএব কোনো ছেলেবন্ধুকে ফেরেশতা ভাববেন না, বেড়াতে গেলেও বুঝেশুনে যাবেন। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, বিপরীত লিঙ্গের কারো সাথে কখনো একা বেড়াতে না যাওয়া। একা যদি যান, তাহলে সীমা বজায় রাখতে না পারার সম্ভাবনাই বেশি।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, ছেলে আর মেয়েতে কখনো বন্ধুত্ব হয় না, এটা কি ঠিক? যে গবেষণার কথা ইতিমধ্যে বলেছেন তা ইউরোপের। বাংলাদেশেও কি সম্পর্ক সবসময় সে পর্যায়ে যায়? ব্যতিক্রম কি একেবারেই নেই?

উত্তর : ব্যতিক্রম সবসময়ই ব্যতিক্রম। যদি সুযোগ পায়, বাংলাদেশেও বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত ওই পর্যায়ে গড়ায়। সুযোগ কম পায়, তাই যায় না। এর আগে যতগুলো পেশায় ছিলাম, প্রতিটি পেশায় মানুষের দুঃখকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। মানুষ কীভাবে প্রতারিত হয়েছে, ছেলেরা বা মেয়েরা কীভাবে প্রতারিত হয়েছে তা খুব কাছ থেকে দেখেছি। যে কারণে এ কথাগুলো খুব জোর দিয়ে বলতে পারি। এখন তো এতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে।

একটি মেয়ের চিঠি এরকম—'আমি মেডিকেল শেষ বর্ষে পড়ছি। আমার স্বপ্ন ছিল মাদার তেরেসার মতো মহান কেউ হবো। কিন্তু এখন আমার সবকিছুই ওলটপালট হয়ে গেছে। ছয় মাস আগে একটি ছেলের সাথে আমার মোবাইলে কথা হয়। তারপর থেকে টানা গত ছয়টা মাস প্রতিরাতে দীর্ঘসময় নিয়ে তার সাথে কথা বলতাম। এভাবে কখন যে মনের অজান্তে তাকে ভালবেসে ফেলেছি, আমি বুঝতেও পারি নি। আমার প্রতি ওর ভালবাসাও ছিল আকাশচুম্বী, যেটা প্রকাশ পেত তার কথাবার্তায়। কথা বলে বলে দুজন দুজনার সম্পর্কে একশ ভাগই জেনে গিয়েছিলাম। সব জল্পনা-কল্পনা শেষে, দীর্ঘ ছয় মাস পরে আমাদের দেখা হলো। না দেখেই আমি ওকে আমার মনের মাঝে স্বামীর স্থান দিয়ে দিয়েছিলাম। তাই দেখা হওয়াটা আমার কাছে শুধু সৌজন্য ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি।

কাছ থেকে দেখে আরো বেশি ভালো লাগল। ওকে যখন মনের কথা খুলে বললাম, তখন ও জানাল যে, আমাকে ও বন্ধু ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। আমি ওর একজন ভালো বন্ধু হিসেবেই নাকি থাকব সারাজীবন। জীবনসঙ্গী হিসেবে কখনো মেনে নিতে পারবে না।

কারণ জানতে চাইলাম। সে অনেক অজুহাত দিলো। কিন্তু আমার কাছে সেগুলোকে খুব একটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। অবশেষে একদিন জানতে

পারলাম, আমার সবকিছুই তার পছন্দ হয়েছে, কিন্তু একটা জিনিসকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি। তা হলো আমার বাহ্যিক সৌন্দর্য।

সে মনের সাথে অনেক বোঝাপড়া করেও আমাকে গ্রহণ করতে পারে নি। আমি তাকে অনেক বোঝালাম, বাহ্যিক সৌন্দর্যটাই কি সব? আমি তো তোমাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসেছি। আমার মনটা তো অসুন্দর নয়। কত কাঁদলাম, কত বুক ভাসালাম!

ওর কাছ থেকে অবহেলার পর অবহেলা পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম সম্পর্ক ভেঙে দেবো। তা করলামও। কিন্তু আমি দুদিনেই পাগল হয়ে গেলাম। খাওয়াদাওয়া, লেখাপড়া সবকিছুই এলোমেলো হয়ে গেল। সারাদিন শুধু কান্নাকাটি আর বুকভরা যন্ত্রণা।'

আসলে মোবাইলে কথা বলতে বলতে একজনকে স্বামীর আসনে বসিয়ে দেয়া—এর চেয়ে আহাম্মকি আর কী হতে পারে! মোবাইলে কথা বলেই বুঝে গেছে, তার ভালবাসা ছিল আকাশচুম্বী। অর্থাৎ কত অবাস্তব কল্পনা ও আবেগ! কষ্ট পেলে কী করতে হবে, তা আবার তারা শিখছে নাটক-সিনেমা থেকে। প্রেমিকা ছ্যাঁকা দিয়েছে, তাই বিদেশে চলে গেল বা ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে গেল। সিনেমা হয় পরিচালকের নির্দেশে, চিত্রনাট্যকারের ইচ্ছায়। বাস্তব জীবন অনেক কঠিন। এই আহাম্মকির কারণেই অধিকাংশ তরুণ-তরুণী কষ্ট পায়। মাঝখান থেকে তার পড়াশোনা নষ্ট হয়, জীবনে নেমে আসে হতাশা।

প্রশ্ন : এক ছেলে সহপাঠীর সাথে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক। কখনো কখনো এই সম্পর্কের মধ্যে আসক্তি সৃষ্টি হলেও আমি সচেতনভাবে সহজ স্বাভাবিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই না। কারণ সে মানুষ হিসেবে খারাপ না হলেও আমার মনের মতো নয়। কিন্তু তাকে আমার ভালো লাগে এবং আমি সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। বিষয়টি কি ঠিক আছে? আমার কোনো কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী বলেছেন, এ ধরনের সম্পর্ক ঝুঁকিপূর্ণ। যে-কোনো সময় ভুলের ফাঁদে পা দেয়ার ভয় থাকে। বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ কী হওয়া উচিত?

উত্তর : একজন সহপাঠী বা একজন প্রতিবেশীর সাথে সাধারণ সুন্দর স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকতে পারে—এটা আমরা বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেছি। সম্পর্কের জন্যে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু। এ সীমানা লঙ্ঘন করলেই ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। কারণ ছেলেমেয়েতে আসলে কখনো নিষ্কাম নির্ভেজাল বন্ধুত্ব হয় না।

'গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড'—এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ধ্যানধারণা। এরা গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ডের সাথে ডেটিংয়ে যায়। আমাদের সংস্কৃতি এই ডেটিং অনুমোদন করে না।

এটা খুব ভুল ধারণা যে, বিয়ের আগে ডেটিং হলে, দৈহিক সম্পর্ক হলে পরস্পরকে বোঝা যাবে এবং এরপরে সম্পর্ক স্থায়ী হবে। বিয়ের আগে যদি দৈহিক সম্পর্ক হয়, তো সেই মেয়ের প্রতি ছেলের আকর্ষণ এমনিই কমে যায়। এটাই বাস্তব সত্য।

অতএব মেয়েদের এ ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতে হবে। কারণ ক্ষতিটা কিন্তু মেয়েদের বেশি। ছেলেরা এ ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহেলা করে, 'একটা গেছে, আরো কত আছে ...'। কিন্তু মেয়েরা জড়িয়ে যায় বেশি। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক অনেক বেশি গভীর। কারণ মেয়েরা তুলনামূলকভাবে বেশি আবেগপ্রবণ।

তাই মেয়েদের এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত। বিয়ের আগে এমন কোনো সম্পর্কে জড়ানো উচিত নয়, যার জন্যে অনুশোচনা করতে হয় এবং নিজেকে প্রতারিত মনে হয়।

প্রশ্ন : ছেলে বা মেয়ে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্কে থেকে শুভেচ্ছা বিনিময়ে বিপরীত লিঙ্গের কাউকে গালে গাল লাগিয়ে অভ্যর্থনা করার একটা মানসিকতা বর্তমানে দেখা যায়। বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখেন?

উত্তর : আমাদের সংস্কৃতি এটা সমর্থন করে না। নিজস্ব সংস্কৃতিকে কখনো বিসর্জন দেবেন না। আর গালে গাল লাগালেই যে তার সাথে আন্তরিকতা বাড়বে এটা মনে করারও কোনো কারণ নাই। এই গালে গাল মেলানোটাও আমাদের রীতি নয়। এ ধরনের আচরণ বর্জনীয়।

প্রশ্ন : আমি একজন কলেজ শিক্ষিকা। একদিন কলেজের মেডিকেল সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসারের সাথে এখনকার ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। একপর্যায়ে তিনি বললেন, অনেক ছাত্রী তার কাছে এসে খুব খোলাখুলিভাবে বলছে এবং পরামর্শ চাচ্ছে যে, তাদের বয়ফ্রেন্ডের সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে, কী করণীয়? বিপরীত লিঙ্গের সাথে সম্পর্কের অবস্থা যে এতটাই খারাপ হয়ে গেছে, আমি ভাবতেও পারি নি। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কথা ভাবলেই আমি খুব অসহায় বোধ করছি। এদের জন্যে কীভাবে কী করব বুঝতে পারছি না। দোয়া করবেন।

উত্তর : দোয়া তো আমরা করব। পাশাপাশি এই শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের সঠিক জীবনদৃষ্টি তুলে ধরতে হবে। আসলে এরা মনে করছে জীবন মানে রিলেশন করো, খাও, বেড়াও, যত পারো ভোগ করো। এদের কাছে এটুকুই জীবন এবং রিলেশন মানে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড রিলেশন। পাশ্চাত্যে এধরনের রিলেশন মানে হচ্ছে মূলত দৈহিক সম্পর্ক। এ অর্থটা প্রয়োগ করছে বলে এ প্রজন্মের কর্মও তেমনই হচ্ছে। শুধু দোয়া করলে হবে না, এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এদেরকে বের করে আনতে হবে।

আগে এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে পারতে হবে। তারপর ভাবতে হবে যে, এদেরকে আমরা কীভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারি? এদের অভাবটা কোথায়? আসলে এই শিক্ষার্থীদের কাছে কোনো স্বপ্ন নেই, জীবনের মহৎ কোনো লক্ষ্য নেই। পারিবারিক বন্ধনও এখন আর আগের মতো দৃঢ় নয়। এদের জীবনে উপকরণের প্রাচুর্য থাকলেও নৈতিক শিক্ষা এবং শুদ্ধাচারের অভাব সবচেয়ে বেশি। এদের সামনে কোনো রোল মডেলও নেই।

এখানে কিন্তু শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক হিসেবে আপনি শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াবেন দৃঢ় আশ্রয় হয়ে। আপনি নিজে যেহেতু মেডিটেশন চর্চা করেন, এখন শিক্ষার্থীদেরকেও মেডিটেশন, দমচর্চা এবং শুদ্ধাচার চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। তাদের বন্ধু হতে পারেন। পড়াশোনার পাশাপাশি সঠিক রোল মডেল নির্বাচন, সুস্থ জীবনাচার, মহৎ লক্ষ্য এবং মূল্যবোধ নিয়ে ক্লাসে আলোচনা করতে পারেন।

অভিভাবকদেরও মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, যেন তারা ধৈর্য ধরে সন্তানকে সময় দেন এবং সন্তানের নৈতিক, আত্মিক ও মানসিক বিকাশে মনোযোগী হতে পারেন।

আপনি আপনার কলেজের মেডিকেল টিমকেও *মেডিটেশন ম্যাগাজিন* এবং *শুদ্ধাচার* বই দিতে পারেন। তারা যেন তাদের কাছে কাউন্সেলিং নিতে আসা শিক্ষার্থীদের সুপরামর্শ দিতে পারেন। পরিস্থিতি বুঝে মেডিকেল অফিসারদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন যে, মেডিটেশন চর্চা করলে তাদের কথার শক্তি বাড়বে, চিকিৎসক হিসেবে দক্ষতা ও সমমর্মিতা বাড়বে। তখন তারা শিক্ষার্থীদেরকে আরো বেশি সাহায্য করতে পারবেন।

আর এ প্রজন্মকে একটা স্বপ্ন একটা লক্ষ্য দিতে হবে। তবে কোনোকিছুই জোর করে চাপিয়ে দিলে হবে না। এ পি জে আবদুল কালামের শিক্ষক কিন্তু তাকে কোনো বিষয় চাপিয়ে দেন নি। তিনি তার মধ্যে আগ্রহ এবং কৌতূহল সৃষ্টি করেছিলেন। একজন শিক্ষার্থী যদি একবার তার স্বপ্ন বা লক্ষ্য পেয়ে যায়, সে অনেক বড় কিছু করতে পারে। এজন্যে আমরা সবসময়

বলে আসছি যে, মা-বাবা এবং শিক্ষকদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে, সন্তানকে জীবনের লক্ষ্য দেয়া। লক্ষ্য থাকলে সন্তান যে শিশুবয়সেও কতকিছু করতে পারে, তার একটা ভালো উদাহরণ দাবার সবচেয়ে ছোট গ্র্যান্ডমাস্টার অভিমন্যু মিশ্র।

অভিমন্যু মিশ্র জন্মগ্রহণ করেছেন আমেরিকায়। তার বয়স যখন আড়াই বছর, তখন তার বাবা হেমন্ত মিশ্র সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ট্যাব বা আইফোনে সন্তান যাতে আসক্ত না হয় সেজন্যে তাকে দাবা খেলা শেখাবেন। দাবার গুটি তার হাতে তুলে দিলেন এবং এটাই শুরু। আস্তে আস্তে তাকে খেলা শেখালেন। তাকে লক্ষ্য দিলেন যে, তুমি দাবায় চ্যাম্পিয়ন হবে।

তা-ই হলো। মাত্র ১২ বছর বয়সে অভিমন্যু বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন দাবায়। অভিমন্যু বলেন, করোনাকালে দেড় বছর লকডাউনে আইসোলেশনে থাকাকালে সময় নষ্ট না করে আমি আমার লক্ষ্য অর্জনের জন্যে, দাবায় দক্ষ হওয়ার জন্যে দৈনিক গড়ে ১২ ঘণ্টা করে সময় ব্যয় করেছি। এর পরের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

আসলে সন্তানকে জীবনের একটি লক্ষ্য দেয়া, শিশুবয়স থেকে তাকে সময় দেয়া এবং আদর করতে করতে খেলাচ্ছলে শুদ্ধাচার শেখানো—এটাই মা-বাবা এবং অভিভাবকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

যদি একবার লক্ষ্য দিয়ে দিতে পারেন, তাহলে বাকি কাজগুলো সে নিজেই করবে। তখন ক্ষতিকর সম্পর্কে জড়ানো বা অন্য কোনো বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত আচরণ থেকে সে বিরত থাকবে। তারপরেও সবসময় মনোযোগ দিতে হবে যে—সে কী করছে, কী নিয়ে সময় ব্যয় করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হচ্ছে, শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত খেয়াল রাখতে হবে। আমরা প্রত্যেকে এমন সচেতনভাবে কাজ করে গেলে তারপর দোয়া কাজ করবে। কারণ কর্ম ছাড়া প্রার্থনা কবুল হয় না।

প্রশ্ন : ইন্টারনেটে এক ফ্রেন্ডকে আমার পছন্দ হয়েছিল। তার সাথে চ্যাট হতো খুব কম, কথা হতো আরো কম, দেখা হয় নি একবারও। দেড় বছর ধরে নেটের কল্যাণে ছবি দেখা হয়েছে শুধু। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের সময় মনছবিতেও আমার পাশে ও ছিল এবং জীবনের শেষ মুহূর্তেও ছিল। কোর্সের আগে শুধু পছন্দ করতাম, এর বেশি কিছু নয়। ভালবাসতাম তা-ও বলা যাবে না। কিন্তু মনছবির পর আমি সারাক্ষণ তার কথা ভাবতে থাকি। শিক্ষার্থী কোর্সের পর অনুভব করলাম, আমি প্রেম না করেও প্রেমরোগে ভুগছি। আমাকে এই প্রেমরোগ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই প্রত্যয়ন করলাম, এই

রোগ থেকে মুক্ত হবো। এখন আমি রোগমুক্ত। এবার মনছবি দেখলাম শুধু আমাকে নিয়ে, আমার ক্যারিয়ার নিয়ে। প্রশ্ন হলো, আমার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গী যদি সে না-ও হয়, তাহলে আগের মনছবির জন্যে কি আমি কোনোভাবে দায়ী থাকব? মনছবির মাধ্যমে প্রকৃতির নেপথ্য যে কাজ শুরু হয়ে যায়, তার কোনো প্রতিক্রিয়া কি আমার ওপর পড়ার সম্ভাবনা আছে? উত্তরটা জানতে পারলে আশঙ্কামুক্ত হবো। আমার জন্যে দোয়া করবেন।

উত্তর : আমাদের দোয়া থাকছে। আমরা খুব আনন্দিত যে, আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মনছবি দেখার পরে নেপথ্য স্পন্দনে এটার প্রভাব পড়েছে বলেই আপনার মনে তার চিন্তা চলে এসেছে বেশি বেশি। এখন মনছবি বদলে ফেলেছেন—একটা ভুল হতে যাচ্ছিল, সেই ভুল থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে এসেছেন।

যখনই মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়, ভালোর জন্যে সিদ্ধান্ত নেয়, কল্যাণের জন্যে সিদ্ধান্ত নেয়, তখন পরম করুণাময়ের রহমত তার ওপরে থাকে। অতএব আগের মনছবির কোনো প্রভাব আপনার ওপর পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ডিজিটাল মরীচিকা

প্রশ্ন : যদি কারো সাথে প্রেমের সম্পর্ক হয় এবং আমরা যদি একে অপরকে সব সত্য বলি এবং একে অপরকে না দেখেও সত্যিই ভালবাসি, তবে সেই ফোনে গড়ে ওঠা সম্পর্কের স্থায়িত্ব কতটুকু?

উত্তর : এই যে ফোনে ফোনে প্রেম, ইন্টারনেটে প্রেম, ফেসবুকে প্রেম, পরকীয়া—এসব ভার্চুয়াল সম্পর্কগুলোর কোনো স্থায়িত্ব নেই। কেউ কেউ স্থায়িত্ব নেই জেনেও টাইম পাস বা মজা নেয়ার জন্যে ফোনে প্রেম করছে। এখানে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু নেই। এগুলো একধরনের ব্যাধি। এসব ব্যাধির যথাযথ চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন। একজনের জ্বর হলে যেমন আমরা তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি, তেমনি এই ফোনে ফোনে বায়বীয় প্রেম যারা করে, তাদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কারণ এরাও একধরনের অসুস্থতায় ভুগছে। অতএব এসব থেকে যত দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারেন, তত ভালো।

প্রশ্ন : আমি একজন ছাত্রী। সম্প্রতি একটা ছেলেকে আমার ভালো লেগেছে। ফেসবুকে পরিচয়। ছেলেটা বলে, আমাকে তার ভালো লাগে। তার সাথে আমার কখনো দেখা হয় নি। ঢাকায় থাকে। সে খুবই ভালো ছাত্র। অত্যন্ত মেধাবী। আমার কাছে তাকে কখনো খারাপ মনে হয় নি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে, আমার কী করা উচিত। কোনো সম্পর্কে কি জড়ানো উচিত? এতে আমার লেখাপড়ার কতটা ক্ষতি হতে পারে তা-ও বুঝতে পারছি না।

উত্তর : দেখা হয় নি, বাস্তব পরিচয় জানেন না, শুধু ফেসবুকে তার দেয়া তথ্যগুলো থেকেই ধরে নিলেন ভালো ছেলে! আপনি কীভাবে জানলেন যে, সে ভালো ছাত্র, ঢাকায় থাকে? সে নিজেই তো এ তথ্যগুলো দিয়েছে। বলার সময় সবাই নিজের ভালোটাই বলে। অনেক সময় নিজেকে জাহির করার জন্যে ভুল তথ্য দেয় এবং মিথ্যা বলতে থাকে। আর যারা সরলমনা তারা এসব মিথ্যা ও বানোয়াট পরিচয় সত্য মনে করে প্রতারণার ফাঁদে পা দেয়।

আসলে এত সরল হলে তো জীবনে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু জুটবে না। আর ফেসবুকে আজ পর্যন্ত কোনো ছেলে কি কোনো মেয়েকে বলেছে যে, তাকে তার খারাপ লাগে? বলে নি। কারণ বয়সটাই ভালোলাগার। যে কারণে আপনার ভালো লেগেছে, আপনার ভাষ্যমতে তারও আপনাকে ভালো লেগেছে। একটু মিষ্টি করে কথা বলতে পারলেই হয়। আর ফেসবুকে যারা চ্যাটিং করে তাদের ভাষা দেখে মোহিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ এগুলো সবই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

যখন লেখাপড়ার ক্ষতি হয়ে যাবে, জীবনের বারোটা বাজবে, তখন বুঝতে পারবেন, কত বড় ভুল করেছেন! এখন তওবা করে ফেসবুক একাউন্ট ডিলিট করে দিন। লেখাপড়া শেষ করে তারপর অন্যকিছু।

প্রশ্ন : চার বছর একজনের সাথে ফোনে কথা বলার পর পারিবারিকভাবে আমাদের বিয়ে হয়। এই চার বছরের মধ্যে আমরা কেউ কাউকে দেখি নি। যদিও সবাই বলে, সে দেখতে সুন্দরী। কিন্তু আমার সমস্যা হলো, গত চার বছর ধরে কথা বলার সময় আমি অবচেতন মনে যাকে কল্পনা করেছি, বাস্তবে তার সাথে কোনো মিল খুঁজে না পাওয়ায় একাকিত্ব অনুভব করি। স্ত্রী আমার পাশে থাকা সত্ত্বেও বার বার ফোনের সেই মানুষটিকে খুঁজে বেড়াই।

উত্তর : এটা আসলেই স্বপ্নভঙ্গের মতো অবস্থা। কারণ আমরা যখনই কারো সাথে যোগাযোগ করি, আমরা একরকম কল্পনা করি। সেই কল্পনা এবং

বাস্তব—দুটো এক হলে তো ভালোই। কিন্তু মিল না হলে তখনই সমস্যাটা শুরু হয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা এখানেই যে, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি আর প্র্যাকটিক্যাল রিয়েলিটি, এ দুটো সাধারণত এক হয় না।

আপনার এখন যা করণীয় তা হলো যাকে বিয়ে করেছেন, তাকে নিয়ে সুখী হওয়া। শুধু দৈহিক সৌন্দর্যই তো সব নয়। আপনি এতদিন ধরে তার সাথে কথা বলেছেন, তার মানে তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে মনের সৌন্দর্যটাই হয়তো আপনাকে আকর্ষণ করেছে বেশি। এই সৌন্দর্য বিবেচনায় রেখেই তাকে দেখুন। আর বাহ্যিক সৌন্দর্যের আকর্ষণের চেয়ে মানসিক বোঝাপড়াটাই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : গুরুজী, আমি অনেক বড় একটি ভুল করেছি। মাকে না জানিয়ে আমি ইনস্টাগ্রাম আইডি খুলে অনেক লোকের সাথে চ্যাট করেছি, সম্পর্ক তৈরি করেছি। এসব আমার কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার পূর্বের ঘটনা। কিন্তু সেগুলোর খারাপ ফল এখনো পেতে হচ্ছে। কয়েকদিন ধরে একটা ছেলে খারাপ ভিডিও দেয়া শুরু করেছে। সে বলত যে, আমাকে সে ভালবাসত, কিন্তু আমি তাকে আসলে ভালবাসি নি। এখন আমার ইনস্টা বন্ধ করার পরে সে আমাকে রোজ হোয়াটসঅ্যাপ করে তার প্রাইভেট পার্টের ভিডিও দেখায়। আমি খুব কষ্টে আছি। বিষয়টা এত মানসিক চাপ দিচ্ছে যে, মেডিটেশন করতে শিখেছি বলেই এতদিন শান্ত আছি। না হলে সুইসাইড করার মতো অবস্থা। সারাক্ষণ নিজেকে দোষী ও পাপী মনে হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে এটা ভেবে যে, আমার মা-বাবা কত স্বপ্ন দেখেছিল আমাকে নিয়ে! আমি তাদের কিছুই দিতে পারছি না। আর এই সমাজের প্রতিও আমার ঘেন্না ধরে গেছে। কারণ ছেলেরা কিছু করলে কোনো দোষ হয় না। দুদিন পর সবাই ভুলে যায়। মেয়েদের বেলায় এমন কেন? আমার কোনো ভাই নেই। তাই মা-বাবা প্রায়ই বলত, তুমিই আমাদের ছেলে, তুমিই আমাদের মেয়ে। আমাকে তারা ছেলের মতোই স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছি। এখন বুঝি, মেয়ে হওয়া অনেক কষ্টের। আমার বান্ধবীরা বলত যে, মা আমাদের ধরে রাখে, আর তুই কত স্বাধীন! ফলে আমারও একটা অহংকার চলে এসেছিল। তাই হয়তো এত কষ্ট পেতে হচ্ছে। আসলে আমি খুব ছোট হয়েও বান্ধবীদের দেখাদেখি এত খারাপ কাজ করতাম, এখন ভাবলে মন ভেঙে যায়। আমি সেই বান্ধবীদের সাথে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর ফোনও দেখি না। দোয়া করবেন যাতে সব ঠিক হয়ে যায় এবং আমি আমার মা-বাবার বিশ্বাস আবারো অর্জন করতে পারি।

উত্তর : খুব মায়া হয় এদের জন্যে। এখনকার শিশুরা, বিশেষত মেয়েরা কী পরিমাণ অসহায় হয়ে গেছে! ডিজিটাল টক্সিনের এই আগ্রাসন যে কত মারাত্মক এখন তা বিশেষজ্ঞরাও বলছেন। আর আমরা শুরু থেকেই এই ডিজিটাল টক্সিনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলাম। আমরা আশঙ্কা করে বলেছিলাম, এই টক্সিন আমাদের সমাজটাকে খাদে ফেলে দেবে, মেধার বিনাশ ঘটাবে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক বুনন এবং নৈতিক মেরুদণ্ডটাকে নষ্ট করে দেবে। সেটাই এখন দেখছি।

৫ জুলাই ২০২১ একটি খবরের (বাংলাদেশ প্রতিদিন) শিরোনাম ছিল—'এত নারী নিখোঁজের রহস্য কী?' বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটা হলো প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব। চলতি বছরের ছয় মাসে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানায় ১৩৯ জন নারী নিখোঁজ হওয়ার তথ্য জানিয়ে সাধারণ ডায়েরি বা জিডি ও মামলা করেছেন অভিভাবকরা। একই সময় জেলার মতলব উত্তর থানায় ৪৩ জন নারী ও শিশু নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জিডি করা হয়েছে। বছরের প্রথম পাঁচ মাসে চাঁদপুর সদর মডেল থানায় ৯৭ জন নারী ও কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জিডি করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলছেন, নিখোঁজের বড় অংশ স্কুল-কলেজের ছাত্রী এবং প্রবাসীদের স্ত্রী। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করে ছেলেদের প্রতি আসক্ত হয়ে ঘর ছাড়ছেন। ঘর ছেড়ে অনেকেই হচ্ছেন প্রতারিত ও পাচারের শিকার।

১ জুন ২০২১ রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় মামলা করেন ভারতের বেঙ্গালুরুতে ৭৭ দিন আটকে রেখে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার এক তরুণী। ওই মামলার আসামিদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুলিশ জানায়, 'গত আট বছরে এই চক্রটি প্রায় দেড় হাজার নারীকে পাচার করেছে।'

একজন পুলিশ কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে বলেন, 'নিখোঁজ নারীদের বেশিরভাগই প্রবাসীদের স্ত্রী। সাধারণ মানুষের সবার হাতে হাতে এখন স্মার্টফোন। তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ভিগো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার টিকটকসহ বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করেন। এসবের মাধ্যমে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাদের। অনেকে বখাটে যুবকদের পাল্লায় পড়ে এবং আসক্তি ও নানাবিধ প্রলোভনে পড়ে ঘর ছাড়ছে।'

আরেকজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, 'প্রযুক্তি সহজলভ্য হওয়ার কারণে সহজেই ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলছে। অগোচরে দেখা করছে। এর মাধ্যমে অনেকে প্রতারিত হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেরা কৌশলে মেয়েদের অন্তরঙ্গ ছবি তুলে বা ভিডিও করে তাকে ব্ল্যাকমেইল করছে।'

চাঁদপুরে একটি মহিলা কলেজের ছাত্রী নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জিডি করেন তার মামা। তার কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে বলেন, 'আমার ভাগ্নির বয়স ১৭ বছর। এসএসসি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ভালো ছাত্রী। কিন্তু হঠাৎ তার আচরণে পরিবর্তন আসে। একদিন কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে লাপাত্তা হয়ে যায় সে। পরে জানা গেল এক বখাটে প্রকৃতির ছেলের সঙ্গে কক্সবাজার চলে গেছে। পুলিশ চেষ্টা করেও ভাগ্নিকে ফেরত আনতে পারে নি দেড় মাসেও।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার ফারজানা রহমান বলেন, 'নারীদের হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া বড় উদ্বেগ ও আতঙ্কের। কিশোরী ও তরুণীরা এখন ভার্চুয়াল জগতে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। প্রথমে তারা বিনোদনের জন্যে ভার্চুয়াল জগতে প্রবেশ করলেও একসময় অদেখা ছেলের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। ভিডিও কলে কথা বলছে। কিন্তু সে কার সঙ্গে কথা বলছে তার পরিচিতি জানতে পারছে না। একসময় ওই ছেলের মিষ্টি কথায় ঘর ছেড়ে বিপদে পড়ছে বা প্রতারিত হচ্ছে। এসবের প্রতিকার করতে হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। অভিভাবকদের উচিত কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখার পাশাপাশি সন্তানকে গুরুত্ব দেয়া, তার কথা শোনা, যাতে সে ভুল পথে পা বাড়াতে না পারে।'

আমরা সবসময় বলেছি, ১৮ বছরের আগে সন্তানকে স্মার্টফোন দেবেন না। কিন্তু শোষক ও বেনিয়ারা ঠিকই এই প্রজন্মের ওপর ডিজিটাল মাদক চাপিয়ে দিয়েছে করোনায় লকডাউনের সুযোগ নিয়ে, অনলাইন ক্লাসের নামে এবং স্মার্টনেসের নামে। আর এই ডিজিটাল মাদক আমাদের সমাজকে তছনছ করে দিয়েছে। এটা পূর্ব পরিকল্পিত, কারণ সমাজ যখন বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, তখন শোষণ করাটা খুব সহজ হয়। প্রত্যেক মানুষ তখন পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে যায়, মানুষ একা নিঃসঙ্গ হয়ে যায় এবং তখন সে হতাশ হয়ে যায়। আর হতাশ মানুষকে দাস বানানো সবচেয়ে সহজ।

আমরা যদি একটু চিন্তা করি, একটি জেলার তিনটি থানায় যদি এই সংখ্যক কিশোরী ছাত্রী এবং মহিলা ঘর ছেড়ে প্রতারণা ও পাচারের শিকার হন, তাহলে সারাদেশের কী অবস্থা! প্রতারণা ও পাচারের শিকার নারীর এই সংখ্যাটা কত বড় এবং কত আতঙ্কজনক হতে পারে! রিপোর্ট বলছে, দেশের অন্যান্য থানাতেও নারী ও কিশোরী নিখোঁজ হওয়ার জিডি এবং মামলার সংখ্যা উদ্বেগজনক।

এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব জরুরি। এজন্যে আমাদের সমস্ত কার্যক্রম, বিশেষ করে পারিবারিক কার্যক্রমে অংশ নেবেন। কারণ পরিবারকে

যদি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়া যায়, সন্তান লালনের ক্ষেত্রে কী করণীয় এবং কী বর্জনীয় এই দৃষ্টিভঙ্গিটা যদি ঠিক করা যায়, তাহলে আমরা যে ঝামেলার মধ্যে এখন পড়েছি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারব, পারব নিজেদেরকে এবং সন্তানদেরকে নিরাপদে রাখতে।

এখন আপনি এত এত অ্যাপস খুলে এবং স্বাধীনতার অপব্যবহার করে ভুল যা করে ফেলেছেন, সেজন্যে আল্লাহর কাছে আন্তরিক ক্ষমা চান। দোয়া করুন যাতে এই বিপদ থেকে মুক্ত হতে পারেন। আমরাও অবশ্যই দোয়া করি। কারণ আপনি আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং মোবাইল দেখা বন্ধ করেছেন। খারাপ সঙ্গ থেকেও দূরে থাকতে চাচ্ছেন। খুব ভালো।

আসলে একজন মানুষ যখন ধ্যানের জগতে আসে, তখন তার মধ্যে একধরনের বোধোদয় হয়। বয়স বা আবেগের কারণে ভুল করে ফেললেও তার মধ্যে আবার ভালোর দিকে ফিরে আসার একটা চিন্তা কাজ করে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করা আর না করার মধ্যে এটাই হচ্ছে তফাৎ।

আপাতত আপনি খুব প্রয়োজন না থাকলে মোবাইল থেকে এসব অ্যাপ ডিলিট করে দিন। তাহলে নোংরা ভিডিও পাঠানো বন্ধ হয়ে যাবে। আর কোয়ান্টামে নতুন সঙ্গ তৈরি করে নিন। এখানে ভালো কাজে সময় দিন। প্রয়োজনে কিছুদিন ফিচার ফোন ব্যবহার করুন। ভবিষ্যতে যেন এমন ভুল না হয় সেজন্যে তওবা করুন। আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন : কম্পিউটার ল্যাবে ক্লাস করতে গিয়ে দেখি ইন্টারনেটে ভুল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে অনেক শিক্ষার্থী। এখন আমার ভয় হচ্ছে আমিও যদি এসব পঙ্কিলতায় জড়িয়ে যাই। কারণ ক্লাস করতে হবে আবার নিজেকেও বাঁচাতে হবে। সব মিলিয়ে খুব চিন্তায় আছি।

উত্তর : কম্পিউটার ল্যাব বলি বা ইন্টারনেট বলি, আমাদের কাজ হবে ভালোটুকু গ্রহণ করা। যেমন হাঁসের সামনে যদি দুধ দেয়া হয়, হাঁস দুধের ছানাটুকু তুলে খায়, পানিটুকু পড়ে থাকে। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের মধ্যে এটুকু আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে, আমি অনন্য মানুষ হওয়ার অভিযাত্রী, আমি পাপে ডুবে যাব না। আমি ভালো জ্ঞানটুকু গ্রহণ করব, বিজ্ঞানটুকু গ্রহণ করব। যা আমার জানার দরকার নেই, তা আমি জানব না।

ধ্যানী যদি স্রষ্টার ধ্যানে মগ্ন থাকে, কোনো উর্বশী তার ধ্যান ভাঙাতে পারবে না, যদি তার বিশ্বাসে খাদ না থাকে। সবসময় বিশ্বাস করবেন যে,

'বড় কিছু করার জন্যে, মহৎ কিছু করার জন্যে আমার জন্ম হয়েছে। পশুর জীবনযাপন করার জন্যে আমি পৃথিবীতে আসি নি। আমি মানুষ হতে চাই। এই পৃথিবীকে আমি মানুষের বাসযোগ্য করতে চাই। অন্তত পক্ষে আমার দিক থেকে সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা আমি করব।' এই বিশ্বাস যখন রাখবেন, দেখবেন যে, সমস্ত পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে আপনি উঠতে পারছেন।

প্রশ্ন : আমি উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। পড়াশোনা বা অন্য কোনোকিছুই ভালো লাগে না। আমার বেশিরভাগ সময় কাটে ফেসবুকে।

উত্তর : উচ্চ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ মানে এখন আপনার পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়। অথচ এখন আপনি অনলাইনে সময় কাটাচ্ছেন। আসলে একজন শিক্ষার্থীর কী চাওয়া উচিত? ভালো রেজাল্ট—ফার্স্ট হতে হবে, প্রথম সারিতে থাকতে হবে। আর সোশ্যাল মিডিয়ার বন্ধু তো শুধু ভার্চুয়াল থাকে না। এরপর বন্ধুর সাথে একটু মোবাইলে কথা, তারপর পড়াশোনা বাদ দিয়ে বন্ধুর পেছনে ছোটাছুটি। এ কারণে এখন সবচেয়ে বেশি হতাশ হচ্ছে ৮/৯ বছর বয়স থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এদের মধ্যে হতাশা সবচেয়ে বেশি। এদের মধ্যে না-পাওয়ার বেদনা বেশি।

পড়া বাদ দিয়ে যদি আপনি অন্যকিছুর মধ্যে জড়িয়ে যান, বন্ধুত্ব করতে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। অর্থাৎ যখন যে কাজ করা প্রয়োজন সেই কাজ বাদ দিয়ে যদি আপনি ভিন্ন কাজ করেন, তাহলে আপনার জীবনে হতাশা আসবেই। এখনকার তরুণ-তরুণীদের জীবনে এত অশান্তি, অস্থিরতা এবং অপ্রাপ্তি কেন? কারণ যে সময় যেটা চাওয়া উচিত, সেটা বাদ দিয়ে তারা অন্য জিনিসের পেছনে ছোটে।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, এখনকার ছেলেমেয়েরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারছে না। তাদের আসক্তি বা নির্ভরশীলতার জায়গা হচ্ছে বন্ধু, মোবাইল বা সোশ্যাল মিডিয়া। যারা এই ডিজিটাল টক্সিনে আক্রান্ত হয়েছে তাদের আত্মবিশ্বাসটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্র তাদের মস্তিষ্ককে ভোঁতা করে দিচ্ছে, প্রযুক্তি তাদের বিকাশের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

যে শিক্ষার্থী পড়াশোনা বাদ দিয়ে, আড্ডা জমিয়ে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ডদের পেছনে ছুটে সময় নষ্ট করেছে আর যে শিক্ষার্থী ক্লাসে প্রথম হয়েছে—এ দুজন কি ক্যারিয়ারে বা কর্মজীবনের সাফল্যে কখনো সমান হবে? যে জানে এবং যে জানে না—এরা কি কখনো সমান হয়? জ্ঞানী এবং মূর্খ কি কখনো সমান হয়? আহাম্মক এবং প্রাজ্ঞ কি সমান হয়? হয় না।

অতএব যদি সুস্থ ও সুন্দর জীবন চান, তাহলে পেশাগত বা শিক্ষাগত প্রয়োজন ছাড়া কেউ ফেসবুক ব্যবহার করবেন না, অনলাইনে পড়ে থেকে অযথা সময়, অর্থ এবং মেধার অপচয় করবেন না।

প্রশ্ন : দিনের অনেকটা সময় আমি অনলাইনে কাটাই। এখন মনে হচ্ছে এটা অনেক বেশি প্রভাব ফেলেছে আমার ওপরে। ইদানীং পড়তে বসলে নেতিবাচক চিন্তায় মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। মেডিটেশন করতেও তখন ভালো লাগে না। শুধু ফেসবুকের চিন্তা আসে মাথায়। পড়তে বসলে অনেক ধরনের চিন্তা আসে। আশেপাশের মানুষ কী বলছে তা-ও নেতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করি। গুরুজী, জানাবেন কোন মেডিটেশনটা করব? আমি সবসময় আমার সমস্যা শনাক্ত করতে পারি কিন্তু নেতিবাচক হয়ে যাই।

উত্তর : আপনাকে আগে এই নেতিবাচকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মেডিটেশন করবেন পরে, আগে ফেসবুক আসক্তি থেকে মুক্ত হোন। কারণ এতে ফেসও নাই, বুকও নাই। গবেষকদের মতে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষকে ক্রমেই করে তুলছে অসামাজিক নিষ্ক্রিয় প্রাণী। আর এটা আপনার ক্ষেত্রে অসুস্থতার পর্যায়ে চলে গেছে।

আসলে ফেসবুক দ্রুতগতিতে সর্বমহলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ‘লাইক’ ফিচারটি চালু হওয়ার পর। লাইক পাওয়ার জন্যে খ্যাপাটে উসকানিমূলক মন্তব্য বা ছবি পোস্টের ঘটনাও কম নয়। মজার বিষয় হচ্ছে, লাইকের উদ্ভাবক মার্কিন প্রকৌশলী জাস্টিন রোজেনস্টাইন নিজেই তার ফোন থেকে এই ফিচারটি সরিয়ে ফেলেছেন। কেন? আসক্ত হয়ে যাওয়ার ভয়ে! তিনি নিজেই বলেছেন সে-কথা। তিনি তার উদ্ভাবিত ‘লাইক’ ফিচারটি সম্পর্কে বলছেন, এটি নকল আনন্দের এক চকমকে ঘণ্টি।

শুধু তা-ই নয়। ব্রিটিশ সংবাদপত্র *দ্য গার্ডিয়ান*-এর প্রতিবেদনে জানানো হয়, রোজেনস্টাইন অন্যান্য সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অ্যাপও ফোন থেকে মুছে দিয়েছেন। সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘এসব অ্যাপ মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে আর মানুষকে আসক্ত করে তোলে’। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, অ্যাপের নির্মাতারা সাবধানতা অবলম্বন করলেও এ ব্যাপারে অধিকাংশ ব্যবহারকারী মোটেই সচেতন নন।

ফেসবুক যেহেতু অনবরত মনোযোগের বারোটা বাজায়, তাই কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্যক্তির চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা। আইকিউ লেভেলও কমতে থাকে ধীরে ধীরে। বিশেষজ্ঞদের

রিপোর্ট হচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে মানুষের মধ্যে আসক্তি বাড়ছে। মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়ছে। লক্ষ্যে স্থির থাকার ক্ষমতা সীমিত হওয়ার পাশাপাশি মানুষ দিন দিন আরো বোকা হচ্ছে। এই প্রবণতাকে বলা হচ্ছে 'কন্টিনিউয়াস পার্শিয়াল অ্যাটেনশন'।

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যবিষয়ক নীতিনির্ধারক সংস্থা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ-এর অর্থায়নে ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ স্কুল অব মেডিসিন একটি গবেষণা চালায়। ১,৭৮৭ জন মার্কিন তরুণের জীবনাভ্যাস পর্যালোচনা করে গবেষকরা রায় দেন, একজন তরুণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যত বেশি সময় কাটাবে, তত সে হতাশ একাকী ও বিষণ্ন হয়ে পড়বে। গবেষকরা তাই ফেসবুককে আখ্যায়িত করেছেন 'অবসাদগ্রস্ত মানুষের আখড়া' হিসেবে।

গত কয়েক বছরে মার্কিন টিনএজারদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার পেছনেও স্মার্টফোনের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করছেন সে-দেশের মনোবিজ্ঞানীরা। অতএব আধুনিক যুগের এ এক নতুন রোগ—ফেসবুক। এই রোগ থেকে যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হতে পারবেন, আপনি তত ভালো থাকবেন।

প্রশ্ন : ফেসবুক, ইউটিউব, ক্ল্যাশ অব ক্ল্যান গেম আমার জীবনটাকে শেষ করে ফেলছে। আমাকে নিয়ে মা-বাবা উদ্বিগ্ন। এ কারণে পরিবারে অশান্তি লেগেই আছে। আমিও বুঝি এগুলো ভালো না, তারপরও দিনরাত ফেসবুকে না ঢুকলে বা গেম না খেললে ভালো লাগে না। গতকালও মধ্যরাত পর্যন্ত খেলেছি। ওগুলোর নেশায় পড়ে গেছি। গুরুজী, মুক্তির পথ বলবেন। আপনি বলেছেন ১১টার পর মোবাইল বন্ধ রাখতে, কিন্তু পারি না। মহাবিপদে আছি।

উত্তর : আপনার কষ্ট ও আকুতিটা আমি বুঝি। এটা শুধু আপনার একার কষ্ট নয়, এ প্রজন্মের প্রায় সবারই কষ্ট। আমরা আসলে মাইক্রোসফট-এর প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস ও অ্যাপল-এর প্রতিষ্ঠাতা স্টিভ জবসের মতো প্রযুক্তি মাফিয়াদের চক্রান্তের শিকার হয়ে গেছি। এই প্রযুক্তিবিদরা নিজেদের সন্তানদের ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে শুরু থেকেই জারি করেছেন কঠোর নিষেধাজ্ঞা। অথচ এসব উপকরণ তারা তুলে দিয়েছেন বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি পিতার সন্তানের হাতে।

বিল গেটস তার সন্তানদের বয়স ১৪ হওয়ার আগে মোবাইল ফোন কিনে দেন নি এবং কম্পিউটারও ব্যবহার করতে দিতেন দিনে ৪৫ মিনিটের

জন্যে। আর স্টিভ জবস তো নিজের উদ্ভাবিত আইপ্যাডই কখনো ব্যবহার করতে দেন নি তার সন্তানদের। এ সতর্কতা অবলম্বনের কারণ হলো, তারা ঠিকই জানেন যে, আইপ্যাড-আইফোন জাতীয় প্রযুক্তিপণ্য মানুষকে অতিমাত্রায় আসক্ত করে তোলে। তাই মুনাফার লোভে অপরের ঘরে অশান্তির কাঁচামাল জোগান দিলেও নিজের ঘর তারা আগলে রাখে ঠিকই।

যারা মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখে বা নেশায় আসক্ত করে নিজেরা কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে চায়, তাদের প্রতিনিধি হচ্ছে এই স্টিভ জবস, বিল গেটস, মার্ক জাকারবার্গ এবং এ ধরনের আরো যারা আছে। এরা নিজেদের সন্তানের জন্যে এসব প্রযুক্তিপণ্য নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু অন্যের সন্তানকে আসক্ত করেছে এই নেশায়।

যারা এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাজ করে তারা জানে কীভাবে মানুষকে আসক্ত করতে হবে। তাদের গবেষণার বিষয়ই হচ্ছে এটা। এই কর্মীরাই পরবর্তীকালে অনুতপ্ত হয়েছে এবং তাদের বয়ানেই এ বিষয়গুলো ইদানীং বেরিয়ে আসছে। মনে রাখবেন, যেটার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন না, সেটাই একসময় আপনার ক্ষতির কারণ হবে। কারণ এটা একটা শক্তি—নেতিবাচক শক্তি। যেমন, গাড়ির গতির ওপর যদি আপনার নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে গাড়ি আপনার জন্যে অভিশাপ।

মোবাইল ফোনসহ এ ধরনের যন্ত্র বা তথাকথিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো এমনভাবেই তৈরি করা হয়, যাতে এর ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ না থাকে। এর উদ্ভাবকদের লক্ষ্যই হলো, এই নেশা থেকে মানুষ যেন বেরিয়ে আসতে না পারে। কারণ ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড নিয়ে মানুষ যত নেশাগ্রস্ত হবে, তত এর উদ্ভাবকরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে।

একবার একটা রিপোর্ট দেখেছিলাম—দুই মা নাকি এক পত্রিকা অফিসে গিয়েছেন। তাদের প্রশ্ন, কীভাবে সন্তানদের বাঁচাবেন ফেসবুক আসক্তি থেকে এবং কীভাবে নিজেরা বাঁচবেন। এক মায়ের অবস্থা হচ্ছে, ছেলেকে টাকা দিলেই সে ইন্টারনেটের পেছনে খরচ করে এবং টাকা না দিলে সে আত্মহত্যার হুমকি দেয়। ওই নারী বলছেন, ছেলের মতো স্বামীকেও তার অচেনা লাগে। যতদিন ছেলে ভালো রেজাল্ট করেছে ততদিন স্বামীর কাছে কদর পেয়েছেন। এখন আর পান না। ছেলের কারণে উঠতে-বসতে স্বামী তালাকের হুমকি দেয়। এখন ছেলেকে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলেছে।

অন্য মায়ের দশা আরো করুণ। তাকে তার স্বামী ছেড়ে চলে গেছেন মাসখানেক হলো। ছেলেকে পুলিশে সোপর্দ না করলে আর ফিরবেন না বলেছেন। আর ছেলে হুমকি দিয়েছে, পুলিশে সোপর্দ করলে ফিরে এসে

মা-বাবাকে খুন করে ফেলবে। ইদানীং টাকার জন্যে ছেলে তার মাকে মারধরও করে।

আসলে আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্য হাতিয়ে নিয়ে তা বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানির কাছে বিক্রি করে আপনাকে পণ্যদাস বানিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়াই তাদের কাজ। ২০১৭ সালে শুধু বিজ্ঞাপন থেকেই ফেসবুকের আয় ছিল ৪০ বিলিয়ন ডলার। আপনার মতো কোটি কোটি মানুষ তাদের কাছে গিনিপিগ মাত্র।

এখন যেহেতু আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে, এসব আসক্তি আপনাকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না, আপনাকে নিয়ে আপনার মা-বাবা উদ্বিগ্ন এবং পরিবারেও অশান্তি হচ্ছে। তাই এই আসক্তিগুলোকে থুথু দিতে হবে। যে-কোনো মূল্যে এ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আপনি ৪০ দিনের জন্যে লামায় খেদমতায়নে চলে যান। যেতে হবে কিন্তু মোবাইল, আইপ্যাড এ জাতীয় সবকিছু ছেড়ে। একটা নির্দিষ্ট রুটিনের মধ্যে অভ্যস্ত করুন নিজেকে। আমরা আশা করি, আপনি এক নতুন জীবন পাবেন।

মনে রাখবেন, আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে আপনাকেই। আপনি নিজে যদি না বদলান, আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। তাই ভার্চুয়াল মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণে জীবনকে ছেড়ে দেবেন না। নিজেকে বদলানোর দায়িত্ব নিজে নিন। নিয়ত করুন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোন—আসক্তিমুক্ত হয়ে আমি সুস্থ জীবনে ফিরতে চাই। আর রাত ১১টার পর মোবাইল ফোন পুরোপুরি বন্ধ রাখুন। আমরা আপনার জন্যে দোয়া করব। আপনি যদি প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যান, পরম করুণাময় অবশ্যই সহযোগিতা করবেন।

প্রশ্ন : ক্লাসের প্রয়োজনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করতেই হচ্ছে। কিন্তু আমি এটা ব্যবহার করে মানসিক অশান্তিতে ভুগছি। এ-ছাড়া আমি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা পছন্দ করি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করায় বন্ধুরা আমাকে নাক উঁচু মনে করে। এই সমস্যা সমাধানে কী করা উচিত?

উত্তর : মানুষকে বিষণ্ন ও অস্থির করার জন্যে এসব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা অনেক। এখন সবাই এগুলোর ক্ষতিকর দিক নিয়ে বলছেন। আমরা বলছি সেই ২০০৯ সাল থেকে। এটা শয়তানের বিষ্ঠা, যা ব্যবহার করলে আপনি মানসিক অশান্তিতে ভুগবেন। তবে পড়াশোনা বা পেশাগত প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকে না। এ-ক্ষেত্রে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই করবেন। কিন্তু

সচেতন থাকবেন যেন প্রয়োজনের চেয়ে একটুও বেশি সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নষ্ট না হয়।

আর সবসময় শুদ্ধ ভাষায় কথা বলবেন। যে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে, সে আরো ভালো বন্ধু হতে পারে। বন্ধু সে-ই, যার সাথে আপনার চেতনার মিল রয়েছে। সহপাঠীর কথায় কেন প্রভাবিত হবেন? তাদের কথায় মনে মনে হাসবেন, কখনো রি-এক্ট করবেন না।

প্রশ্ন : ছোটবেলা থেকে প্রচুর মুভি দেখতে দেখতে বড় হই—হারকিউলিস, রবিনহুড, সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান ইত্যাদি। এখন আমার সমস্যা হলো, যখন কোনো পত্রিকায় ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অনাচারের খবর দেখি তখন মাথা গরম হয়ে যায়। কল্পনায় আমি কখনো সুপারম্যান, কখনো কখনো স্পাইডারম্যান হয়ে সমস্যার সমাধান করে ফেলি। কিন্তু যখন বাস্তবে ফিরে আসি, তখন নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়। খুব কান্না করি।

উত্তর : এর মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা সেই চিরায়ত সত্যটা বুঝতে পারছি যে, আমাদের নার্ভাস সিস্টেম বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যে কোনো তফাত করতে পারে না। মুভি দেখতে দেখতে আপনি নিজেকে সুপারম্যান বা স্পাইডারম্যান ভাবা শুরু করেন এবং অন্যায় দেখলে কল্পনায় স্পাইডারম্যান, সুপারম্যানের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু পরে দেখেন যে, না, যেখানে ছিলেন সেখানেই আপনি বসে আছেন। ব্রেন ও অবচেতন মনের এই শক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করুন—নিজের কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে।

আর মনে রাখবেন, সুপারম্যান-স্পাইডারম্যান নয়, অন্যায়ের প্রতিকার সবসময় মানুষই করেছে। মানুষের ওপর মানুষ অন্যায় করেছে, আবার এর প্রতিকারও মানুষই করেছে। যদি ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তবে বুঝবেন মানুষের শক্তি কাল্পনিক সুপারম্যানের থেকে বেশি।

অতএব ভেতরের শক্তিকে জাগ্রত করুন। বাস্তববাদী হোন এবং আমরা যে চিন্তাচেতনা প্রসারে কাজ করছি, তাতে সময় দিন। কারণ আমরা যদি সমাজের অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারি, যদি চারপাশের মানুষকে অন্যায় করা থেকে বিরত রাখতে পারি, তবে আমাদের সমাজ থেকে অন্যায়-অবিচার এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। আর যদি তা না করি বা করতে চেষ্টা না করি, তাহলে আপনি একা মারামারি করে বা কেঁদেকেটে কিছু করতে পারবেন না। সবার আগে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে, ইতিবাচক মানুষের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং আমরা সেই কাজটিই করছি।

প্রশ্ন : মনছবি দেখি এবং বিশ্বাসও করি যে, আমি পারব। কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করা হয় না। ঘুরে বেড়াই ভার্চুয়াল জগতে। এ থেকে বের হতে পারছি না। কী করব?

উত্তর : মনছবি অনুযায়ী কাজ না করে ভার্চুয়াল জগতে ঘুরে বেড়ালে আপনিও ভার্চুয়াল হয়ে যাবেন। বাস্তবে তো কিছু হবে না। আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছেন আর অর্থ ইনকাম করছে প্রযুক্তি মাফিয়ারা। আপনি সারাদিন স্ক্রিনে কতক্ষণ ব্যয় করছেন? আর বাস্তব কাজ কতটুকু করছেন? আপনার মনছবির জন্যে নীরবে যে কাজ করা প্রয়োজন, এই কাজ আপনি কতটুকু করছেন?

আপনি পড়তে বসেছেন, বান্ধবী বা বন্ধু অনেকদিন পরে ফোন করেছে। আপনি কথা বলছেন। ওহ! কতদিন পরে ফোন করেছে! পড়াটা তো পরেও করা যাবে। বান্ধবীর সাথে একটু কথা বলে নিই। বান্ধবী হয়তো অবসরে তার কোনো কাজ নেই বলে ফোন করেছে, আর আপনার তখন কাজের সময়। আপনি কাজ বাদ দিয়ে তার সাথে গল্প করছেন। একটু-ই তো গল্প। এই একটু একটু করে আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করে ফেলি। যে কারণে অধিকাংশ মানুষ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না।

আপনারা জানেন সেই ঘটকের গল্প। ঘটক পাত্রের বিবরণ দিচ্ছে যে, পাত্র খুব ভালো। তবে মাঝে মাঝে একটু পেঁয়াজ খায়। ... একটু পেঁয়াজ খায় তাতে আর কী হবে? পেঁয়াজ কখন খায়? ... যখন একটু মাংস খায়। ... মাংসও খায় যখন একটু মদ খায়। ... আর মদ কখন খায়? ... যখন বাইজী বাড়িতে যায়।

তো এই 'একটু' হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক। এটা আমাদের জীবনের গতিটাকে নষ্ট করে দেয়। কীভাবে আপনার গতি নষ্ট হয়? সিনেমা দেখে আপনি ফ্যান্টাসির জগতে হারিয়ে যান। আর এখনকার সিনেমাগুলো রূপকথাকেও হার মানায়।

মিডিয়ার ৯০%-ই হচ্ছে ফ্যান্টাসি। এমনভাবে সিনেমা বানানো হয়, যেন আপনি আলাদিনের জগতে হারিয়ে যেতে পারেন। আপনার জীবনকে গড়ার জন্যে আপনি যেন কাজ না করেন। কল্পনার জগতে বিচরণ করে আপনি যেন সত্যিকার জীবনবোধ, জীবনজিজ্ঞাসা নিয়ে মাথা ঘামাতে না পারেন। আর এখনকার সবচেয়ে বড় সময়খাদক হলো টিভি সিরিয়াল/ ওয়েব সিরিজ আর স্মার্টফোন। এগুলোর পেছনে নীরবে আপনি আপনার সময় ক্ষয় করছেন। এর ফলাফল, সমাজে গীবত পরচর্চা কুটনামি চক্রান্ত ষড়যন্ত্র আর ভায়োলেন্স বেড়ে যাচ্ছে।

ফ্যান্টাসি বা কল্পনার জগতে থেকে আপনি কখনো সফল হতে পারবেন না। যে সফল সে কখনো ফ্যান্টাসিকে প্রশ্রয় দেয় না। কারণ সফল হওয়ার জন্যে প্রয়োজন নীরব কাজ, নিরলস পরিশ্রম। একজন মানুষ তখনই এটা করতে পারে, যখন সে বিশ্বাসে অবিচল থাকবে।

অর্থাৎ বিশ্বাস এবং আশা এই দুটোতেই অবিচল থাকলে একজন মানুষ নীরবে কাজ করে যেতে পারে। এজন্যে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম খুব সুন্দরভাবে বলেছেন—*বিশ্বাস আর আশা নাই যার, যেও না তাহার কাছে। নড়াচড়া করলেও সে মরা, জ্যান্ত সে মরিয়াছে।*

এই বিশ্বাস এবং আশাকে জিইয়ে রাখার জন্যেই প্রয়োজন ইতিবাচক পরিমণ্ডল। কারণ আমাদের চারপাশে সাধারণভাবে নেতিবাচক লোক বেশি। প্রতিহিংসাপরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ এবং হতাশাবাদী লোক বেশি, যারা ওই ফ্যান্টাসির জগতে নিজেরা থাকতে চায়। অন্যদের রাখতে চায়। বাস্তবে সরাসরি কাজের মধ্যে তারা প্রবেশ করতে চায় না। সবসময় বাস্তব কাজে মনোনিবেশ করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো মেডিটেশন। মেডিটেশনে আত্মনিমগ্নতা ও সৎসঙ্ঘে একাত্মতা আপনাকে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।

প্রশ্ন : আমি ডেন্টাল কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কিছুদিন পরই আমার পরীক্ষা। কিন্তু লেখাপড়ার কোনো চিন্তা আমার মধ্যে নেই। পড়ার আগে অটোসাজেশন দেই ঠিকই, একটু পরই ঢুঁ মারি ফেসবুকে। তারপর মোবাইলে আটকে যাই। এভাবে একসময় রাত শেষে ভোর হয়ে যায়। তারপর আর পড়ার সময় থাকে না। আর পড়তে বসলে পারিপার্শ্বিক নানান অপ্রয়োজনীয় কথা মাথায় আসে। একবার একটা মনছবি দেখি, আবার বদলে ফেলি। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি যে, কোনটা আমার জন্যে সঠিক। মাঝে মাঝে মনছবিকে অনেক কঠিন মনে হয়। আর যখনই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি তখনই মোবাইলকে সঙ্গী করে নিই এবং লেখাপড়ার কথা ভুলে যাই।

উত্তর : অটোসাজেশন দিয়ে পড়তে বসে ফেসবুকে ঢুকে গেলে কী হবে? শেষ পর্যন্ত ফেসবুক আসক্ত হয়ে আপনি অবসাদগ্রস্ত বিষণ্ন মানুষের জীবনযাপন করবেন, যা কোনোভাবেই প্রত্যাশিত নয়। এভাবে চলতে থাকলে একটু একটু করে এটা অসুস্থতার পর্যায়ে চলে যাবে। আপনার পড়াশোনা, আপনার ক্যারিয়ার—সবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, স্মার্টফোন আসার পরে মানুষের

মনোযোগের স্প্যান কমে গেছে। আরো ক্ষতি হওয়ার আগেই সতর্ক হতে বলেছেন পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদরা। একটি কলামে একই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ—

'আমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াই, তারা সবাই একটা বিষয় লক্ষ করেছি। কয়েক বছর থেকে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা কমে আসছে। অনেক সময় মনে হয় পড়ানোর সময় আমি যেটা বলছি ছাত্রছাত্রীরা সেটা শুনছে, কিন্তু বোঝার জন্যে মস্তিষ্কটি ব্যবহার করতে তাদের ভেতর একধরনের অনীহা, একধরনের আলস্য। এ নিয়ে কোনো গবেষণা হয় নি। আমার কাছে কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, এটি হচ্ছে ফেসবুক-জাতীয় সামাজিক নেটওয়ার্কে বাড়াবাড়ি আসক্তির ফল। এটি নিশ্চয়ই শুধু আমাদের দেশের সমস্যা নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা। আমি একাধিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে দেখেছি, মাদকে আসক্তি এবং ফেসবুকে আসক্তির মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।' (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০ অক্টোবর ২০১৭)

অতএব আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে এই ফেসবুক থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে আসা। না হলে আপনার জীবনে কখনো সুখ আসবে না, শান্তি আসবে না। কারণ আসক্ত মানুষের জীবনে কখনো শান্তি আসে না।

আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রথমে আপনার কষ্ট হবে। যে-কোনো ধরনের মাদকাসক্তি থেকে বেরিয়ে আসাটা কষ্টের। কিন্তু যখন সে বেরিয়ে আসে, তখন সে অনন্ত কল্যাণ আর আনন্দময় জীবনের সন্ধান পায়। তাই প্রথমত আপনি সোশ্যাল মিডিয়া ও মোবাইল আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসুন। তারপর ঠান্ডা মাথায় জীবনের লক্ষ্য ঠিক করে মনছবি দেখুন এবং পড়াশোনায় মনোনিবেশ করুন।

প্রশ্ন : করোনার ফলে আমাকে অনলাইনে ক্লাস করতে হয়েছে। তাই দিনের সিংহভাগ সময় কাটাতে হয়েছে স্ক্রিনের সামনে। ফলে আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্ত হয়ে পড়েছি। কোনোভাবেই এই আসক্তি কমাতে পারছি না। পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে পারছি না। পরামর্শ দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর : 'আমি আসক্ত' এটা বুঝতে পারাই হচ্ছে প্রথম ধাপ। আমি বিশ্বাস করি আপনার মধ্যে এই আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসার শক্তিও আছে। এখান থেকে বেরুনোর একটাই উপায়; সেটা হচ্ছে 'না' বলা, আমি আর এভাবে সময় নষ্ট করব না এবং এটাই ফাইনাল।

আসলে খুব মায়া হয় এই শিশুদের জন্যে। এদের সর্বনাশ নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তা হয়। তবে যে-কোনো সর্বনাশ হোক, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি আমাদের রয়েছে। এটা আমাদের জাতীয় শক্তি। ইনশাআল্লাহ! আমরা এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াব সময়ের সাথে সাথে, যদি আমরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করি এবং সবাইকে নিয়ে নিয়মিত মেডিটেশন করি।

আর মা-বাবা এবং অভিভাবকদেরকে বলব, সন্তানের ওপর রাগ করবেন না। কারণ এসময় তাদের স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহটা নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের অপরিপক্ব মন অনেক অস্থির হয়ে গেছে। তারা খিটখিটে হয়ে গেছে, রেগে যাচ্ছে, কথা শুনছে না। এখন তাদের জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে মমতা, হৃদয়ের টান। সন্তানকে কাছে টেনে নিন, তাকে সময় দিন, সঙ্গ দিন, পরামর্শ দিন এবং তাকে সবসময় ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামগুলোতে উদ্বুদ্ধ করে নিয়ে আসুন। তাহলে দেখবেন যে, করোনাভাইরাস যেভাবে উবে যাচ্ছে, ডিজিটাল আসক্তিও একদিন উবে যাবে।

প্রশ্ন : আমি স্মার্টফোন ব্যবহার করি না। কিন্তু টিভি দেখতে পছন্দ করি। স্মার্টফোন ব্যবহার করলে যে ক্ষতি হয়, টিভি দেখলেও কি তেমন ক্ষতি হয়? টিভিও কি আসক্তি সৃষ্টি করে?

উত্তর : টিভিতে কী দেখবেন এবং কতক্ষণ দেখবেন এটা আপনি ঠিক করবেন। মনমতো প্রোগ্রাম খুঁজতে গিয়ে টিভি চ্যানেল বদলাতে থাকবেন না। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ থাকবে আপনার কাছে। এর পরিবর্তে যদি টিভি আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে, তাহলে আপনি আসক্ত হয়ে পড়বেন। টিভি তখন আপনাকে পেয়ে বসবে। আসক্তি এড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বেছে নেয়া। সোফায় বসে নয়, বরং বজ্রাসনে বা দাঁড়িয়ে টিভি দেখবেন। আর নিয়ম করে সপ্তাহে দুই-তিন দিন ডিজিটাল ফাস্টিং করবেন যে, আজ আমি টিভি দেখব না। তাহলে আপনি আসক্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমার এক প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলেছিলেন, আমি যেন জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল না ধরি। আপনার পরামর্শ পেয়ে আমি অনেক উপকৃত। আমি আগে বন্ধুদের দেখাদেখি 'বিটিএস' নামক পপ ব্যান্ডে আসক্ত ছিলাম। সেটা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি। আমি অযথা আর মোবাইল ধরি না। দোয়া করবেন যাতে ডিজিটাল টক্সিন থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারি।

উত্তর : অনুসরণ করার এই যে চেষ্টা—এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আসলে পড়ে যাওয়াটা দোষের নয়, উঠে না দাঁড়ানোটা হচ্ছে দোষের। ঘুরে না দাঁড়ানোটাই হচ্ছে ব্যর্থতা। ভুল হতেই পারে, যে-কোনো বয়সে হতে পারে। শিশু ও কিশোরদের তো ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু যত বার ভুল করুন না কেন, বার বার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এটাই হচ্ছে সাফল্য।

প্রশ্ন : ইদানীং ডিজিটাল মাদক নিয়ে আমি খুবই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। আমি নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আমি বুঝতে পারি স্ক্রিন আসক্তি আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু মোবাইল সামনে পড়ে থাকতে দেখলেই হাত চুলকায়। অশান্তি লাগে যে, কখন ফোনটা ধরব। আমি যতই বলি আর ফোন ধরব না, কিন্তু মোটিভেটেড থাকতে পারি না। এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় বললে উপকৃত হতাম।

উত্তর : আপনাকে মোবারকবাদ জানাই কথাটা সাহস করে বলার জন্যে। আসলে মানুষ কোনো সচেতন প্রয়াস ছাড়াই অটোমেটিক মোবাইল ধরছে এবং নির্দিষ্ট অপশনে চলে যাচ্ছে। কারণ তার শরীর ও ব্রেনের সাথে যন্ত্রটির কন্ডিশনিং হয়ে গেছে এবং দেহ-মন আসক্ত হয়ে গেছে। এই বিষাণু থেকে মুক্ত হতে হবে, ডিটক্সিফাই করতে হবে। অটোমেশনটাকে বিকল করতে হবে। এজন্যে অন্তত ৩০ দিন সময় লাগে।

এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে আমেরিকাতে। তারা এখন প্রযুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যে উপবাস করছে। এটাকে বলা হচ্ছে ডোপামিন ফাস্টিং। ডোপামিন হলো আনন্দবর্ধক রাসায়নিক। স্ক্রিন দেখার ফলে যে উদ্দীপক হরমোন তৈরি হয়, ডোপামিন ফাস্টিং করলে সেই প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়।

অতএব এখন থেকে ৩০ দিনের ডিজিটাল ফাস্টিং বা উপবাস করুন। প্রথমে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফাস্টিং; এসময় মোবাইল ও সমস্ত স্ক্রিন দূরে রাখুন এবং রাত ১১টায় ঘুমিয়ে পড়ুন। ঘুম কিন্তু প্রকৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী ওষুধ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোবাইলের অপব্যবহার শুরু হয় রাতে—রাত ১০টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত। অর্থাৎ যে সময়টা ঘুমানো দরকার সেই সময়টা ডিস্টার্ব করে ঘুমের সাইকেলটা নষ্ট করে দিচ্ছে এই আসক্তি। যে কারণে ছেলেমেয়েরা এত রূঢ় হয়ে উঠছে। বেপরোয়া নিষ্ঠুর মনোভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে।

ঘুমের সাইকেলটা ঠিক হলে দিনের বেলা এর নেশাগত প্রভাব থেকে অনায়াসে বেরিয়ে আসা যায়। এখন তো দিনের বেলা মোবাইল ছাড়া থাকা

কঠিন ব্যাপার। কিন্তু দিনেও শুধু প্রয়োজনে মোবাইল ব্যবহার করবেন। প্রয়োজন শেষ, ব্যস, স্ক্রিন লক করে দিন। আর সপ্তাহে একদিন একটা ফোনলেস ডে পালন করুন। পরের দিন মোবাইল চেক করবেন এবং যারা কল করেছিল তাদেরকে কল ব্যাক করবেন। ধরুন, আপনি অসুস্থ হয়ে হসপিটালাইজড হলে পৃথিবী কি আপনার জন্যে আটকে থাকবে? অতএব আপনি ফোন না করলে বা ফোন না ধরলে পৃথিবী বরবাদ হয়ে যাবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই।

অর্থাৎ জীবনের ওপরে আপনার নিজের নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। আপনার নিয়ন্ত্রণ যেন প্রযুক্তির হাতে যন্ত্রের হাতে চলে না যায়। আপনার নিয়ন্ত্রণ যাতে শোষকের হাতে না যায়, শয়তানের হাতে না যায়। আপনার নিয়ন্ত্রণ যেন আপনি স্রষ্টার হাতে দিতে পারেন, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলতে পারেন।

স্বাভাবিকভাবে এই উপবাসের শুরুতে কষ্ট হবে। কারণ মাদক যে-রকম মানুষকে প্রতিটি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আসক্ত করে ফেলে এই স্মার্টফোন আসক্তিও সে-রকম। বার বার মনে হবে যে, ইস! কী যেন মিস করছি। প্রিয়জনকে মিস করার মতো অনুভূতি হবে। অনেকের জন্যে এটা প্রিয়জনের চেয়েও প্রিয় হয়ে গেছে। অর্থাৎ যারা আসক্ত তাদের কাছে নেশা অনুভূত হওয়ার সময় প্রিয়জনের চেয়েও ড্রাগস বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে। এজন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হয় যে, আমি এই ধ্বংসাত্মক আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসবই। আমি নেশা ছাড়ব—এই ইচ্ছাশক্তিটাকে দৃঢ় করতে হয়। যেহেতু আপনার ইচ্ছা আছে, ইনশাআল্লাহ আপনি পারবেন।

প্রেম

প্রেমে পড়া

প্রশ্ন : প্রেম স্বর্গীয়। নিজেকে বিশ্বপ্রেমিক ভাবতেই ভালো লাগে। আগে সুন্দর কাউকে দেখলেই ভালো লাগত। প্রেম করতে ইচ্ছে করত। বন্ধুরাও উৎসাহ দিত। কখন যে জড়িয়ে পড়তাম টেরও পেতাম না! কিন্তু কোনো সম্পর্কই বেশিদিন টেকে নি। এখনো আমি বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ অনুভব করি! আবার হতাশায়ও ভুগি। এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : প্রেম নিঃসন্দেহে স্বর্গীয়। তবে মর্ত্যে আসতে আসতে এর মধ্যে নানা বৈষয়িক মিশেলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা হয়ে গেছে পণ্য। স্বর্গীয় প্রেম হচ্ছে অকাতরে নিজেকে উজাড় করে দেয়ার নাম। যেমন, দেশপ্রেম—দেশের জন্যে নিজের সবকিছু উজাড় করে দেয়ার নাম; স্রষ্টাপ্রেম—স্রষ্টার চিন্তায় বিভোর থাকার নাম; মানবপ্রেম—মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার নাম। স্থানকাল ভেদে প্রেমের প্রকাশ ঘটে কখনো মমতায়, কখনো শ্রদ্ধায়, কখনো ভালবাসায়, কখনো সমমর্মিতায়।

আপনি নিজেকে 'বিশ্বপ্রেমিক' ভাবলে দোষ নেই, যদি বিশ্বের কল্যাণে নিজেকে উজাড় করে দিতে পারেন। আবার সুন্দর কাউকে বা কিছুকে ভালোলাগার মধ্যেও কোনো দোষ নেই, যদি বিষয়টি সীমার মধ্যে থাকে। তবে আপনি যাকে প্রেম বলছেন, এটা আসলে নরনারীর পরস্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ। এর শুরুটা ভালোলাগা থেকে। কিন্তু সময় এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তা শুধু ভালোলাগায় সীমিত থাকে না। সৃষ্টি হয় তীব্র আবেগ ও জৈবিক আকর্ষণ। যার সুস্থ পরিণতি হচ্ছে বিয়ে ও সুন্দর পরিবার। আর অসুস্থ পরিণতি হচ্ছে আসক্তি ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার। একেই তখন বলা হয় প্রেমাসক্তি বা প্রেমরোগ, যা মাদকাসক্তির চেয়েও বিধ্বংসী।

মাদক যে-রকম একজন মানুষের সুস্থ বোধবুদ্ধি নাশ করে ফেলে, প্রেমরোগ বা প্রেমাসক্তিও তা-ই। এটা আমাদের কথা নয়, বরং বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ তথ্য। এ সম্পর্কে এক সাড়া জাগানো গবেষণা চালান ইতালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডোনাতেলা ম্যারাযিতি। মাত্র ছয় মাস বা তারও কম সময় ধরে প্রেম করছে, এমন ২০ জুটিকে নিয়ে তিনি এ গবেষণাটি পরিচালনা করেন।

এ ধরনের জুটিদের বেছে নেয়ার কারণ ছিল, প্রেমে পড়ার এই ধাপটায় প্রেমিক-প্রেমিকারা আসলে একজন আরেকজনের কথা ভেবেই বেশিরভাগ সময় পার করে। তা-ই হচ্ছিল। এই জুটিরা দিনে অন্তত চার ঘণ্টা সময় হয়

একসাথে থাকত, নয়তো একজন আরেকজনের কথা ভাবত।

এদের ব্লাড স্যাম্পলের সাথে অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার (ওসিডি) নামক মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের ব্লাড স্যাম্পল মিলিয়ে অধ্যাপক ম্যারাযিতি দেখলেন, দুই দলেরই দেহে সেরোটনিনের মাত্রা স্বাভাবিক মানুষ, যারা প্রেমে পড়ে নি বা মানসিক অসুস্থতায়ও আক্রান্ত নয়, তাদের চেয়ে ৪০% কম।

সেরোটনিন হলো মস্তিষ্কের এমন এক নিউরোট্রান্সমিটার, যার পরিমাণ কমে গেলেই বিষণ্নতা অবসাদ খিটখিটে মেজাজ অর্থাৎ ওসিডির মতো মানসিক রোগ দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানী অ্যালেন বার্শাইড বলেন, প্রেমে পড়লে মানুষ যে বোধবুদ্ধিশূন্য হয়ে যায়, প্রেমিক বা প্রেমিকার সবকিছুকেই তখন ভালো লাগে, দোষ থাকলেও তা চোখ এড়িয়ে যায়, তার কারণ এটাই। অন্ধ আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিনের ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সংখ্যায় *লাভ দ্য কেমিক্যাল রি-একশন* শিরোনামে এই বিস্তারিত প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এ প্রেমাবেগের স্থায়িত্ব খুবই কম। আজকে যাকে না পেলে বাঁচব না বলে মনে হচ্ছে, বছর না ঘুরতেই মনে হতে পারে যে, তাকে না ছাড়লে বাঁচব না। ছয় মাস আগেও যে চেহারাটা একনজর দেখার জন্যে অস্থির হতো মন, এখন সে চেহারাটাই হতে পারে সবচেয়ে অসহ্য দৃশ্য।

এর কারণ কী? বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এর পেছনে আছে ডোপামিন নামে আরেক নিউরোট্রান্সমিটারের ভূমিকা। প্রেমিক/ প্রেমিকাকে দেখলে মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অংশ এই ডোপামিন দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। এর প্রভাবে শরীর-মনে সৃষ্টি হতে পারে বাঁধভাঙা আনন্দ, অসাধারণ প্রাণশক্তি, গভীর মনোযোগ ও সীমাহীন অনুপ্রেরণা। এজন্যেই হয়তো যারা সদ্য প্রেমে পড়ে, হঠাৎ করেই তাদের মধ্যে একধরনের বেয়াড়া, একগুঁয়ে, দুঃসাহসী চরিত্র ফুটে ওঠে। ঘর ছাড়বে, সিংহাসন ছাড়বে, জীবন দেবে; তবুও প্রেম ছাড়বে না—এমনই এক বেয়াড়াপনা দেখা দেয় তাদের মধ্যে। বিজ্ঞানীরা বলেন, মাদকাসক্তির সাথে এ অবস্থার প্রচণ্ড মিল রয়েছে।

কারণ পরিমাণ যা-ই হোক, দেখা যায়, কিছুদিনের মধ্যেই মাদকসেবী ওই পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নেশা হওয়ার জন্যে আরো বেশি পরিমাণে মাদক সে নিতে চায় বা নেয়। প্রেমের ক্ষেত্রেও তা-ই। তীব্র প্রেমাবেগের আতিশয্য খুব বেশি সময় স্থায়ী হয় না, যদি নতুন নতুন উদ্দীপক সংযোজিত না হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে তো আর তা সম্ভব নয়। ফলে অল্পতেই ঘোলাটে হয়ে যায় প্রেমাবেগের রঙিন চশমা।

আসলে স্বর্গীয়, পবিত্র ইত্যাদি নানারকম বিশেষণ যুক্ত করে যে প্রেমকে মহান বানানোর চেষ্টা চলে, তা যে স্রেফ বংশধারা রক্ষার জন্যে নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদারই নামান্তর, তা বিজ্ঞানীদের কথায় স্পষ্ট হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, পারস্পরিক আকর্ষণের ক্ষেত্রে একজন পুরুষ বা একজন নারী অবচেতনভাবেই এমন সঙ্গীকে পছন্দ করে, যে তাকে সুস্থ-সবল একটি সন্তান উপহার দিতে পারবে।

এক জরিপে দেখা গেছে, মহিলাদের কোমর ও হিপের বিশেষ গড়ন এবং পুরুষদের লম্বা-চওড়া ও শক্ত গড়ন, যা তাদের টেস্টোস্টেরন হরমোন উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হওয়াকে নির্দেশ করে, তার ওপর নির্ভর করে কে কতটা আকর্ষণীয় হবে। আর নারী ও পুরুষের এ দুটো বৈশিষ্ট্যই তাদের সন্তান জন্মদানের সামর্থ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

তাই আপনি প্রেমকে রোগে পরিণত না করে স্বাভাবিক সীমার মধ্যে রাখুন। ভালোলাগার শক্তিকে সুখী পরিবার নির্মাণে কাজে লাগান। আপনার হতাশা থাকবে না। এগিয়ে যাবেন আপনি মুক্ত ও পরিতৃপ্ত জীবনের পথে।

প্রশ্ন : কেউ যদি স্বেচ্ছায় সম্পর্কচ্ছেদ করে, তাহলে আমার করণীয় কী? সে-ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : করণীয় হলো 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলা। আর বলা যে, তোমার পথ তোমার, আমার পথ আমার। একজন স্বেচ্ছায় সম্পর্কচ্ছেদ করে চলে গেছে—কী করার আছে আপনার? সম্পর্কচ্ছেদ করাও তো কঠিন ব্যাপার। অনেক সম্পর্ক তো আঠার মতো লেগে থাকে, ছেদ করা যায় না। বার বার ঘুরে ঘুরে আসে। সে তুলনায় এ-তো অনেক ভালো হয়েছে যে, স্বেচ্ছায় চলে গেছে। আপনি 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' বলে নিজের কাজে মন দিন।

প্রশ্ন : আমি একজনকে পেতে চাই। তাকে পেতে হলে বা ভালবাসতে হলে কীভাবে প্রভাবিত করতে হবে?

উত্তর : কারো ভালবাসা পেতে হলে আগে নিজে তাকে ভালবাসতে হবে। কারো কাছ থেকে যদি কোনোকিছু আপনি চান, তবে আপনাকে তা আগে দিতে হবে, তাহলেই পাবেন। আপনি কাউকে সালাম দেবেন না, আর ভাববেন সবাই আপনাকে সালাম দেবে—এটা কখনো হয় না। নবীজীকে (স) কেউ আগে সালাম দিতে পারতেন না। সবসময় তিনি আগে সালাম দিতেন।

ফলে অন্যেরাও তৈরি থাকতেন যেন তারা আগে সালাম দিতে পারেন। অতএব আপনি যা চান, আগে তা দিতে হবে। এটাই স্বাভাবিক।

সত্যিকারের ভালবাসা দেয়ার নাম, পাওয়ার নয়। পাওয়ার নাম হলো কামনা। আপনি কাউকে ভালবাসেন—যদি এটা প্রমাণ করতে পারেন, সে কেন ভালবাসবে না? অবশ্যই বাসবে। কিন্তু এর পেছনে দৌড়াবেন না। যত দৌড়াবেন তত সোনার হরিণের মতো তা দূরে চলে যাবে। তাকে অনুভব করতে দিন যে, আপনি তাকে ভালবাসেন। দেখবেন যে, সে-ও অনুভব করতে শুরু করেছে। তার মধ্যেও আপনার প্রতি একটা টান তৈরি হবে প্রাকৃতিক নিয়মেই। আমরা আসলে জোরজবরদস্তি করে চাপিয়ে দিতে চাই। কিন্তু চাপিয়ে দিয়ে কখনো ভালবাসা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন : ভার্সিটিতে আমি একটি ক্লাবের মডারেটর। এখানে প্রচুর সময় দিতে হয়। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের যে-কোনো প্রয়োজনেও আমি সাড়া দেই। এদিকে আমি আমার পড়াশোনা নিয়ে সন্তুষ্ট নই। ইদানীং আবার একজনের প্রতি ভালোলাগা তৈরি হয়েছে। আমার এখন কী করা উচিত?

উত্তর : সফল মানুষেরা সবকিছুর মধ্যে সুসমন্বয় করেন। একসাথে সবকিছু করা যায় না। এটা যারা করতে গেছেন, তারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই আর করতে পারেন নি। আসলে ছাত্রজীবনে লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত করে অন্য আর যা-কিছুকেই গুরুত্ব দেবেন, তা শেষ পর্যন্ত অর্থহীন বলে পরিগণিত হবে। কারণ ছাত্রজীবন হলো নিজেকে গড়ার সময়। অধ্যয়ন-অনুশীলনের মাধ্যমেই তা করতে হবে। কিন্তু তথাকথিত এক্সট্রাকারিকুলার দক্ষতা অর্জনের অজুহাতে যারা এ সমস্ত ক্লাব বা পার্টির কাজে আসক্ত হয়ে যায়, তারা আসলে কোনোটাই ভালোভাবে করতে পারে না। কারণ সাধারণভাবে এসব ক্লাব বা পার্টি করা হয় নিজেকে জাহির করার জন্যে, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের মানবিক ও নৈতিক গুণাবলি বিকাশের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

ছাত্রজীবনে কাউকে ভালো লাগতেই পারে। কিন্তু সে চিন্তা যদি আপনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, যদি প্রেমরোগের মতো মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হন, তাহলে তা আপনার ছাত্রজীবনের জন্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক হবে। আর যদি লেখাপড়ায় মনোযোগী হন, যদি নিজেকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে এখন যাকে ভালো লাগছে, তারও আপনাকে ভালো লাগবে। কারণ যোগ্যতা আছে এমন জীবনসঙ্গীকেই প্রত্যেকে পছন্দ করে।

প্রশ্ন : মেয়েসন্তান যদি প্রেম-ভালবাসার দিকে বেশি মনোযোগী হয়, তাহলে তাকে কীভাবে ফেরানো যায়?

উত্তর : সাধারণত একজন তরুণী প্রেম-ভালবাসার দিকে তখনই বেশি আগ্রহী হয়, যখন মা-বাবাই তাকে এ ধারণা দেন যে, পড়াশোনা করে আর কী হবে! কিছুদিন পরই তো বিয়ে দিয়ে দেয়া হবে। মেয়েটি তখন ভাবে, যদি বিয়েই দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আর মা-বাবা কেন, আমি নিজেই তো নিজের পছন্দমতো বেছে নিতে পারি। অতএব মেয়েকে জীবনের একটি বড় লক্ষ্য দিন। তাকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করুন যে, তাকে পড়াশোনা করতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের পরিচয় সৃষ্টি করতে হবে। সময়মতো বিয়ে তো একটি সাধারণ ঘটনা। এটি জীবনের পরিণতি নয়।

প্রশ্ন : আমি একজন চাকরিজীবী। একটি মেয়েকে ভালবাসি। তাকে বিয়ে করতে চাই। মেয়েও আমাকে খুব ভালবাসে। এ বিয়েতে আমার আম্মা-আব্বা সবাই রাজি আছেন। কিন্তু মেয়ের বাবা রাজি হচ্ছেন না। তাই আমার আত্মীয়স্বজন এতে রাজি নয়। আমাদের জন্যে দোয়া করবেন যেন সকল সামাজিকতা রক্ষা করে ইসলামি নিয়মে সবাইকে রাজি-খুশি করে আমরা বিয়ে করতে পারি। কারণ আমরা একে অন্যকে ছাড়া বাঁচব না।

উত্তর : আপনার শেষ কথাটা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে কথা। এর চেয়ে অর্থহীন কথা আর কিছু নেই। প্রেমে পড়লে মনে হয়, আমরা কেউ একে অন্যকে ছাড়া বাঁচব না। কিন্তু না পেলেও দেখা যায় শেষ পর্যন্ত মারা যায় না। সাময়িক কিছু মানসিক কষ্ট থাকে মাত্র। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ যদি মঙ্গল রাখেন—আপনার কাঙ্ক্ষিত বিয়েটা যেন সুন্দরভাবে হয়ে যায়। কিন্তু বিয়ে না হলে বাঁচবেন না, এই ভুল ধারণাটা মন থেকে মুছে ফেলবেন।

প্রশ্ন : কারো সাথে যদি প্রেমের সম্পর্ক হয়ে যায় এবং এ অবস্থা থেকে যদি সে সরে আসতে না পারে, কী করণীয়?

উত্তর : এরা হচ্ছে 'দো-দিল বান্দা', যারা দো-টানার মধ্যে থাকে। এরা নিজের জন্যে ক্ষতিকর, অন্যের জন্যেও ক্ষতিকর। যে-কোনো একটা হতে হবে—হয় আমি করব, নয়তো আমি ছাড়ব। জীবনে কোনোকিছু নিয়ে দো-টানার মধ্যে থাকবেন না।

প্রশ্ন : আমি এক মেয়েবন্ধুর সাথে নিয়ন্ত্রণহীন সম্পর্কের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছি। ও প্রতিদিন ফোন করত এবং কমপক্ষে ৩০ মিনিট সমস্যার কথা বলে সহানুভূতি চাইত। একপর্যায়ে ওর কথায় আমি এতটাই প্রভাবিত হতে থাকি যে, রাতের মেডিটেশন মিস করি বেশ কয়েকবার। শয়তান আমাকে এমনই ধোঁকা দেয় যে, আমি ওর ফোনকলের প্রতি আসক্ত হয়ে যাই। একপর্যায়ে যখন সে আমার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করে, তখন ওর ব্যাপারে সতর্ক হতে শুরু করি। একদিন দেখা করার জন্যে আমার ঠিকানায় চলে আসে। তখন থেকেই তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেই। একবার ওকে নিয়ে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখি। মাটির ব্যাংকে টাকা রাখি। শুরু হয় আমার নতুন মিশন। তার প্রতি আসক্তি দূর করার জন্যে অটোসাজেশন, দান ও হিলিং দেয়া শুরু করি। এখন বেশ ভালো আছি। নিজের এই ভুল আজ আপনাকে জানিয়ে শাস্তি কামনা করছি। আমার অভিভাবক হিসেবে যা শাস্তি দেবেন গ্রহণ করব। ইদানীং রাগ কিছুটা বেড়েছে। মেডিটেশনে অস্থিরতা কাজ করছে। জীবনের সকল সমস্যার মাঝেও আমি যেন কোয়ান্টামের সাথে একাত্ম থাকি, সেজন্যে দোয়া করবেন।

উত্তর : আমরা কিন্তু চোরাবালিতে এভাবেই আটকে যাই এবং তা ছেলেমেয়ে উভয়েই। মেয়েদের কাবু করার উদ্দেশ্যে কোনো পুরুষ খুব অসহায় সেজে বলে যে, আমার স্ত্রীর সাথে সমস্যা। কী যে কষ্টে আছি! স্ত্রী কী জিনিস কোনোদিন বুঝলাম না। তখন মেয়েটি ভাবে, আহা, বেচারা! কত কষ্ট তার! প্রথমে সমবেদনা প্রকাশ করে এবং তারপর আস্তে আস্তে নিজের অজান্তে প্রেমে জড়িয়ে যায়।

অধিকাংশ বিবাহিতা মহিলা, যারা পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েন তাদের শুরুটা কিন্তু এভাবেই হয়। এ ধরনের পুরুষ এবং মহিলারা জানেন কীভাবে সহানুভূতি তৈরি করতে হবে। ছেলেদের সহানুভূতি অর্জন করা তো আরো সহজ। কান্না এবং দুঃখের কিছু কথা—মা-বাবা আমাকে দেখতে পারে না, পরিবারে আমি খুব একা, খুব নিঃসঙ্গ। আমার মনের কথা, দুঃখের কথা শোনার কেউ নেই। তখন পুরুষটি ভাবে, আহা বেচারী! ব্যস, আপনি চোরাবালিতে পড়ে গেলেন।

আমাদের জৈবিকতা বা প্রবৃত্তি কিন্তু সবসময় আমাদেরকে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করবে। মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে সীমারেখা বজায় রাখাটা হচ্ছে আপনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি এই ধরনের সহানুভূতি দেখাতে গিয়ে আপনি যেন গর্তে না পড়েন।

আর মেডিটেশন চর্চাকারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মেডিটেশন তাদের মধ্যে সমমর্মিতা জাগ্রত করে। ফলস্বরূপ বিপরীত লিঙ্গের সদস্যরা সহজে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তা তিনি বিবাহিত হোন আর অবিবাহিত হোন। মনে রাখবেন, সবার জন্যে মমতা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু এই মমতা যেন সীমাকে প্লাবিত না করে। যদি করে তো পরে আপনি অনুতপ্ত হবেন। তাই সবসময় সতর্ক থাকবেন। আর আপনি যদি আপনার সীমা ঠিক রাখেন, তাহলে এমন পরিস্থিতি তৈরি করার সুযোগ কেউ পাবে না।

প্রশ্ন : নারী-পুরুষের মধ্যকার যে প্রেম, ইসলাম কি তা সমর্থন করে? এর সপক্ষে অনেকে বলে, মহানবী (স) এবং মা খাদিজার (রা) মধ্যে প্রথমে প্রেম হয়েছিল, তারপর বিয়ে হয়েছিল। তাছাড়া প্রেমের সমর্থনে অনেকে বলে, প্রেম না করে বিয়ে করা অনেকটা জুয়া খেলার মতো হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : নবীজী (স) এবং খাদিজার (রা) মধ্যে প্রেম ছিল, এরকম কোনো বিবরণ কোথাও নেই। কারণ নবীজীর (স) জীবনের সবকিছু পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। ছোটবেলা থেকে শুরু করে ওফাত পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এরকম কোনো ঘটনা যদি ঘটত, ইতিহাসে অবশ্যই এর উল্লেখ থাকত। এটা ঠিক যে, নবীজী (স) মা খাদিজার ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। সে হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই সুসম্পর্ক ছিল, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্ততা ছিল। আর মা খাদিজা তাঁকে এত বেশি বিশ্বাস করতেন যে, নিজের ব্যবসার পুরো দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপর বিয়ের ব্যাপারে যখন মা খাদিজার তরফ থেকে প্রস্তাব গেল, তখন নবীজী শর্ত দিলেন যে, তার যা সম্পদ আছে, তা বিতরণ করে দিতে হবে। মা খাদিজা তার সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর তাঁদের বিয়ে হয়।

প্রেম না করে বিয়ে করলে অনেকটা জুয়া খেলার মতো হয়ে যায়—এটা হচ্ছে একেবারে ভ্রান্ত ধারণা। একবার খুব পণ্ডিত একজন বললেন, ডেটিং না হলে তো পরস্পরকে বোঝা যায় না। বিয়ের পর মিল হবে কি হবে না—এর জন্যে ডেটিং দরকার। বিয়ে হওয়ার আগে সব জেনেবুঝে নিলে বিয়ের পরে আর সমস্যা হবে না। তাকে বললাম, যদি ডেটিং হলেই বিয়ে স্থায়ী হতো, তাহলে আমেরিকাতে বিবাহবিচ্ছেদের হার এত বেশি কেন? আমেরিকাতে তো ডেটিং-মেটিং সবকিছু করে তারপর তারা বিয়ে করে। ফলে বিয়ের পর তাদের যা বাকি থাকে, তা হলো বিটিং বা প্রহার। তাদের বিবাহবিচ্ছেদের

হার তাই এত বেশি। অশান্তির কথা তো বাদই দিলাম। অতএব প্রেম না করে বিয়ে করলে জুয়া খেলা হয়, এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা।

জুয়া (!) এড়ানোর জন্যে আপনি কি বিয়ের পরে যে সম্পর্ক হয়, সেটাতে জড়াবেন? অর্থাৎ দৈহিক সম্পর্ক! বিয়ের আগে দৈহিক সম্পর্কে জড়ানো একটি মেয়ের জন্যে সবচেয়ে আত্মঘাতী কাজ। কারণ শারীরিক সম্পর্ক হওয়ার পরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই মেয়ের প্রতি ছেলেটির আকর্ষণ কমতে থাকে। ছেলেটি তখন মেয়েটিকে সন্দেহ করতে শুরু করে। ভাবে যে, আমার সাথে যেহেতু এত সহজে খোলামেলা হতে পেরেছে, তাহলে অন্য যে-কারো সাথেও একই রকম হতে পারে। অতএব এ ব্যাপারে মেয়েদের খুব সতর্ক থাকা উচিত যে, বিয়ের আগে এমন কোনো সম্পর্কে না জড়ানো, যার জন্যে অনুশোচনা করতে হয়, নিজেকে প্রতারিত মনে হয়।

আর প্রেম করে বিয়ে করলেই যে সুখের সংসার হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ প্রেমের সময় চোখে থাকে রঙিন চশমা। তখন একে অপরের ভুলগুলো তাদের চোখে পড়ে না। এসব ধরা পড়ে যখন বিয়ে হয়। বাস্তব দুনিয়ার বিষয়গুলো তখন সামনে এসে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন : আমি কয়েক মাস ধরে একটা সমস্যার মধ্যে আছি। আমার অনেক ভালো একজন ছেলেবন্ধু আছে। একটা মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক ছিল কিন্তু ভেঙে গেছে। ওর সম্পর্কটা ভেঙে যাওয়ার পর ও অনেক কষ্ট পাচ্ছিল। তাই ওকে আমি বলেছি, সম্পর্কটা ঠিক করে ফেলতে। আমিও চাই যে, যার সাথেই আছে, সেখানেই থাক—ভালো থাকুক। যেই ওই মেয়েটার কাছে সে ফিরে যাচ্ছে, ওদের সম্পর্কটাকে আবার আমি মেনে নিতে পারছি না। এখন আমার মনে হচ্ছে, আমিই ওকে ভালবাসতে শুরু করেছি।

উত্তর : এজন্যেই আমরা বলি, ছেলেতে-মেয়েতে কখনো বন্ধুত্ব হয় না। আমরা জোর করে বন্ধুত্ব গড়ার চেষ্টা করি। কিন্তু একটা সময় তা প্রেমের আবেগেই রূপ নেয়।

মেয়েবন্ধু-ছেলেবন্ধু অর্থাৎ গার্লফ্রেন্ড-বয়ফ্রেন্ড ধারণাটার উদ্ভব আসলে ইউরোপ-আমেরিকায়। সেখানে গার্লফ্রেন্ড মানেই তার সাথে যৌনসম্পর্ক আছে। বয়ফ্রেন্ড মানেই হচ্ছে মেয়েটি তার শয্যাসঙ্গী হয়েছে। একজন ছেলে সহপাঠী বা সহকর্মীর সাথে স্বাভাবিক সুসম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু অবশ্যই তা একটি সীমার মধ্যে। যখনই 'বন্ধু' মনে করবেন, এ সীমাটা আপনার পক্ষে রাখা সম্ভব হবে না, আপনি কষ্ট পাবেন। এ-ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে।

আপনি প্রথমে তাকে ইমোশনাল সাপোর্ট দিতে চেয়েছেন। আসলে কাউন্সেলিংয়ের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিপরীত লিঙ্গকে কাউন্সেলিং করা খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ—ধারালো তলোয়ারের ওপর দিয়ে হাঁটার মতো। কাউন্সিলর তখন নিজেই জড়িয়ে যায়। কারণ তারা অধিকাংশই আসে ইমোশনালি ডিস্টার্বড অবস্থায়। কাউন্সিলর হচ্ছেন একজন আশ্রয়স্থল। সেবাপ্রার্থী যখন তাকে আশ্রয়স্থল হিসেবে পায়, তখন কাউন্সিলরের ওপর মানসিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে যায়।

সবসময়ই সহপাঠী বা সহকর্মী যে-ই হোক, তার সাথে সম্পর্কের সীমানা বজায় রাখতে হবে। কাউন্সেলিং করতে হলেও সম্পর্কের সেই সীমাটা রক্ষা করবেন। আর তা না পারলে কাউন্সেলিং করতে যাবেন না। এখন আপনি যা করতে পারেন তা হলো, ওই বন্ধুর সাথে যোগাযোগ কমিয়ে দিন। পড়াশোনা ও ভালো কাজে সময়টাকে বেশি বেশি লাগান। আশা করি, এই জটিলতা থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমার বান্ধবী আমাকে খুব পছন্দ করলেও 'প্রেম করা পাপ'—এই হীনম্মন্যতা ও পাপবোধে ভুগতে থাকে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা দিলে খুব উপকৃত হবো।

উত্তর : ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে পারবেন আলেমরা। আমি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বলি, উচ্চবিত্ত সমাজের জন্যে প্রেম করা মানে হচ্ছে রাত্রিযাপন করা। লাভ মেকিং মানে হচ্ছে শারীরিক সম্পর্ক। অমুকের সাথে প্রেম মানে তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক আছে। আর মধ্যবিত্তের জন্যে প্রেম করার অর্থ হচ্ছে একটু পার্কে ঘোরাঘুরি করা, সিনেমা দেখা, বেইলি রোডে দাঁড়িয়ে ফুচকা-চটপটি খাওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলে যোগাযোগ।

আমাদের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এখনকার যে প্রেম, এটা আসলে একধরনের ভোগের কামনা। তার সাথে প্রেম করি মানে তাকে আমার মতো করে ভোগ করতে চাই। কিন্তু সত্যিকারের প্রেম অনেক বড় ব্যাপার। সেই প্রেম হচ্ছে দেয়ার নাম। কোনোকিছু পাওয়ার আশা না করে নিজেকে উজাড় করে দেবো, এটা হচ্ছে প্রেম। এটা হতে পারে দেশের জন্যে, যে কারণে বলা হয় দেশপ্রেম। এটা হতে পারে স্রষ্টার জন্যে, যাকে বলে স্রষ্টাপ্রেম।

লাইলি-মজনু, শিরি-ফরহাদ, রোমিও-জুলিয়েট—এসব রূপকথা, উপকথা, গল্প, নাটক। এগুলো বাস্তবে হয় না। বাস্তবে 'আমি তাকে ভালবাসি' মানে 'আমি তাকে ভোগ করতে চাই নিজের মতো করে'। সে আরেক দিকে

তাকালে সাথে সাথে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়—'ওদিকে কেন তাকালে'? অথচ আমি ভালবাসি মানে হওয়া উচিত আমি তার মঙ্গল চাই।

কনজ্যুমারিজমই আসলে প্রেমের নামে এসব বিভ্রান্তিকে উসকে দিচ্ছে। কারণ এদের কাছে এর চেয়ে বড় কিছু নেই। দেশকে ভালবাসতে হবে, দেশের জন্যে কিছু করতে হবে—এটা তারা চায় না। মিডিয়া, নাটক, সিনেমায়ও বিষয়টিকে উসকে দেয়া হচ্ছে। কারণ তাহলে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি হবে 'মাল কামাও আর ফুর্তি করো'। তখন আপনি মানুষের দুর্দশা নিয়ে চিন্তা করবেন না, বড় কিছু হওয়ার চিন্তা করবেন না, জ্ঞানার্জন করবেন না। আমাদের পড়াশোনা ও জ্ঞানার্জনের মানের যে এত অবনতি হচ্ছে, তার এটাও একটা কারণ। আর যা জীবনকে নষ্ট করে তা নিঃসন্দেহে পাপ।

প্রশ্ন : কাউকে দেখে যদি ভালো লাগে, ভুলতে না পারি, তাহলে নিজেকে কীভাবে সামলাব? ভালবাসা যখন রোগের পর্যায়ে চলে যায়, তখন তা নিরাময়ের উপায় কী?

উত্তর : যে-কোনো কিছুকে দেখে ভালো লাগতে পারে। একটি ফুল দেখে ভালো লাগতে পারে বা কোনো মানুষকে দেখে ভালো লাগতে পারে। ভোলার দরকার কী? এটাকে সুন্দর সুখকর স্মৃতি হিসেবে রেখে দিন। একটা ফুল ভালো লাগলে সেটা যদি না ভোলেন, একজন মানুষকে ভালো লাগলে তাকে ভোলারও প্রয়োজন নেই। জোর করে ভোলার চেষ্টা করবেন না। অন্যান্য চিন্তা ও কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লে এটা এমনিতেই ভুলে যাবেন। সমস্যা হয় যখন আপনি আসক্ত হয়ে যান।

ছাত্রছাত্রীর সাথে তার সহপাঠীর অবশ্যই সুসম্পর্ক থাকতে পারে। সেই সুসম্পর্ক হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে। কর্মজীবনে একজন নারীর সাথে পুরুষের সুসম্পর্ক থাকবে এবং সেটাও হতে হবে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে। সেটাকে প্রেম মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং তা করবেনও না।

কিছু বিষয় নিয়ে আমরা যেন বাড়াবাড়ি না করি বা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে না যাই। জীবনে খাওয়ার প্রয়োজন আছে, ভালবাসার প্রয়োজন আছে, জৈবিক প্রয়োজন আছে। কিন্তু এটাই জীবন নয়। জীবন এর চেয়ে অনেক বড়। সবকিছুর একটা সীমা আছে। কাউকে দেখেই যদি ভালবাসা জেগে ওঠে, তার মানে আপনার আবেগ বেশি। এই আবেগ, ভালবাসা মহৎ কাজে ব্যয় করুন। তাতে আপনার কল্যাণ হবে, মানুষের কল্যাণ হবে।

আর যদি রোগে পরিণত হয়, তাহলে আপনি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। আপনাকে বুঝতে হবে জীবনে কখন কোনটা করবেন। সেভাবে যদি কাজ করেন, দেখবেন জীবনটা অনেক সুন্দর হচ্ছে।

প্রশ্ন : ভ্যালেন্টাইন ডে বা ভালবাসা দিবস নামে এখনকার তরুণ-তরুণীদের মধ্যে নষ্টাচার, ভ্রষ্টাচার স্বীকৃতি পেয়েছে। টিভিতেও এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এটা থেকে বাঁচার উপায় কী?

উত্তর : এটা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো নষ্টামিতে অংশগ্রহণ না করা। বাংলাদেশে একমাত্র আমাদের পরিবারই (কোয়ান্টাম পরিবার) বর্ধিষ্ণু পরিবার। আমরা যদি অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকি, তাহলে একসময় ভ্যালেন্টাইন কল্পকাহিনী বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাবে। 'ভালবাসা দিবস' ভালবাসা শব্দটির সাথে রসিকতা ছাড়া কিছু নয়। ভালবাসা কি একদিনের বিষয়? আসলে এই দিবসগুলোর নামে শোষকরা আমাদের পণ্যদাস বানাচ্ছে। ভালবাসার নামে আমরা খরচ করি। আর লাভবান হয় বেনিয়ারা।

প্রশ্ন : গুরুজী, আপনার মতে কি কোনো ছেলে বা মেয়ের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক থাকতে নেই? ব্যাপারটাকে আপনি কি পুরোপুরি অসুস্থতা ভাবেন?

উত্তর : কোনো মেয়েকে দেখলেই যদি ভালবাসা জেগে ওঠে বা কোনো ছেলেকে দেখলেই যদি মনে হয় রাজপুত্র এসে গেছে এবং ব্যাপারটি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তা ক্ষতিকর।

একটি ছেলে এবং মেয়ের মাঝে সৌহার্দ্য, সমমর্মিতা থাকতেই পারে। আগে যৌথ পরিবারে ভাইবোনেরা পারস্পরিক সমমর্মিতার মধ্যে বড় হয়ে উঠত। বিপরীত লিঙ্গের কাউকে দেখলেই যদি প্রেম জেগে ওঠে, তাহলে এটা প্রেম নয়, অসুস্থতা। যথাসময়ে এর চিকিৎসা প্রয়োজন। না হলে বিয়ের পরেও দেখা যাবে আবার প্রেমে পড়েছে। এতে অশান্তি বাড়বে।

প্রশ্ন : ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বোধ করাটা স্বাভাবিক। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কোনো মেয়ে ভালো কথা বললে তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে যাই। তবে কখনো আমার ক্ষতি হয় নি। এভাবে একের পর এক কয়েকটি মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি। এটাকে কি ব্যাধি বলা যাবে? যদি তা-ই হয় এর থেকে পরিত্রাণের উপায় জানাবেন কি?

উত্তর : এটা অবশ্যই ব্যাধি। এই আকর্ষণ থেকেই ধীরে ধীরে প্রেমরোগ শুরু হয়। তাই শুরুতেই সাবধান হবেন। কারণ আসক্তি ক্ষতিকর। আসলে ভালো কথা ছেলে বা মেয়ে যে-ই বলুক, এতে আসক্ত হওয়ার কিছু নেই। এই আসক্তিকেই আমরা দূর করতে চাই। যাদের এরকম আসক্তি হবে তারা 'তওবা তওবা' বলবেন এবং বান্দরবানের লামায় ধ্যানতীর্থ কোয়ান্টামমে কোয়ান্টায়ন করবেন।

প্রশ্ন : প্রেমের আকর্ষণ 'লিমিটেড' হতে হবে। এই লিমিট কতটুকু? ব্যাপারটি কি আপেক্ষিক নয়?

উত্তর : প্রেমের আকর্ষণ 'লিমিটেড' হতে হবে তা বলি নি। বরং আমরা বলেছি, একটি মেয়ের প্রতি ছেলের বা ছেলের প্রতি মেয়ের যে আকর্ষণ থাকে, জৈবিক একটি প্রবৃত্তি হিসেবেই যা সহজাত, সেটার লিমিট থাকতে হবে। কারণ একটি ছেলের প্রতি মেয়ের বা মেয়ের প্রতি ছেলের আকর্ষণ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সে আকর্ষণ বোধ করলেই যে প্রেমে পড়ে যেতে হবে, তা কেন! আর প্রেম হচ্ছে দেয়ার ব্যাপার। যদিও এখনকার প্রেক্ষাপটে প্রেম শব্দটির এই মাহাত্ম্যের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই! যথেচ্ছ যৌনাচার, পরকীয়া আর লাম্পট্যই এখনকার তথাকথিত 'প্রেম'।

কাজেই নারী-পুরুষের সম্পর্কের স্বাভাবিক সীমাটাকেই আমরা বজায় রাখতে চাই। সেটাই কল্যাণকর।

প্রশ্ন : দেশে শতকরা ৪০ ভাগ প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্ক বিদ্যমান—একজন লেখকের উদ্ধৃতি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর : কথাটা সঠিক হতেও পারে। এবং এটা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। বিশেষ করে যে মেয়েরা/ তরুণীরা বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে যায়, তাদের দুঃখকষ্টকে আমি আমার দীর্ঘ পেশাগত জীবনে দেখেছি। যে পুরুষকে সে প্রেমিক ভাবে, শারীরিক সম্পর্কের পর সে ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। যে মেয়েই বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়েছে, আমি এ পর্যন্ত তাদের কাউকে সুখী দেখতে পাই নি। যার সাথে জড়িয়েছে সে-ও তাকে বিশ্বাস করে না। এটাই বাস্তবতা।

আর প্রেমিক-প্রেমিকা শব্দটাও পুরোপুরি অর্থহীন বাজে শব্দ। প্রেম দিতে জানে, প্রেম কিন্তু পেতে চায় না। অথচ আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকারা শুধু চায়,

দেয় না। 'দে ওয়ান্ট টু বি লাভড্'; সে চায় অন্যরা তাকে ভালবাসুক। কিন্তু সে অন্যকে ভালবাসবে—এটা সে পারে না (ভালবাসার প্রকৃত অর্থে)। একজনের সাথে কথা বলতে ভালো লাগে, দেখা হলে কাছাকাছি হতে ভালো লাগে আর তার নাম হয়ে যায় প্রেম। এতে বিশাল কিছু, মহৎ কিছুর সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু এটা আসলে মোহ ছাড়া কিছু নয়।

প্রেম দিতে জানে, নিতে জানে না। আপনি যাকে প্রেমিক ভাবছেন, যদি তাকে অন্য কারো সাথে দেখেন তখন আর প্রেম থাকে না। ছেলে হলে নাক ফাটাফাটি আর মেয়ে হলে শক্তি থাকলে চুলের মুঠি ধরে শাস্তি দেয়া; এটা প্রেম নয়, প্রেমের নামে 'নষ্টামি'।

প্রেমের মধ্যে, বিশেষত বিবাহ-বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্কের মধ্যে কোনো কল্যাণ ও শান্তি থাকলে তো পাশ্চাত্যের তরুণ-তরুণীরাই সবচেয়ে সুখী হতো। কারণ তাদের মতো খোলামেলা সম্পর্ক অন্য কোনো সমাজে নেই। সেখানে প্রথমে প্রেম, পরে বিয়ে হয়। অথচ ১৯৮০-র দশকের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সেখানে বিয়ের পরে শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে ডিভোর্স হয়েছে।

যদি প্রকৃত প্রেম থাকে, তাহলে প্রেমিক বা প্রেমিকার জন্যে জীবনের সবকিছু বিসর্জন দেয়া সম্ভব। প্রেমিক যদি অন্য কাউকে বেছে নেয়, নিক। তার জীবনে শান্তি থাকুক। কিন্তু আমরা তা পারি না। গত ৪০ বছরে আমার কাছে অসংখ্য তরুণ-তরুণী এ সমস্যা নিয়ে এসেছে। 'প্রেম' শব্দটি সম্পর্কে ভুল ধারণা তাদের কষ্টের কারণ। তারা মনে করছে, নিজের সবকিছু উজাড় করে দিয়েছে। কিন্তু আসলে তারা উজাড় করে দেয় নি; বরং চাচ্ছে। আর পেতে চাচ্ছে বলেই এত অশান্তি।

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য হিসেবে জেনেছি যে, তথাকথিত প্রেম একটি অসুস্থতা। কিন্তু আমাদের চারপাশের পরিচিতরা, যারা এই অসুস্থতা মানতে রাজি নয় বা বুঝতে পারছে না, তাদের জন্যে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : করণীয় একটাই যে, নিজে জড়িয়ে না পড়া। অন্যেরা যখন দেখবে আপনি জড়াচ্ছেন না এবং ভালো আছেন; তখন তারা চিন্তা করবে যে, আপনি ভালো আছেন কীভাবে? সেসময় তাকে পরামর্শ দিন। অর্থাৎ পরামর্শ তখনই দেবেন, যখন পরামর্শ শোনার জন্যে সে মানসিকভাবে প্রস্তুত হবে। আবেগীয় সম্পর্কে যখন টানাপোড়েন সৃষ্টি হবে, তখন তাকে পরামর্শ দিন—ভাই/ বোন, তুমি তো এটা ঠিক করো নি। তার আগে যতই পরামর্শ দিতে চান, সে আসলে শুনবেই না।

প্রশ্ন : অনেক ছাত্রছাত্রী প্রেম করছে। আবার তারা ভালো শিক্ষার্থীও। তাহলে ছাত্রছাত্রীদের প্রেম করা নিষেধ কেন? তবে প্রেম কখন করব?

উত্তর : প্রেম করে ছাত্রছাত্রী আবার ভালো রেজাল্ট করে—এটা ভুল ধারণা। যারা ভালো রেজাল্ট করে, তারা আসলে প্রেম করে না। একধরনের নষ্টামি করে। নষ্টামি আর প্রেম সম্পূর্ণ আলাদা। এই নষ্টামি করে তারা তাদের মেধার অপচয় করে। যদি তা না করত, তাহলে আরো অনেক ভালো রেজাল্ট করতে পারত। শুধু ক্লাসে নয়, জীবনেও প্রথম হতে পারত।

এধরনের সম্পর্ক সত্যিকারের মেধাকে বিকশিত করার পথে অন্তরায়। যে-কোনো ছেলেমেয়ের রেজাল্ট খারাপ হওয়ার পেছনে প্রধান যে কারণটি থাকে, সেটা হচ্ছে প্রেম বা আসক্তি। কারণ এ সময়টা প্রেম করার জন্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়। বাবা টাকাপয়সা দিচ্ছেন। উপার্জন করতে হচ্ছে না। কারণ উপার্জন করতে যখন নামে, তখন প্রেম করা খুব মুশকিল। বাবা পয়সা দিয়েছেন কলেজে যাওয়ার জন্যে। আর আমি ক্লাস না করে সিনেমা হলে চলে গেলাম আরেকজনকে নিয়ে। বাবা যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন—এটা হচ্ছে সে উদ্দেশ্যের সাথে প্রতারণা করা, বিশ্বাসভঙ্গ করা।

ছাত্রজীবনে জ্ঞানার্জন হচ্ছে ইবাদত। যা-কিছু জ্ঞানার্জনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেটাই পাপ। একজন শিক্ষার্থীকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, ভালো রেজাল্ট করার জন্যে পরিশ্রম করতে হবে। লক্ষ্য হবে ক্লাসে প্রথম হওয়া, যেন জীবনে প্রথম হওয়াটা সহজ হয়। আপনি জীবনে প্রথম হোন। এরপর প্রেম নিজে দৌড়াবে আপনার পেছনে। কারণ প্রেম সবসময় সফল মানুষের পেছনে দৌড়ায়। অতএব আমাদের পরামর্শ হলো—ভালো রেজাল্ট করুন, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হোন, তারপর পছন্দমতো বিয়ে করবেন।

প্রশ্ন : যদি বিয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে দুজন তরুণ-তরুণী ইনভলভড হয়, তাহলে কি এটা ঠিক আছে?

উত্তর : কতটুকু ইনভলভড হচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করছে উচিত কি অনুচিত। ইনভলভমেন্টের সীমা থাকা উচিত। যদি বিয়ে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে ততটুকুই ইনভলভড হওয়া যেতে পারে, যতটুকু শোভন। ইনভলভমেন্ট আমাদের দেশে একরকম, পাশ্চাত্যে আবার অন্যরকম। সেজন্যে আমাদের সমাজ, ধর্ম, নৈতিকতাবোধ যতটুকু অনুমোদন করে ততটুকুই ইনভলভড হতে পারে।

প্রশ্ন : আমি যদি বিয়ে করার জন্যে কাউকে পছন্দ করি, আর সে-ও আমাকে পছন্দ করে এবং পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়, তা-ও কি আসক্তি হবে?

উত্তর : মোটেই না। পছন্দ করে বিয়ে করলে আসক্তি হবে না। কিন্তু 'তাহাকে ছাড়া আমি বাঁচিব না'—এটা হচ্ছে আসক্তি। কারণ বাস্তবতা হচ্ছে, তিনি মারা যাওয়ার পরও আপনি বেঁচে থাকতে পারেন। আবার দেখা যাবে, একটা বিয়েও করে ফেলেছেন।

এটা নিয়ে কৌতুকও আছে। একজনের বউ মারা গেছে, খুব কান্নাকাটি করছে সে। বউকে খুব ভালবাসত। একেকজন একেকভাবে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—তোমার এত কান্নাকাটি করার দরকার নেই, তোমাকে আবার বিয়ে করিয়ে দেবো, ৪০ দিন যাক। সে বলল, আমি তো আমার বউয়ের জন্যে কান্নাকাটি করছি না। আমি কান্নাকাটি করছি, এই ৪০ দিন একা কীভাবে কাটাব—একথা ভেবে। অতএব মনে রাখতে হবে, বিয়েটা হচ্ছে প্রয়োজন। প্রয়োজন পূরণই বিয়ের মূল লক্ষ্য। প্রয়োজন এবং আসক্তি এক নয়।

প্রশ্ন : বিয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ের আগে কাউকে পছন্দ করা কি কোরআন ও হাদীসের আলোকে জায়েয? যদি জায়েয হয়, তাহলে কি পছন্দ করা উচিত?

উত্তর : কাউকে পছন্দ না করে বিয়ে করবেন কীভাবে? বিয়ের আগেই তো পাত্র বা পাত্রী পছন্দ করতে হবে। তা না হলে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন কীভাবে? কাজেই বিয়ের জন্যে কাউকে পছন্দ করা নাজায়েয নয়। পছন্দ করে কাউকে প্রস্তাব পাঠানোও নাজায়েয নয়। নাজায়েয হলো বিয়ের আগে প্রেমের নামে নষ্টামি বা বিবাহপরবর্তী আচরণ।

প্রশ্ন : আমার মামাতো বোন প্রেমজনিত সমস্যায় আক্রান্ত। ওর প্রিয়জনের সাথে কোনো সমস্যায় পড়লে সে আমার সাহায্য চায়। আর তার মেডিটেশনের প্রতি বিশ্বাস আছে। আমি চেষ্টা করি তাকে কাউন্সেলিং করার জন্যে। কীভাবে তাকে কাউন্সেলিং করলে ভালো হবে?

উত্তর : মনে হচ্ছে আপনারই আগে কাউন্সেলিং দরকার। একজন শিক্ষার্থী হয়ে নিজের পড়াশোনা বাদ দিয়ে আপনি কী করছেন? প্রেমজনিত কাউন্সেলিং করছেন। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের জন্যে এটা মোটেই শোভন নয়। এই প্রেমজনিত সমস্যা যখনই হবে, বুঝবেন যে এটা রোগ। এটা একধরনের

অসুস্থতা। যেটাকে আমরা বলি প্রেমরোগ। ছাত্র অবস্থায় এ রোগ যে-কারো জন্যে ক্ষতিকর। আর নিজে শিক্ষার্থী হয়ে কাউন্সেলিংয়ে জড়ানো রীতিমতো বিপজ্জনক। অতএব চেষ্টা করবেন এ থেকে দূরে থাকতে।

আপনার বন্ধুরা বলতে পারে যে, এখন যে যুগ তাতে যদি দুচারটা প্রেম না থাকে সবাই তো ক্ষ্যাত বলবে, আনস্মার্ট বলবে। বলুক। তাতে কিছু যায়-আসে না। ওরা লেজকাটার দলে। সেই শেয়ালের গল্প তো জানেন, শিকারির ফাঁদে পড়ে যে লেজ হারায় এবং এটাকে ফ্যাশন বলে অন্যদেরও লেজ কাটাতে উদ্বুদ্ধ করে। যারা প্রেমজনিত সমস্যায় আক্রান্ত তাদেরও একই অবস্থা। নিজের লেজ কাটা গেছে। এখন অন্যেরটাও কাটতে চায়।

অতএব আপনি নিজের পড়াশোনায় মন দিন। এই ধরনের চাচাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন এবং বন্ধুবান্ধবী থেকে মানসিকভাবে যত দূরে থাকবেন, তত আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। কারণ এরা নিজের সময় নষ্ট করার পাশাপাশি আপনার সময়ও অহেতুক নষ্ট করবে।

প্রশ্ন : আমার মনের মানুষকে স্বাভাবিকভাবে পাওয়ার উপায় কী?

উত্তর : মনের মানুষকে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া কঠিন। কারণ মন সাধারণত যৌক্তিক পথে চলে না, খেয়ালি পথে চলে। আর খেয়ালি পথে স্বাভাবিকভাবে কিছু পাওয়া যায় না। এভাবে যারা মনের মানুষ পাচ্ছেন, তারা অধিকাংশই পাওয়ার পরে পস্তাচ্ছেন। দিলির লাড্ডু খেয়ে পস্তানোর দরকারটা কী? মনের মানুষ পাওয়া মানে বিয়ে করা তো? বিয়ে হচ্ছে একটা বাস্তবতা। অনেক দায়িত্ব ও হিসাবনিকাশের ব্যাপার—মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা, ননদ, ভাসুর সবাইকে মানানো, মহিলা হলে রান্নাবান্না, পুরুষ হলে স্ত্রীর ভরণপোষণ ইত্যাদি। কিন্তু মনের মানুষের সাথে তো এসব ব্যাপার নেই। শুধু ঘুরে বেড়ানো, ফাস্ট ফুড বা ফুচকা খাওয়া ইত্যাদি। আজকাল তো সম্পর্ক আরো খোলামেলা। এগুলো সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়।

আপনি মনের মানুষকে পেতে চান, কিন্তু তার দায়িত্ব নিতে কি আপনি প্রস্তুত? আমাদের এখনকার তরুণ-তরুণীরা শুধু মনের মানুষ খোঁজে। কিন্তু তার দায়িত্ব নিতে চায় না। তারা প্রেম করতে চায়, বিয়ে করতে চায় না। আমাদের দেশে তো লিভ-টুগেদারের সুযোগ তেমন নেই, যার ফলে তারা মোবাইলে লিভ-টুগেদার করে। এর মধ্য দিয়ে তরুণ-তরুণীরা তাদের বিশাল সম্ভাবনাকে নষ্ট করছে। কারণ কাছে না থাকলে তো টান বেশি থাকে। এ টান আর শেষ হয় না। এই মনের মানুষদের নিয়েই মোবাইল কোম্পানির মুনাফা।

অতএব নিজের অর্থের অপচয় করবেন না, সম্ভাবনার অপচয় করবেন না, সৃজনশীলতার অপচয় করবেন না। দায়িত্বশীল হতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে নিজের এবং মনের মানুষের দায়িত্ব নেয়ার জন্যেও প্রস্তুত হতে হবে।

প্রশ্ন : প্রেম এবং আত্মিক সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য কী? জৈবিকতাকে কীভাবে আত্মিকতায় রূপান্তরিত করা যায়?

উত্তর : প্রেম এবং আত্মিক সম্পর্কের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, যদি সেটা যথার্থ প্রেম হয়। যেখানে চাওয়ার কিছু নেই, নেয়ার কিছু নেই। যেমন, দেশপ্রেম। দেশের জন্যে ত্যাগ আছে, দেয়ার বাসনা আছে, কিন্তু নেয়ার নেই কিছুই। আর যেখানেই চাওয়ার কিছু থাকবে, এটা আসলে প্রেম নয়; এটা হচ্ছে কামনা, এটা হচ্ছে জৈবিক চাহিদা, যা আত্মাবিবর্জিত।

যেমন, আমি অমুককে চাই, তমুককে চাই; এভাবে চাই, ওভাবে চাই; তাকে পেলে আমি সুখী হবো—এটা হচ্ছে কাম। এটা জৈবিকতা, প্রেম নয়। আত্মা কাউকে চায় না। আত্মার কাউকে পাওয়ার প্রয়োজন নেই। আত্মা নিজেই সুখী হয়, যখন সে পরমাত্মায় নিজেকে সমর্পিত করতে পারে।

মানুষের জৈবিক বিষয়গুলো বেশি প্রকট হয় ছাত্রজীবনে, তরুণ বয়সে। ছাত্রজীবনে কেউ যদি জৈবিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্তর থেকে আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে, ভগবানকে স্মরণ করতে পারে, এটা অনেক বেশি পুণ্যের। কারণ যৌবনের ইবাদত আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের। আর এজন্যেই সৎসঙ্ঘ। সৎসঙ্ঘে যখন থাকবেন তখন আপনার পুরো সময় সঙ্ঘভাবনা ও স্রষ্টা-সচেতনতায় লীন থাকবে, বাজে চিন্তার সময় পাবেন না।

আসলে জৈবিক চিন্তা আসে কখন? যখন একজন মানুষ একা থাকে, যখন তার কোনো কাজ থাকে না, চিন্তা থাকে না। তাই রুটিন করে ফেলুন, জৈবিক চিন্তা করার সময়ই রাখবেন না। সঙ্ঘের কাজগুলোতে অংশগ্রহণ করুন। সাদাকায়ন ও বরকতায়ন কার্যক্রমে অংশ নিন। পরিচিতদের খোঁজ নিন, অসুস্থকে দেখতে যান। অর্থাৎ ভালো সব কাজের সাথে একাত্ম থাকুন। কারণ কোয়ান্টামের কাজে যত ব্যস্ত থাকবেন, তত জৈবিক চিন্তা, অনৈতিক চিন্তা থেকে আপনি মুক্ত থাকতে পারবেন।

কাজে ব্যস্ত থাকলে আপনার শারীরিক পরিশ্রম হবে। রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়বেন, বাজে চিন্তার সুযোগ পাবেন না। যদি ব্যস্ত না থাকেন, ঘুম সহজে আসতে চাইবে না। আর রাতে কখনো রিচ ফুড অর্থাৎ চর্বিদার খাবার খাবেন না, সবজি খাবেন। কারণ রিচ ফুড শরীর উত্তেজিত করে। রাতে পড়ালেখা

শেষে স্রষ্টাকে স্মরণ করুন, নিজের জীবনছবি নিয়ে চিন্তা করুন। ঘুমের সময় স্রষ্টার কথা ভাবার একটা মজার দিক হলো, শয়তান তখন আপনাকে জেগে থাকতে দেবে না। দেখবেন ঘুম চলে এসেছে।

প্রশ্ন : ছাত্র অবস্থায় প্রেম করা উচিত নয়, কিন্তু কোনো কারণে যদি এ সময়ে প্রেম হয়ে যায়, তাহলে কী করণীয়? উল্লেখ্য, আমি একজনকে পছন্দ করি এবং তিনি মানুষ হিসেবে আমার মনের মতো এবং এটা আমাদের পরিবারের সবাই জানে। তিনি দেশের বাইরে আছেন। দেশে এলে বিয়ে হওয়ার কথা এ বছরই। এটা নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত। তাকে বিয়ে করাটা কি ঠিক হবে?

উত্তর : কাউকে পছন্দ করা আর প্রেমে পড়ে যাওয়া এক নয়। ভালোলাগা এবং প্রেমরোগে আক্রান্ত হওয়া এক নয়। যে-কাউকে যে-কারো পছন্দ হতেই পারে। তার মানে এই নয় যে, সেটা প্রেম-পাগলামিতে রূপান্তরিত হতে হবে! অর্থাৎ ভালোলাগাটা তখনই রোগ হয়ে যায়, যখন এটা একজন মানুষকে ভারসাম্যহীন করে ফেলে। যখন এটা তার পড়াশোনায় ক্ষতির কারণ হয়, যখন তার আসল কাজ থেকে মনোযোগটা নষ্ট হয়ে যায়।

আপনি যেহেতু শিক্ষার্থী, আপনাকে তাই এই ভারসাম্যের বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে। আপনি পছন্দ করেছেন, যদি পারিবারিকভাবেও পছন্দ হয়, দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে হলে ঠিক আছে। কিন্তু কোনো কারণে শেষ পর্যন্ত বিয়েটা যদি না হয়, তাহলে সেটাকেও স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে। এটাই হওয়া উচিত আপনার মানসিক অবস্থা। আর মনছবি দেখতে পারেন যে, এ বিয়ে যদি আপনার জন্যে কল্যাণকর হয়, তাহলে দুই পরিবারের সম্মতি ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে যেন হয়।

প্রশ্ন : আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে জীবনে অনেক ভালো কিছু অর্জন করেছি। যদিও কোর্সটি করার আগে মনে হয়েছিল, আমার তো কোনো সমস্যা নেই, শেখারও কিছু নেই। কিন্তু কোর্স করে অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। অবশ্য পূর্বের কিছু ভুল আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। ভুলগুলো শোধরাতেও পারছি না। আমার পরিবার মেনে নেবে না জেনেও আমি একজনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছি। এখন প্রতিমুহূর্তে কষ্ট পাচ্ছি এই ভেবে যে, আমি আমার মা-বাবার সাথে প্রতারণা করছি। আবার সম্পর্কটা ছিন্ন করতেও পারছি না। তাহলে তো ছেলেটার সাথেও প্রতারণা হবে। আমি এখন কী করব? প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণায় আছি।

উত্তর : এই মানসিক যন্ত্রণাটা একধরনের আহাম্মকি। আমরা যেটাকে প্রেম বলি, এটা আসলে প্রেম না। প্রেম তো দেয়ার নাম। প্রেমের জন্যে যদি দিতে চাই, তাহলে তো যাকে ভালবাসি তার সুখটুকুই শুধু কামনা করব। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কাব্যনাট্য 'বিদায় অভিশাপ'-এর মূল বিষয় কী ছিল?

দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ হতো। দেবতারা অসুরদের সাথে শক্তিতে পারত না। দেবতাদের গুরু ছিলেন বৃহস্পতি আর অসুরদের গুরু হচ্ছেন শুক্রাচার্য। শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানেন। অর্থাৎ মৃতকে মন্ত্র দিয়ে জীবিত করতে পারেন। দেবতারা কোনো অসুরকে মেরে ফেললে শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়ে তাকে আবার জীবিত করে ফেলতেন। কিন্তু দেবতাদের কেউ মারা গেলে তাদের গুরু তাদেরকে জীবিত করতে পারতেন না। তাই দেবতারা বৃহস্পতির পুত্র কচকে পাঠালেন অসুরদের রাজ্যে শুক্রাচার্যের কাছ থেকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শেখার জন্যে।

কচ অসুরদের গুরু শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে, গুরু শুক্রাচার্য তার কন্যা দেবযানীকে খুব স্নেহ করেন। মন পাওয়ার জন্যে কচ গুরু শুক্রাচার্যের খেদমত করার সাথে সাথে দেবযানীর সব কাজও করে দেন। তিনি বুঝলেন যে, দেবযানীকে খুশি রাখলে গুরু খুশি থাকবেন। দেবযানী কচকে ভালবেসে ফেলেছিল। কচের লক্ষ্য কিন্তু দেবযানী নয়; লক্ষ্য হচ্ছে সঞ্জীবনী মন্ত্র শেখা।

৫০ বছর পর শেষ পর্যন্ত কচ সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখে ফেললেন। গুরু তাকে মন্ত্রপুত করলেন এবং আশীর্বাদ করলেন। শুক্রাচার্যের ধারণা ছিল, কচ দেবযানীকে বিয়ে করে তাদের কাছেই থেকে যাবে। কিন্তু কচ সঞ্জীবনী মন্ত্র শিখে আবার দেবতাদের রাজ্যে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। দেবযানী তো বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ। কচ তাকে বিয়ের ব্যাপারে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এটা দেবযানীর ধারণায় ছিল না। দেবযানী তাকে আবেগ দিয়ে দুর্বল করার চেষ্টা করল। কিন্তু কচ তার লক্ষ্যে অটল। বিনয়ের সাথে কচ বোঝালেন যে, আমি এখানে প্রেরিত হয়েছি মন্ত্র শেখার জন্যে। এবার আমাকে তো ফিরে যেতে হবে দেবতাদের রাজ্যে।

তখন দেবযানী তাকে অভিশাপ দিয়ে বলল, *তোমা-'পরে/ এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে/ মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার/ সম্পূর্ণ হবে না বশ—তুমি শুধু তার/ ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;/ শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ*। অর্থাৎ এই বিদ্যা সে অন্যকে শেখাতে পারবে, অন্যে সেটা প্রয়োগ করতে পারবে, কিন্তু কচ প্রয়োগ করতে পারবেন না। অভিশাপ পাওয়ার পরেও কচ বিচলিত না হয়ে দেবযানীকে বললেন,

আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।/ ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে। অর্থাৎ কচ ফিরে গেলেন দেবতাদের রাজ্যে, কিন্তু কোনো অভিশাপ দিয়ে নয়, ভালবাসা দিয়ে। দেবযানীর জন্যে মঙ্গল কামনা করে, আশীর্বাদ করে কচ তার লক্ষ্যে ফিরে গেলেন।

কিন্তু আমরা যাকে ভালবাসি তার সুখ নয়, বরং নিজের সুখ কামনা করি যে, 'অমুককে পাইলে আমি খুব সুখে থাকিব'। এটা প্রেম নয়, এটা হচ্ছে কাম—যেটা পাওয়ার নাম। আমরা তাকে সম্পত্তি মনে করি, নিজের অধিকার মনে করি যে, সে আমার। বাস্তবে পৃথিবীতে কেউ কারো নয়। আমরা পৃথিবীতে একাই এসেছি এবং একাই চলে যাব।

আর বাস্তবতা হচ্ছে, যখন ঘোরাঘুরি হয় তখন তো কারো আসল রূপ বোঝা যায় না। যখন সংসার হয়, বোঝা যায় যে, কত ধানে কত চাল। এর আগে তো শুধু মোবাইল, রেস্টুরেন্ট, ফুচকা এবং ঘোরাঘুরি। এখানে কোনো দায়িত্ব থাকে না। যখন একজন মানুষ বিয়ে করে সংসার করে, তখন আসল রূপটা বোঝা যায়। আর যখনই প্রত্যাশা বাড়বে, কষ্ট আপনি পাবেনই।

যেখানে আপনি মনে করছেন যে, মা-বাবার সাথে প্রতারণা করছেন, সেখানে এই সম্পর্কে আপনি কখনো সুখী হবেন না। কারণ মা-বাবার সাথে আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবেন না। তাই এ প্রতারণা থেকে যত দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারেন তত ভালো। তাছাড়া আপনি তো তাকে এখনো বিয়ে করেন নি। বিয়ে করলে না তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রসঙ্গ আসত! কিছুদিন তার সাথে যোগাযোগ না রাখলে এমনিই দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : মহাবিপদ! মনের মানুষ যখন খুঁজে পেলাম তখন তাকে জীবনসঙ্গী করার কথা দিলাম। আর একথা মা-জননী জেনে ফেললেন। এইচএসসি পাশ করে অনেক খরচ করে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্যে মা-জননীর কাছে কোরআন ছুঁয়ে শপথ করতে বাধ্য হই যে, আমি কোনো মেয়ের সাথে সম্পর্ক রাখব না। কিন্তু জোর করে করানো এ শপথ আমার সবকিছু কেড়ে নিয়েছে। না পারছি মনের মানুষকে ভুলতে, না পারছি মায়ের শপথভঙ্গ করতে। পড়ালেখায় মনোযোগী ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন পাওয়ার জন্যে কী করব গুরুজী? দয়া করে বলবেন।

উত্তর : আপনার প্রশ্নটিও বড়ই মজার। আপনার কথাই প্রমাণ করে যে, আপনি আসলে সাবালকই হন নি। নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেয়ার মতো পরিপক্কতা আপনার আসে নি। আপনি তো এখনো নাবালক। আগে সাবালক

হোন, স্বাবলম্বী হোন, তারপরে চিন্তা করবেন কাকে জীবনসঙ্গী করবেন। আর এজন্যে পড়ালেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখন আপনি যদি পরীক্ষায় লাড্ডু পান, কোথায় যাবে আপনার মনের মানুষ? আপনার মনের মানুষ তো এমএ পাশ করে ফেলবে। সে তখন আপনার থাকবে না, সে আরেকজনের হয়ে যাবে। কারণ নারীরা অযোগ্য কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে পেতে চায় না।

আপনার প্রেম হচ্ছে একটা রোগ। এই প্রেমরোগ থেকে যত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারেন তত ভালো।

প্রশ্ন : ক্লাস ফাইভ/ সিক্স-এর ছেলেমেয়েরা প্রেমে জড়িয়ে পড়ছে। গত কয়েকদিন আগে এমনই এক ঘটনা সামনে এসেছে এক স্কুলছাত্র হত্যার মধ্য দিয়ে। প্রশ্ন হলো, এ থেকে উত্তরণের উপায় কী? সামাজিকভাবে কীভাবে সচেতন হওয়া যায়? কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কী করণীয়?

উত্তর : সবাইকে সচেতন করার জন্যেই তো আমাদের কোয়ান্টাম মেথড কোর্স, ওয়ার্কশপ এবং অন্যান্য প্রোগ্রামেও আমরা এসব বিষয়ে বলে থাকি। আপনারা নিজেরা একটু সচেতন হোন, সোচ্চার হোন। এই যে ক্লাস ফাইভ/ সিক্সে প্রেম করা, এ ব্যাপারে আমাদের মা-বাবাদের বক্তব্য এবং অবস্থান দৃঢ় হতে হবে। কারণ প্রেমের একটা বয়স আছে। বিয়ের একটা বয়স আছে। ক্লাস ফাইভ/ সিক্স তো প্রেমের বয়স নয়। কড়াভাবে বলতে হবে যে, এটি একটি আত্মঘাতী কাজ। সন্তানদেরকে বোঝাতে হবে। পরিচিত পরিমণ্ডলে এর ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরতে হবে। আর আমরা নিজেরা যেহেতু বিশ্বাস করি, আমাদের সন্তানদেরকেও সচেতন করতে পারব।

প্রশ্ন : শিক্ষার্থী মেডিটেশনে আপনি বলেন, ছাত্রজীবনে প্রেম করা উচিত নয়। আমি পড়াশোনার ক্ষতি চাই না। কিন্তু প্রেম করাও ছাড়তে পারি না।

উত্তর : প্রেমাসক্তি একটা রোগ। ছাত্রজীবনে সহপাঠীদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক থাকবে—সে ছেলে হোক বা মেয়ে। কিন্তু যদি প্রেমে জড়িয়ে পড়েন, প্রেমরোগে পেয়ে বসে, ছ্যাঁকা আপনি খাবেনই। প্রেমরোগ মহামারির মতো হয়ে গেছে আজকাল। একজনের সাথে প্রেম করে শান্তি নেই। একসাথে কয়েকজনের সাথে ডেটিং করছে এবং এটাকে বলা হচ্ছে প্রেম। যার যত বয়ফ্রেন্ড থাকে তার ক্রেডিট তত বেশি। আসলে এগুলো প্রেম নয়, এগুলো হচ্ছে ব্যারাম। কলেরা, ডায়রিয়ার মতো ছাত্রজীবনে প্রেমও একটা রোগ।

সত্যিকার প্রেম তো দেয়ার নাম। আমরা কি দেয়ার জন্যে প্রেম করি? হয় সময় কাটানোর জন্যে, না-হয় ক্লাবে রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়ানোর জন্যে, নিজের পয়সা খরচ না করে অন্যের পয়সা খসানোর জন্যে—এটাকে বলা হচ্ছে প্রেম। এটা যদি করেন, পড়াশোনার ক্ষতি হবেই।

আমাদের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে বোঝে না যে, বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড মানেটা কী। ইউরোপ-আমেরিকাতে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড তাদেরকে বলা হয়, যাদের সাথে বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রয়েছে। আসলে আমরা অনেক শব্দের অর্থ না বুঝেই তা প্রয়োগ করে ফেলি। অর্থ বুঝলে পরে বিব্রত হই।

এ নিয়ে একটি গল্প আছে—

এক মহিলা ইংরেজি তেমন জানেন না। তো এক বাসায় গিয়েছেন। যার বাসায় গিয়েছেন, তার ঘরে একজন সার্ভেন্ট কাজ করে শুনে উনি জিজ্ঞেস করলেন, এক হাজবেন্ড নিয়ে আপনি কীভাবে চলছেন? আমার চার-পাঁচটা হাজবেন্ড, তারপরেও তো আমি চলতে পারি না।

আসলে উনি সার্ভেন্ট আর হাজবেন্ড শব্দের মাঝে তফাত বোঝেন না। তিনি জানতে চাইছিলেন, এক সার্ভেন্ট দিয়ে আপনি কীভাবে কাজ করেন? তো যারা বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড বলে, এদের অবস্থাও সে-রকম।

প্রশ্ন : আমার সমবয়সী কোনো বান্ধবী নাই। কোনোদিন প্রেম করি নি। কিন্তু সমবয়সী কাউকে দেখলে কেন জানি না, বুকের ভেতর কষ্ট লাগে। আমার বয়স ২০ বছর। বয়সের এই আসক্তি থেকে কীভাবে বাঁচব?

উত্তর : যে-কোনো আসক্তি থেকে বাঁচার খুব সহজ পথ হলো, বান্দরবান লামার কোয়ান্টামমে ৪০ দিন খেদমতায়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। কোয়ান্টাম পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে এই খেদমতায়ন কার্যক্রম আপনার জন্যে একটি ভালো সুযোগ। ওখানে জীবনদৃষ্টি সঠিক করে নেয়া ও সেবা দেয়ার ব্যবস্থা এবং পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে।

খেদমতায়ন শেষে দেখবেন যে, আপনি সবদিক থেকে ফিট এবং যতরকম আসক্তি আছে, সব চলে গেছে। প্রেমরোগ থেকে শুরু করে মনের সমস্ত রোগ থেকে আপনি মুক্তি লাভ করবেন এবং জীবনের দিশা পাবেন। যদি ৪০ দিনেও না হয়, আরো ৪০ দিন খেদমতায়ন করবেন। ফুরফুরে মুক্তমন নিয়ে ফিরে আসবেন লামা থেকে, ইনশাআল্লাহ। অন্যরা দেখলেই বুঝবে যে, এর পেশির শক্তি যেমন আছে, তেমনি মনের শক্তিও আছে; দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও এগিয়ে গেছে।

আসলে জীবন সম্পর্কে এখনকার তরুণ-তরুণীদের সঠিক ধারণার অনেক অভাব। তাদের কেউ খাবারকে জীবন মনে করে, কেউ পেশাকে, আবার কারো কাছে জীবন হচ্ছে প্রেম ও রেস্টুরেন্টে ঘুরে বেড়ানো। অথচ এই খাবার, প্রেম, বন্ধুত্ব এগুলো তো জীবনধারণের উপকরণ। আর পেশা হচ্ছে জীবিকা। এটা জীবন নয়। জীবন অনেক বড় কিছু।

প্রশ্ন : ছাত্রাবস্থায় প্রেমের ব্যাপারে আপনি বার বার নিরুৎসাহিত করে আসছেন। কিন্তু যারা কোর্স করার আগেই এই রোগে আক্রান্ত, তাদের নিরাময়ের ওষুধ কী? একটু বলবেন?

উত্তর : যারা এই রোগে আক্রান্ত, তাদের নিরাময়ের জন্যে প্রথমেই তাদেরকে প্রেমের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মাদকাসক্তদের ক্ষেত্রে যেমন তাদের সার্কেল বা বন্ধুবৃত্ত বদলে ফেললে এই আসক্তি থেকে বের হওয়া সহজ হয়, তেমনি যার সাথে প্রেমরোগের সম্পর্ক তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা জরুরি। যারা কোর্স করার পর শিক্ষার্থী জীবনে প্রেমের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন, তারা সম্পর্কের সীমা কখনোই লঙ্ঘন করবেন না। তারপর বিয়ের সময় হলে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রশ্ন : আমি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। একটি মেয়েকে ভালবাসি। কিন্তু ওর পরিবার এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা করছে। তাই আমার লেখাপড়া ভালো হচ্ছে না। মেয়েটি আমাকে বলেছে যে, ও আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না। কিন্তু আমি কখনো আমার কষ্টের সময় ওর সাহায্য পাই না। শুধু বলে, বাসায় সমস্যা। আমি কী করতে পারি?

উত্তর : নিজেকেই নিজে চপেটাঘাত করা ছাড়া আর কী করবেন আপনি! মেয়ের এককথায় আহাম্মকের মতো গলে গেছেন যে, আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে সে বিয়ে করবে না! হাঁ, তা না-ও করতে পারে, যদি আপনার চেয়ে ভালো কাউকে সে না পায়। আর যদি পায়, তাহলে বাসায় সমস্যার কথা বলে আপনাকে বোকা বানিয়ে বরের মালা দেবে সেই পাত্রের গলায়।

এদিকে তার পেছনে ঘুরলে আপনি রেজাল্ট খারাপ করবেন। আপনার অযোগ্যতার অজুহাত তুলেই তখন সে হয়তো আপনাকে ছুড়ে ফেলবে। অতএব এ বয়সে প্রেমরোগে আক্রান্ত হওয়ার আহাম্মকি বাদ দিন। যোগ্য হোন, প্রথম হোন। দেখবেন, বাসায় সমস্যার কথা কেউ বলবে না।

প্রশ্ন : দুবছর আগে একটি মেয়েকে ভালো লেগেছিল। কিন্তু এখন লেখাপড়ার সময়, এটা ভেবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছি এবং পারছিও। এতদিন মেয়েটির সাথে কোনো কথা হয় নি। কিন্তু সম্প্রতি মেয়েটির সাথে কথা হয়। সে আমাকে পরোক্ষভাবে জ্ঞান দিয়েছে যে, এটা পড়ালেখার সময়। তাই কাউকে জীবনের সাথে জড়াবেন না। কিন্তু তার ব্যাপারে আমি অনেক কিছু জেনেছি। সে ঠিকই প্রেম করছে। আমাকে জ্ঞান দিয়ে নিজেই এসব কাজ করছে!

উত্তর : মেয়েটি কী করছে, না করছে এটা তার ব্যাপার। তার হাঁড়ির খবর রাখার দায়িত্ব তো আপনাকে কেউ দেয় নি। আসলে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে যদি মুক্ত হতে না পারেন, আপনি বড় কিছু করতে পারবেন না।

কেউ যখন বড় কিছু করতে যায়, আত্মিক পথে অগ্রসর হতে যায়, তখন প্রবৃত্তি তাকে পেছন থেকে আরো বেশি টেনে ধরে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং বিপরীত লিঙ্গেরও তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়। তখন লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে। তাই কে কী করছে সেই খোঁজ না রেখে আপনার কী করা উচিত সে ব্যাপারে মনোযোগী হোন। তাতে আপনার কল্যাণ হবে।

প্রশ্ন : আমার প্রেম করতে ইচ্ছে করে না, কিন্তু প্রেম আমার ওপরে এসে পড়ে। প্রেম করলে আমার কাজকর্ম মন-মানসিকতা ভালো থাকে। কারণ আমি রোমান্টিক। আমি বিশ্বপ্রেমিক হতে চাই সাধনা ঠিক রেখে। এখন ভণ্ড চেনার উপায় যদি বলেন—কারণ ভণ্ডদের দ্বারা অনেক প্রতারিত হয়েছি। তারা সুন্দর করে এত মিষ্টি কথা বলে! হাসিমুখে যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে কঠিন বাস্তবতার আলোকে সম্মোহন করে। প্রথমে উদারতা, সততা ও ভদ্রতা দেখায়। তারপর প্রতারণা করে। কীভাবে এ থেকে রক্ষা পেতে পারি?

উত্তর : আগে বিশ্বপ্রেমিক হওয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি, এ থেকে আপনাকে বেরিয়ে আসতে হবে। যারা বিশ্বপ্রেমিক তারা সবসময় প্রতারিত হয় এবং ছ্যাঁকা খায়। আসলে বিশ্বজনীন মমতা আর বিশ্বপ্রেমিক হওয়া এককথা না। বিশ্বপ্রেমিক যাকে দেখে, তার সাথে প্রেম করতে চায়। আরেকজনও বোঝে যে, ঠিক আছে, একটু নাচাই! তো আপনি প্রতারিত হবেন, নাকি হবেন না—এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করবে।

আর যখন-তখন যে-কারো প্রেমে পড়াও তো ভণ্ডামি। অন্যদিকে প্রতারকদের কথা তো সবসময় মিষ্টি হয়। কেন তাদের কথায় সম্মোহিত হবেন? আপনাকে তো বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে চলতে হবে।

প্রশ্ন : আমার স্কুলে এক মেয়েকে আমি ভালবাসি, সে-ও আমাকে খুব ভালবাসে। কিন্তু সমস্যা হলো, সে যখন আমার মোবাইল বন্ধ পায়, তখন আমার ওপর সুনামি নেমে আসে। এমতাবস্থায় আমি কী করতে পারি?

উত্তর : প্রেম কী, ভালবাসা কী—এটাই আপনি বোঝেন না। কারণ এটা বোঝার মতো বয়স আপনার এখনো হয় নি। আসলে প্রেম হচ্ছে দেয়ার নাম, কোনোকিছু পাওয়ার নাম নয়। যেমন—দেশপ্রেম, স্রষ্টাপ্রেম। এখানে পাওয়ার নেই, আছে শুধু দেয়ার, নিজেকে উজাড় করে দেয়ার। প্রেমের চেয়ে বড় কিছু আর হয় না। আপনি বলছেন যে, আপনি ভালবাসেন, সে-ও ভালবাসে। শুধু মোবাইল বন্ধ পেলে সুনামি হয়। এটা কি প্রেম হলো? এটা তো কাম।

কাম এবং প্রেম এক নয়। কাম রোমান্টিক নয়, কাম হচ্ছে জৈবিক। প্রত্যেক পশুর মধ্যে এই জৈবিক চাহিদা রয়েছে। যদি এটাকে প্রেম বলেন, তাহলে প্রত্যেক পশুই প্রেমিক। যেটাকে আপনি প্রেম বলছেন, এটা আসলে জৈবিক প্রয়োজন। বংশবৃদ্ধির জন্যে, প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্যে এটা প্রয়োজন। কিন্তু প্রেম তো ভিন্ন কিছু। সেই প্রকৃত প্রেমের সন্ধান যখন পাবেন, তখন আপনি সবই বিসর্জন দিতে পারবেন। দেখবেন যে, আপনার চাওয়ার কিছু নেই। তখন সুনামির ভয়ও থাকবে না, ঝামেলার ভয়ও থাকবে না।

শিক্ষার্থী জীবনে এমন কিছু করবেন না, যা আপনার পড়াশোনাকে নষ্ট করে। যদি পড়াশোনা নষ্ট হয়ে যায়, ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যায়, যদি নিজের পরিচয় সৃষ্টি করতে না পারেন, তখন টের পাবেন প্রেমের ধ্বংসলীলা!

প্রশ্ন : আমার মনছবি ছিল, যে ছেলেকে পছন্দ করি সে যেন আমার জীবনে আসে এবং আমি যেন ভালো একটা চাকরিতে ঢুকতে পারি। কিন্তু কিছুদিন আগে জানলাম, তার বিয়ে অন্য জায়গায় ঠিক হয়েছে। আমার মেডিটেশন, হিলিং, দান—এগুলো কোনো কাজে এলো না কেন?

উত্তর : মেয়েরা একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবেন, কোনো ছেলের প্রতি কখনো নিজ থেকে যেচে বেশি আগ্রহী হবেন না। কারণ এরকম মেয়েকে কখনো ছেলেরা গুরুত্ব দেয় না। মনে করে, এ-তো না চাইতে পাওয়া বা একে এমনি এমনি বা ফাও পাওয়া গেছে। ফাও-এর প্রতি কখনো কারো গুরুত্ব থাকে না। ছেলেরা তাকেই গুরুত্ব দেয়, যাকে সে চায়।

বিয়ের ব্যাপারে সবসময় মনে রাখবেন, যদি কোনো ছেলে আপনাকে পছন্দ করে আপনি অবশ্যই বুঝেশুনে হাঁ বলবেন। এস্ট্রলজার হিসেবে আমি

মানুষের কষ্টকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। যে মেয়েই নিজে আগ্রহ করে কোনো ছেলের কাছে গেছে, স্ত্রী হিসেবে সে কখনো সুখী হয় নি, স্বামীর কাছে সে কোনো মর্যাদা পায় নি। ৯৯% ক্ষেত্রেই আমি এর কোনো ব্যতিক্রম পাই নি। কারণ ছেলেটি তার কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল, কিন্তু সে-তো ছেলেটির কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না।

অতএব গায়ে পড়ে কোনো ছেলেকে কখনো পছন্দ করতে যাবেন না। কোনো মেয়েরই উচিত নয়, নিজেকে এরকম সস্তা বানিয়ে ফেলা। আর একটা বিষয় মনে রাখবেন, আপনি যে-কাউকে পছন্দ করতে পারেন, পছন্দের মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তাকে বিয়ে করলেই আপনি সুখী হবেন, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন যে, বিয়েটা হয় নি। মাটির ব্যাংকে দান, হিলিং এবং মেডিটেশন করেও না হওয়া মানে এটা আপনার জন্যে মঙ্গলজনক ছিল না।

প্রশ্ন : আমি একজন ছাত্রী। দেড় বছর ধরে এক বন্ধুর সাথে আমার সম্পর্ক। তুলনামূলকভাবে তার চেয়ে আমার রেজাল্ট ভালো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যখন একসাথে আমরা বাইরে বের হই, তখন তার সহপাঠীদের দেখলে সে আমাকে উপেক্ষা করে। কেন করে তা জিজ্ঞাসা করলে চুপ থাকে। তখন খুব হতাশায় ভুগি। সে আমাকে যদি সত্যিই ভালবাসে, তাহলে তার এমন আচরণের কারণ বুঝতে পারি না। এসব কারণে আমার লেখাপড়ার যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটছে। যেহেতু আমাকে বড় হতে হবে, আমার করণীয় কী?

উত্তর : আচ্ছা, সেই ছেলের যদি আপনাকে পছন্দ হতো বা সে যদি আপনাকে বিয়ে করতে চাইত, তাহলে তার আচরণেই এর প্রকাশ ঘটত। তার আচরণে তো সে-রকম কিছু নেই, যা আপনি নিজেও বুঝতে পারছেন। আপনিই একতরফা পাগল হয়ে গেছেন তার জন্যে।

আর কোনো মেয়ে যখন কোনো ছেলের জন্যে এমন একতরফাভাবে পাগল হয়ে যায়, এটা তার জন্যে দুর্ভাগ্য, তাকে মূল্য দিতে হয় অনেক বেশি। হতাশাই তার জীবনের অন্যতম পরিণতি। কারণ ছেলে এবং মেয়ের মানসিকতায় অনেক তফাত রয়েছে। ছেলে জয় করতে চায়, পেতে চায়। পেয়ে গেল, তারপর শেষ। ধরে রাখার ব্যাপারে তার আগ্রহ খুব কম। কিন্তু মেয়েরা ধরে রাখতে চায়। আর মেয়ের আগ্রহ যখন বেশি হয়, তখন এই ধরে রাখাটা কঠিন হয়ে পড়ে। ছেলে তখন নানানভাবে ছুটে যেতে চায়। অতএব এই ভুল করবেন না। আগবাড়িয়ে নিজে আগ্রহী হবেন না কখনো।

প্রশ্ন : আমি একজন ভদ্রলোককে ভালবেসেছিলাম। সে বলেছে, আমার সাথে আর কোনো যোগাযোগ করবে না। এর কোনো কারণও নেই। এটা নাকি তার ইচ্ছা। আমি লোকটাকে খুব 'লাভ' করে ফেলেছি। তাই ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। এখন আমি কী করব?

উত্তর : এখন সে যদি 'লাভ' না করে আপনি তো লাফ দিয়ে গর্তে পড়ে যাবেন। আসলে এই মেয়েদের জন্যে খুব মায়া হয়। এরা বুঝতে চায় না যে, কোনো ছেলের প্রতি যখন কোনো মেয়ে উল্টে পড়ে এটার পরিণতি কেমন হয়। এত সহজলভ্য কিছু তো ছেলেরা পছন্দ করে না। ভাবে যে, একে তো এমনিই পাওয়া যাচ্ছে। অতএব আছে, থাকুক। আমি অন্য কিছু দেখি।

এটা হচ্ছে বাস্তবতা। এখন আপনি যদি নিজে থেকে তার প্রতি আগ্রহ দেখান, তাহলে আপনার জীবনের দুঃখ কেউ দূর করতে পারবে না। কারণ সবসময় তাকে ধরে রাখার চিন্তা আপনাকেই করতে হবে। আর সে ব্যাঙের মতো শুধু লাফালাফিই করতে থাকবে।

অতএব কোনো মেয়েরই এই ভুল করা উচিত নয়। বরং সে আর যোগাযোগ না করলে মনে করবেন, আল্লাহ বাঁচিয়েছে আপনাকে। শুকরিয়া করবেন যে, বিপদ থেকে আপনি বেঁচে গেলেন। আর মহৎ কিছুতে বা ভালো কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। এসব অপ্রয়োজনীয় বিষয় আর আপনাকে কষ্ট দেবে না।

প্রশ্ন : আমার মা-বাবা, নানা-নানি, মামা, আত্মীয়স্বজনের সাথে বড্ড অভিমান হচ্ছে। তারা আমার সাথে প্রচণ্ড খারাপ ব্যবহার করে। মনে হয়, তারা কেউ আমার আপন না। আমি প্রচণ্ড একাকিত্বে ভুগছি। ছোট বোনের ভর্তি পরীক্ষা সামনে। এখন তার খুব পড়াশোনা করা দরকার। এগুলো যদি আমি বলি, আমাকে বলা হয়—ওকে যেন ওর মতো থাকতে দেই। ওরা আমাকে গুরুত্ব দেয় না। আমার মন খুব খারাপ থাকে এই কারণে। তারা আমার খোঁজখবর পর্যন্ত রাখে না। গুরুজী, আমি বেঁচে থাকার মানে খুঁজতে চাই। শুধু মা-বাবার অবহেলার কারণে আমি প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে গেছি। আর চাপ নিতে পারছি না। চারপাশে আপন কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমি কী করব?

উত্তর : মুশকিলটা কিন্তু আপনি নিজেই। আপনাকে যদি কেউ পছন্দ না করে তার মানে হচ্ছে সমস্যাটা আপনার মাঝে, আপনার এপ্রোচ। আর আপনার মা-বাবা, নানা-নানি, মামা সবাই তো আপন। আপনি মনে করছেন যে, এরা

কেউ আপন না। এরা কি তাহলে সৎ মা-বাবা আর সৎ নানা-নানি? আসলে সমস্যাটা হচ্ছে, আপনি চান সবাই আপনার মতো চলুক। আপনার কথা সবাই শুনুক। আপনাকে সবাই গুরুত্ব দিক। কিন্তু গুরুত্ব পাওয়ার জন্যে নিজের যে যোগ্যতা সৃষ্টি করা দরকার, সেই যোগ্যতা আপনি সৃষ্টি করেন নি। যদি যোগ্যতা সৃষ্টি করতেন, যদি এই ব্রেনটাকে ব্যবহার করতেন, তাহলে সবাই গুরুত্ব দিত।

পৃথিবী স্যালুট করে উদীয়মান সূর্যকে। যদি আপনি ক্লাসে প্রথম হতেন, আপনার মা-বাবা আপনার ছোট বোনকে বলত আপনার মতো চলতে। আপনি নিজে সফল না হয়ে আরেকজনকে যদি উপদেশ দেন, সেই উপদেশের তো কোনো মূল্য থাকবে না।

চারপাশে আপন কাউকে খুঁজে পাচ্ছেন না মনে করে আপনি আবার প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। আপনি তো জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করতে যাচ্ছেন, যেহেতু আপনি মেয়ে। যে পথে গিয়েছেন এটা পথ নয়, এটা গর্ত। অতএব এই প্রেমরোগ থেকে দূরে থাকবেন। কারণ আপনি তো একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আর খুঁজে বেড়িয়ে কখনো আশ্রয় পাওয়া যায় না।

নিজেকেই নিজের আশ্রয়স্থল হতে হয়। এজন্যে ঘরে বাইরে সবক্ষেত্রে সেবা দেয়ার চিন্তা করুন। নিয়মিত মেডিটেশন করুন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার/ শাখা/ সেলে কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করুন। তাহলে আপনি বুঝবেন কীভাবে ম্যানেজ করতে হয় পরিবারকে। মা-বাবাকে নানা-নানিকে কীভাবে নিজের কথাগুলো বলতে হয়, এটা আপনি জানবেন। তখন আপনার এই দুঃখ থাকবে না।

প্রশ্ন : আমি এমন একজনকে পছন্দ করি, যে আমাকে পছন্দ করছে না। কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাকে ভুলে থাকা গেলেও অবসরে তার চিন্তা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে। মন থেকে ভুলতে চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। এটা আমার মানসিক অশান্তির একটা বড় কারণ। এ-ক্ষেত্রে আমি কি নেতিচিন্তা বিদায় করার মতো তার চিন্তা বাদ দেয়ার চেষ্টা করব? নাকি মেডিটেশনে এমন কিছু অবলোকন করব যে, তার সাথে আমার সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং তার সাথেই বিয়ে হচ্ছে? আমার কী করণীয়?

উত্তর : পৃথিবীতে কি মেয়ের অভাব আছে? প্রথম দেখাতেই যদি মেয়েটি আপনাকে অপছন্দ করে, একে পছন্দে পরিণত করার প্রয়োজন নেই। বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় বলি, একজন পুরুষ হিসেবে যে-কোনো অবিবাহিতা

মেয়েকে প্রস্তাব দেয়ার অধিকার আপনার আছে। তবে এই অধিকার প্রয়োগ করার সাথে সাথে মনে রাখবেন, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতাও আপনি অপরপক্ষকে দিয়ে দিচ্ছেন। আপনার যেমন প্রস্তাব করার স্বাধীনতা রয়েছে, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতাও তার রয়েছে।

অতএব যে প্রত্যাখ্যান করেছে তার জন্যে আপনি দোয়া করবেন। নেতিচিন্তার মতো তাকে বিদায় দেয়ার দরকার নেই। আবার তাকে নিয়ে মনছবি করারও দরকার নেই। বরং তার কল্যাণ কামনা করুন। কারণ আপনি তো তাকে পছন্দ করেছেন। সে আপনাকে পছন্দ করে নি তাতে কী হয়েছে? দেখবেন যে, প্রভু আপনার জন্যে ভালো হবে এমন মানুষকে জোড়া মিলিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ ভালো জানেন, হয়তো এ মেয়ে আপনার জন্যে ভালো হবে না—এ কারণেই এমনটা হয়েছে। ইঙ্গিত বুঝতে হবে তো! বুদ্ধিমানের জন্যে ইশারাই যথেষ্ট।

আর কাউকে ভুলতে চেষ্টা করাটা বোকামি। খামোখা জোর করে দূরে সরাতে চাইলে বা ভুলতে চাইলে আরো বেশি বেশি মনে পড়বে। ভোলার উপায় হচ্ছে মহৎ কিছুতে, ভালো কোনো কাজে বা নতুন কিছু শেখার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। কাজের মধ্যেও তাকে মনে পড়বে—এটাই স্বাভাবিক। এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না। তার চেয়ে বরং তাকে মনে আসাটা সহজভাবে নিন, কিন্তু আপনি আপনার কাজে ব্যস্ত থাকুন। নিজের কাজে মনোযোগ বাড়ান। দেখবেন যে, আস্তে আস্তে ভুলে গেছেন।

প্রশ্ন : আমি যে মেয়েকে ভালবাসি, তার সাথে অনেক সুখী ছিলাম। আমাদের মধুর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সে এখন আরেকটি ছেলের সাথে মেলামেশা করছে। অর্থাৎ মেয়েটি চরিত্রহীন। তাকে বিয়ে করা কি উচিত হবে?

উত্তর : ছেলে কিংবা মেয়ে যে-ই হোন, একজনের সাথে সম্পর্ক থাকা অবস্থায় যিনি আরেকজনের সাথে মেলামেশা করেন তিনি অবশ্যই ভ্রষ্টাচারী। এটা পরকীয়ারই শামিল। বিয়ের আগেই যেহেতু আপনার মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, কাজেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আরো সময় নিন।

নিশ্চিত হয়ে নিন যে, যা সন্দেহ করছেন তা আসলেই ঠিক কিনা। সুপরামর্শ দিতে পারে এমন কারো সাথেও কথা বলতে পারেন। আপনি যেহেতু মেয়েটির সাথে আবেগিক সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন, আবেগের বাইরে এসে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া আপনার পক্ষে কঠিন হতে পারে। আর বিয়ের আগে এই মেশামেশি যত কম করবেন তত ভালো।

প্রশ্ন : আমি একসময় মেয়েদের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলতাম। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতাম না। হঠাৎ মেয়েদের প্রতি দুর্বল হয়ে যাই। অনেক চেষ্টা করেছি এটা কাটিয়ে উঠতে। কোনোভাবেই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারছি না। আমার কী করা উচিত?

উত্তর : আপনার নতুন পরিমণ্ডল দরকার, যেখানে আপনি নতুনভাবে ভাবতে পারবেন। পরিবেশটা বদলানো দরকার। আর লামাতে খেদমতায়ন হচ্ছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের জন্যে ভালো একটি সুযোগ। সেখানে আপনি প্রকৃতির মাঝে থাকবেন। সুস্থ চিন্তা করার জন্যে প্রকৃতি প্রয়োজন। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে গেলে রোগব্যাধির সাথে সংগ্রাম করার মানসিক শক্তিটা আপনি পাবেন। যদি আপনি প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে পারেন, আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে।

অতএব আপনি ৪০ দিন লামাতে গিয়ে খেদমতায়ন করবেন। দিনে কাজ করবেন, পরিশ্রম করবেন, ইবাদত ধ্যান ও পড়াশোনা করবেন, আলোচনা শুনবেন। সেইসাথে পরিমিত স্বাস্থ্যসম্মত আহার এবং থাকার জন্যে স্বাস্থ্যসম্মত জায়গা থাকবে। রাতে যখন বিছানায় যাবেন, কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন টেরই পাবেন না। নতুন জীবন নিয়ে নতুন সুস্থতা ও নতুন উদ্যম নিয়ে আপনি ফিরে আসতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি কলেজে ভর্তি নিয়ে দোটানায় পড়েছি। আমার স্বপ্নের কলেজ যেটি সেখানে ছেলেমেয়ে একসাথে পড়ে। আমাদের পরিবারে যতগুলো বিয়ে হয়েছে সব লাভ ম্যারেজ। তারা মুখে বলে যে, আমাকে তারা বিশ্বাস করে। কিন্তু কম্বাইন্ড কলেজে ভর্তির ব্যাপারে তারা তেমন আগ্রহী নয়। তাদের মনোভাবে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে যে, আমিও যদি সম্পর্কে জড়াই? কী করব?

উত্তর : কলেজ যেমনই হোক, আসলে সবকিছু নির্ভর করে নিজের ওপর বা জীবনের লক্ষ্যের ওপর যে, জীবনে আমি কী চাই। এই লক্ষ্যটাকে যদি স্থির করতে পারেন, তাহলে ছেলেমেয়ে একত্রে পড়াটা কোনো সমস্যা নয়। লক্ষ্যে যদি আপনার মন দিয়ে দেন, তাহলে অন্য নারী বা পুরুষ আপনার মনের তল খুঁজে পাবে না। আর লক্ষ্য ঠিক না হলে আপনি যেখানেই যান না কেন, কচুরিপানার মতো ভাসতে থাকবেন।

অতএব নিজের ওপর বিশ্বাস এবং জীবনের লক্ষ্যে দৃঢ় থাকাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনার লক্ষ্য যদি হয় যে, পড়াশোনা করতে যাচ্ছি, কলেজে

আমি এই রেজাল্ট চাই, এরপরে আমি এই এই করব, তো কারো সন্দেহে কিছু যায়-আসে না। এই লক্ষ্যটাকে সবসময় সামনে রাখবেন। লক্ষ্যের ভাবনা যখন বিশ্বাসে রূপান্তরিত হবে, তখন এই অর্জনের জন্যে যা যা করণীয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেতর থেকে আসতে থাকবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে আপনি অগ্রসর হতে থাকবেন।

প্রশ্ন : বর্তমানে যে ভার্চুয়াল ভালবাসা চলছে—এটা কোন ধরনের ভালবাসার মধ্যে পড়ে? সত্যিকারের ভালবাসা আসলে কী? কীভাবে তা নিজে পাব এবং অন্যকে দিতে পারব?

উত্তর : আসলে এর জবাব দেয়া কঠিন। আমার মনে হয় এটা একটা রোগ। এটা ব্যারাম। একে বলা যেতে পারে ডিজিটাল ভাইরাস। এটা আসলে বায়বীয় কোনোকিছুর মধ্যে পড়ে। সত্যিকারের ভালবাসা তো উপলব্ধির ব্যাপার। এটা বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না।

ভালবাসা কোনো বিজনেস নয় যে, আমি বিনিয়োগ করলাম, বিনিয়োগের পরিবর্তে কখনো লাভ হলো, কখনো মূলধন পাওয়া গেল বা কখনো লোকসান হলো। ভালবাসা হচ্ছে দেয়ার নাম। এখানে পাওয়ার কিছু নেই। পাওয়ার জন্যে যদি কেউ কিছু করে সেটা ভালবাসা না, সেটা বিনিয়োগ।

ভালবাসা কীভাবে দিতে হয় তা শিখতে হয়। এই শেখাটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ভালবাসা কীভাবে দিতে হয়, এটা শিখতে চাইলে কোয়ান্টামে কোয়ান্টিয়ার হয়ে কাজ করুন। আপনি ধাপে ধাপে শিখতে পারবেন। মানুষ ও সৃষ্টির কল্যাণে দেয়ার যে আনন্দ, এই আনন্দটা আপনি তখন পাবেন।

প্রশ্ন : আমার কলেজে প্রথম দেখায় একজনকে ভালো লেগে গেছে, কিন্তু তাকে বলতে পারছি না। সাহস হয় না। অনেক মিস করছি। করণীয় কী?

উত্তর : করণীয় খুব সহজ—এ অনুভূতিকে পাত্তা না দেয়া, পাত্তা না দিলেই হলো। এখন তো আপনি ছাত্র। নিজেকে তৈরি করার সময় এটা। প্রেমের কথা বলার সাহস জোগানোর সময় এটা নয়। বলার বয়স হোক, তারপরে বলবেন। এখন নাকি ছ্যাঁকা খেলে দুঃখ শেয়ার করার জন্যে পার্টি দিতে হয়! ব্রেক-আপ পার্টি! এটা মা-বাবার টাকায় ফালতু খরচ করে নিজের ক্ষতি করা ছাড়া আর কিছু নয়। ছাত্রজীবনে এসবে যত না জড়ান তত আপনি বেঁচে যাবেন এবং লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন।

প্রেমে ব্যর্থ

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে ভালবাসতাম। তার বিয়ে হয়ে গেছে। কেন যেন তাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ের জন্যে ভাবতে পারি না। সারাদিন কান্নাকাটি করি। মনে অনেক কষ্ট হয়। আপনি হয়তো বলবেন, একা একা কষ্ট পাওয়া দুঃখবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরুজী, দয়া করে আমাকে একটু বলেন, আমি কীভাবে ব্যাপারটাকে মেনে নিয়ে জীবনকে সাজাতে পারব। মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়েটাকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমি না আবার পাগল হয়ে যাই।

উত্তর : এটা হচ্ছে বয়সের রোগ। আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, আপনি কোনোদিন এটা নিয়ে পাগল হবেন না। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে—এটাই স্বাভাবিক এবং সত্য। সে হয়তো আপনার সহপাঠী ছিল। আপনি কবে প্রতিষ্ঠিত হবেন, কবে সে আপনাকে বিয়ে করবে? তার চেয়ে প্রতিষ্ঠিত কাউকে বিয়ে করে নিশ্চিত জীবন বেছে নেয়াই সে পছন্দ করেছে। কারণ প্রত্যেক মেয়েই প্রতিষ্ঠিত স্বামী চায়।

আর যে-কাউকে ভালো লাগতে পারে। এখন আপনার যদি সত্যিই তাকে ভালো লেগে থাকে, তাহলে তার জন্যে দোয়া করবেন—সে যেন সুখী হয়। কারণ ভালবাসা হচ্ছে দেয়ার নাম। ভালবাসা পাওয়ার নাম নয়। দেয়াটা হচ্ছে ভালবাসা।

আমরা যেটা করি, সেটা কাম—আমি অমুককে চাই। অমুককে না পেলে আমি বাঁচব না। যদি আপনার সত্যিই ভালবাসা থাকত, তাহলে বিয়ে হওয়ার পরে আপনি তার জন্যে দোয়া করতেন।

সহজ উপায় হচ্ছে, আপনি তাকে ভুলতে চেষ্টা করবেন না। যখনই তার কথা মনে হবে, তখনই তার কল্যাণের জন্যে দোয়া করবেন। আর চেষ্টা করবেন কোনো ভালো কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতে। যখন কান্না আসে, কাঁদবেন। অর্থাৎ বিষয়টিকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করুন। তাহলে খুব দ্রুত ভুলে যেতে পারবেন। কিন্তু ভুলতে চেষ্টা করবেন না। কারণ যত ভুলতে চেষ্টা করবেন তত বেশি বেশি মনে পড়বে।

আপনার এসব কষ্ট সময়ের সাথে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। এখন সবচেয়ে ভালো হচ্ছে, নিজেকে সৃজনশীল কিছু কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখা। কোয়ান্টামের নানামুখী সেবাকাজে ব্যস্ত হয়ে যান। কিছুদিন পরে নিজেই অবাক হবেন—ওই মেয়ের জন্যে কেঁদেছিলাম! কী বোকা ছিলাম আমি!

প্রশ্ন : আমি একজনকে ভুলে থাকার চেষ্টা করছি। কী করলে আমি তাকে ভুলতে পারব?

উত্তর : জোর করে যত ভোলার চেষ্টা করবেন তত বেশি বেশি মনে পড়বে। অতএব ভোলার চেষ্টা করবেন না। মনোযোগটা অন্যদিকে সরিয়ে দিন। পড়াশোনায় বা কোনো ভালো কাজে মন দিন। আপনার নিকটবর্তী কোয়ান্টামের সেন্টার শাখা সেলে কোয়ান্টিয়ার হিসেবে সময় দিন। মানুষের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়ার কাজ করুন। পরিচিতদের সাদাকায়নে নিয়ে আসুন। দেখবেন, কখন যে তাকে ভুলে গেছেন আপনি টেরও পাবেন না।

অর্থাৎ ভোলার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, ভোলার চেষ্টা না করে নানা ধরনের গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করা। যে কারণে যারা বোকা তারা ভোলার চেষ্টা করে। আর বুদ্ধিমান ভোলার চেষ্টা করে না, তারা কাজে মনোনিবেশ করে মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে পছন্দ করতাম। কিন্তু এখন তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আমার খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু তারপরও আমি কৃতজ্ঞ মেডিটেশনের কাছে। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমি সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাই।

উত্তর : যাকে পছন্দ করতেন, অন্য জায়গায় তার বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় আপনার খারাপ লাগছে। এটা স্বাভাবিক। তবে আপনি এটাকে হালকাভাবে নিতে পারছেন, তার কল্যাণ কামনা করতে পারছেন—এটাই হচ্ছে মানবীয়। কারণ পছন্দের সবচেয়ে বড় গুণ হলো, যাকে ভালবাসছেন তার ভালো দেখে আনন্দিত হওয়া।

আর সব পছন্দকেই কি পেতে হয়, না পাওয়া যায়? তার জন্যে দোয়া করাটা মানবীয়। আর তাকে পছন্দ করেছি, পেতেই হবে—এটা হচ্ছে দানবীয়। অথবা একজন বিবাহিত—স্ত্রী আছে বা স্বামী আছে, কিন্তু আরেকজনকে পছন্দ হয়ে গেল এবং তাকেই পেতে হবে—এটাও দানবীয়। তাই যা হয়েছে তা নিয়ে এখন আর ভেবে লাভ নেই। দোয়া করুন, সে যেন সুখী হয়। সেইসাথে নিজের জীবন গড়ার কাজে মনোযোগী হোন।

প্রশ্ন : আমি ২২ বছর বয়সী একটি মেয়ে। পড়াশোনা করছি কিন্তু পড়াশোনা আমার লক্ষ্য না। আমার যে কী লক্ষ্য, সেটাই আমি জানি না। পাক্কা দুটো বছর একজন মানুষকে ভালবেসেছিলাম। কিন্তু আমাকে ব্যবহার করে

একসময় ছেড়ে দিলো। গত তিন বছর ধরে আমি একটা এলোমেলো জীবনযাপন করছি। প্রচণ্ড মানসিক অশান্তি। মেডিটেশন করলে ভালো লাগে। কিন্তু যখন অতীত প্রতারণার কথা মনে পড়ে যায়, তখন নিজের ওপর ঘৃণা হয়। অপমানিত লাগে। একসময় মনে করতাম, আমার জীবনের লক্ষ্য হলো ভালবেসে একজনকে বিয়ে করা। সেটা তো এখন নেই। অন্য কিছুও নেই। আমি কী করতে পারি?

উত্তর : আসলে এখনকার অনেক মেয়েই এরকম অভাগা। তারা ভালবাসা এবং প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। মেয়েরা একটা জিনিস বোঝে না যে, ছেলেদের কাছে প্রেম হচ্ছে জীবনের আনন্দ। আর মেয়েদের কাছে প্রেমটা হচ্ছে জীবন। একটা ছেলে যত সহজে ভুলে যেতে পারে, একটা মেয়ে অত সহজে পারে না। এটা তাদের খুব কষ্ট দেয়।

মানুষকে বুঝেশুনে বিশ্বাস করবেন। বিয়ের আগে কাউকে বিশ্বাস করবেন না, যত মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলুক। 'কী দিয়া চিঠি লিখিয়াছে? রক্ত দিয়া লিখিয়াছে'—ছাগলের রক্ত হোক, মুরগির রক্ত হোক, এমনকি নিজের আঙুলের রক্ত হোক। কষ্টটা কিন্তু আপনাকে পেতে হবে। একটা ছেলে তো ঘোরাফেরা করে চলে গেল, দাগ তো থেকে গেল আপনার। বিয়ের আগে কখনো বিবাহপরবর্তী সম্পর্কে জড়াবেন না। আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

তারপরও জীবন কিন্তু থেমে থাকে না। যা হয়েছে সেটা অতীত। অতীতে আপনি কখনো ফিরে যেতে পারবেন না। জীবন শুরু করতে হবে বর্তমান থেকে, এখন থেকে। নতুন করে জীবনের মনছবি করুন। নিজেকে পরগাছা ভাববেন না। নিজের সত্তাকে জাগ্রত করুন।

আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রেম করে ছ্যাঁকা খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে—হয় বিয়ের আগে অথবা বিয়ের পরে। অতএব এটা জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। বিয়ে এবং সংসার—এটা একটা প্রয়োজন। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত—একজন ভালো মানুষ হওয়া এবং নিজের মেধাকে বিকশিত করে মানুষের কল্যাণ করা। আর ২২ বছর তো কোনো বয়স না। মানুষ তো ৬০ বছর বয়সেও বিয়ে করে, নতুন নতুন উদ্ভাবনী কাজের উদ্যোগ নেয়। আপনি নতুনভাবে আপনার জীবন শুরু করুন।

প্রশ্ন : পছন্দের মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াতে এবং সে অন্য মেয়েকে বিয়ে করাতে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। এই কষ্ট থেকে আমি কীভাবে পরিত্রাণ পাব? মেডিটেশন করছি। তারপরও আমি প্রশান্ত হতে পারছি না।

উত্তর : সম্পর্ক ভেঙে গেছে মানে পাখি উড়ে গেছে। অতএব পাখি উড়ে গেছে তো গেছে। ভালো হয়েছে। আপনি বেঁচে গেছেন। কারণ এটা যদি বিয়ের পরে কিংবা বাচ্চা হওয়ার পর ভাঙত! অতএব যেটা ভাঙার সেটা আগেই ভেঙে গেছে। এজন্যে আনন্দ করুন। শুকরিয়াস্বরূপ কিছু সদকা দিয়ে দিন যে, আল্লাহ! বিপদ থেকে বাঁচিয়েছ। নতুনভাবে জীবন শুরু করুন।

প্রশ্ন : আমি একজনকে ভালবাসতাম। ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমাদের সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে এবং একপর্যায়ে সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়। আমি তাকে ভুলতে পারছি না। আবার তাকে আমার জীবনে ফিরিয়েও আনতে পারছি না। এখন আমার কী করা উচিত? তাকে ভুলে যাব, নাকি ফিরে পেতে বার বার চেষ্টা করব?

উত্তর : যে আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে, তাকে কেন ফিরে পেতে চেষ্টা করবেন? চলে গেছে মানে আপনার প্রতি তার আর আকর্ষণ নেই। আসলে আকর্ষণ একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার। এটা কখনো জোর করে হয় না।

আর আপনার তো তার সাথে বিয়েও হয় নি যে, ফিরে পেতে বার বার চেষ্টা করতে হবে। আজকাল এসব পছন্দ অনেকটা কচুপাতার পানির মতো। টলটল করে, স্থির হয় না। তাই এসব পছন্দ থেকে যত দূরে থাকতে পারেন, আপনি তত শান্তিতে থাকতে পারবেন।

বিশেষ করে মেয়েরা মনে রাখবেন, কখনো কোনো ছেলের পেছনে ছুটবেন না। তাহলে আপনি জীবনে কখনো তার কাছ থেকে সম্মান পাবেন না। কারণ যে মেয়ে কোনো ছেলের পেছনে ছোটে সেই ছেলে ওই মেয়েকে সম্মান করে না। সে তাকে খুব সস্তা মনে করে। সে ভাবে—একে ইশারা করলেই তো চলে আসবে। এরকম সহজ হবেন না কারো কাছে। সংসারের মূল কেন্দ্র কিন্তু নারী, কোনো পুরুষ নয়। আপনি যদি কাউকে আকর্ষণ করতে না পারেন, তাকে আপনি ধরে রাখতে পারবেন না। কেন্দ্র কখনো ছোটে না। কেন্দ্র স্থির থাকে, অন্যরা ছোটে। অতএব কখনো আপনি ছুটবেন না।

প্রশ্ন : আমি আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার কাছ থেকে ভালবাসার বিনিময়ে প্রতারণা পেয়েছি। বিশ্বস্ত মানুষের কাছে টাকা দিয়ে ধোঁকা খেয়েছি। ভালবাসা ও টাকা, দুটো থেকেই বিশ্বাসঘাতকতা পেয়েছি। জীবনটা কেমন যেন এলোমেলো লাগে, তবুও হাল ছাড়ি নি। আমার মা বলেন, নিরাশ হয়ো না, যা হয়েছে ভালোর জন্যে হয়েছে। কথাটা কি ঠিক?

উত্তর : অবশ্যই ঠিক। আপনার মা ঠিকই বলেছেন যে, যা হয়েছে ভালোর জন্যে হয়েছে। যে পাখি উড়ে গেছে সেটা আপনার ছিল না। বিয়ের পরে চলে গেলে তো আরো বেশি কষ্ট পেতে হতো।

আর এ ধরনের বোকামি করবেন না। প্রেমিককে টাকা দেয়ার মতো আহাম্মক কোনো মহিলা হবেন না। যে ছেলে কোনো মেয়ের কাছে টাকা ধার চায়, সে আসলে পুরুষ নয়। বুঝবেন, সে প্রথম সুযোগেই আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। টাকা পেয়ে আর আপনার দিকে তাকিয়ে লাভটা কী? সে তখন আরেকজনের পেছনে ছুটবে। অতএব কোনো মেয়ে প্রেমে পড়ে কাউকে আর্থিক সাহায্য করবেন না। তাহলে টাকাও যাবে, প্রেমও যাবে।

আবার একধরনের ছেলেদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে—তারা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে এবং বড়লোকের মেয়ে খোঁজে। তারপর নিজের দুর্দশার কথা বলে। এদিকে মেয়ে তো ধনীর দুলালি, মা-বাবার টাকা আরেকজনকে দিতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ এগুলো তার কষ্টার্জিত টাকা নয়।

তাই অর্থনৈতিক লেনদেন বা নির্ভরতা শুরু হলেই বুঝবেন আসলে এটা প্রেম নয়, আপনি হলেন তার টাকার উৎস। সবসময় মনে রাখবেন, প্রতারণা করা অপরাধ, কিন্তু প্রতারিত হওয়া অসম্মানের। তাই সচেতন থাকবেন, নিজের সম্মান বজায় রাখবেন। আবেগের বশে কখনো আহাম্মক হবেন না। আমরা দোয়া করি যেন আপনি কষ্টগুলো ভুলে গিয়ে নতুনভাবে আপনার জীবন শুরু করতে পারেন।

প্রশ্ন : আমাকে যে ভালবাসত সে এখন আমাকে বিয়ে করতে চায় না। তার মা-বাবা, ভাই—সবাই আমাকে তাদের বাড়ির বউ বানাতে রাজি, কিন্তু সে রাজি না। আমি মস্ত বড় ভুল করেছি। সেটা হলো, বিয়ের আগেই তার সাথে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়। এখন আমি তার কাছে খুব সস্তা হয়ে গেছি। সে নানান অজুহাত দেখায়। শুধু আমার দোষ ধরে। কী করব? আপনার দোয়া চাই, সে যেন ভালো হয়ে যায়।

উত্তর : আমি তো মা দোয়া করব, কিন্তু ভুল তো আপনি করেই ফেলেছেন। এখন বল আর আপনার কোর্টে নেই। অনেক ছেলে মনে করে, বিয়ের পরের কাজটা আগে করে ফেললে আর বিয়ের দরকার কী? বিয়ের আগে কোনো ছেলের কাছে যদি একবার ওপেন হয়ে যায় কোনো মেয়ে, মেয়েটির আর দাম থাকে না সেই ছেলের কাছে। এখন সে আপনার দোষ ধরবে এড়িয়ে যাবে, এটাই বাস্তবতা। এভাবে নিজের সম্ভ্রম খোয়ানো নিঃসন্দেহে জঘন্য পাপ।

ছেলেদের এই সাইকোলজিটা মেয়েরা বোঝে না। প্রেমে পড়লে দিশা ঠিক থাকে না, বিশেষত সরল মেয়েদের। এরা আধুনিকতার নামে ছেলেদের ফুসলানিতে পড়ে যায়। সাধারণভাবে মেয়েরা সম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তরিক। একবার যদি কেউ ফুসলাতে পারে, তার সামনে ছেলেটার ভালো চেহারা ছাড়া আর কিছু থাকে না। এখানেই ভুলটা হয়। সব তখন সিনেমার প্রেমের মতো হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবটা তো সিনেমা নয়।

অতএব কোনো মেয়ে এই ভুলটা করবেন না। বিয়ের আগে এরকম প্রস্তাব দিলে সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যাবেন। সরাসরি বলবেন যে, আগে বিয়ে করো, তারপর সব ঠিক আছে। আজকে আমার জন্যে ধৈর্য রাখতে না পারলে আরেকদিন আরেকজনকে দেখেও হয়তো তোমার ধৈর্য থাকবে না। অতএব বিয়ের আগে কখনো বিয়ের পরবর্তী সম্পর্কে যাবেন না। না হলে শুধু আফসোসের বোঝা বহন করা ছাড়া আর করার কিছু থাকবে না।

প্রশ্ন : আমি জীবনে তিনটি তরুণীর সাথে প্রেম করে ব্যর্থ হয়েছি। বয়স ২৪। অনেক সমস্যায় আছি। আমি কী করব?

উত্তর : খুব ভালো। সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ একটাই—প্রেমরোগ থেকে মুক্ত হওয়া। কারণ বার বার প্রেমে পড়বেন আর ছ্যাঁকা খাবেন, এটা তো কারো জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। অতএব এখন চতুর্থ প্রেম করুন জ্ঞানের সাথে, পড়ালেখার সাথে, বইয়ের সাথে। জ্ঞান আপনাকে কখনো ছ্যাঁকা দেবে না। যারাই জ্ঞানের সাথে প্রেম করেছে তারা জীবনে সফল হয়েছে। আপনি যখন পড়ালেখা এবং কাজে ভালো করবেন, তখন আর প্রেমে ব্যর্থ হতে হবে না। তখন সব তরুণীর পরিবার থেকে অভিভাবকরাই আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে। এটাই বাস্তবতা। অতএব নিজের কাজে মন দিন।

প্রশ্ন : আমি একজনকে সবচেয়ে বেশি ভালবেসে সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছি। আমি তাকে প্রচণ্ড বিশ্বাস করতাম। যখন তার সন্তান আমার গর্ভে আসে, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। পরে খোঁজ নিয়ে দেখি, আরো অনেকের সাথে তার সম্পর্ক। তারপরও আমি তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখি। কিন্তু সে রাজি হয় না। দুর্ভাগ্যবশত আমার মিসক্যারেজ হয়ে যায়। খুব কষ্ট পাই আমি। ইচ্ছা ছিল এই সন্তানকে নিয়ে জীবন কাটাব। আমার পরিবার আমাকে বোঝায়, ওর আশা বাদ দিতে বলে। কিন্তু আমি ওকে এতটাই ভালবাসি যে, ভুলতেই পারছি না। আমার কী করা উচিত?

উত্তর : এজন্যেই বলা হয়, ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। করে ভাবলে তো আপনাকে মূল্য দিতে হবেই। আপনি ঠিকই খোঁজ নিলেন এবং জানতে পারলেন যে, আরো অনেকের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। এই খোঁজখবর যদি আগে নিতেন, তাহলে বেঁচে যেতেন। আপনার ভাগ্য ভালো যে, এত কিছুর পরেও পরিবার আপনার পাশে আছে।

প্রেমের নামে এখন যে কী হচ্ছে, আল্লাহ আলেমুল গায়েব বলতে পারবেন। পুরুষদের মিষ্টি কথায় মেয়েরা কেন নিজেকে এত সস্তা করে ফেলবেন? কাউকে ভালবাসলেই কি শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত যেতে হবে? এটা তো মহাপাপ। এই পাপের শাস্তি কি পেতে হবে না? এত প্রতারণার পরেও ছেলেটিকে ভালবাসতে পারছেন! এই ভালবাসার কিছুটা যদি নিজের প্রতি রাখতেন, তাহলে আপনি নিজেকে এতটা সহজলভ্য করে তুলতেন না।

আমরা সবসময় বলেছি, যে মেয়ে বিয়ের আগে কোনো ছেলের সামনে এভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেয়, তাকে সেই ছেলে আর বিশ্বাস করতে পারে না। তার কাছে মেয়েটির কোনো গুরুত্ব থাকে না। নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে, এরপরও যে মেয়ে নিজে যেচে কারো গলায় ঝুলতে চায়, তার কপালে শেষ পর্যন্ত অসম্মানই জোটে। এভাবে নিজেকে বিক্রি করবেন না। মা-বাবা কত কষ্ট করে আপনাকে বড় করেছেন! নিজের সম্মান তো রাখবেন! এখন যদি জোর করে তাকে বিয়ে করেন, শ্বশুরবাড়িতে আপনি কোনোদিন সম্মান পাবেন না। আপনাকে থাকতে হবে ছোবড়ার মতো। পরে কথা শুনে শুনে মরতে হবে। অনেক সময় তারা আপনার প্রতি হিংস্র হয়ে নির্যাতনও করতে পারে।

অতএব পরিবারের সম্মান এবং নিজের সম্মান আর নষ্ট করবেন না। এখন নিজে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করুন। পাপের জন্যে তওবা করুন। মাফ করার মালিক আল্লাহ। তাঁর কাছে কান্নাকাটি করুন আপনার সুন্দর জীবনের জন্যে। ভালো কাজে মন দিলে সময়ের সাথে সাথে সব দুঃখ ভুলে যাবেন।

প্রেম করে বিয়ে

প্রশ্ন : প্রেম বা প্রেমের বিয়েকে আপনি সাফল্যের প্রধান অন্তরায় বলেছেন। কিন্তু অ্যারেঞ্জড বা পারিবারিক সম্মতির বিয়েতে মা-বাবা ছেলের পরিবার ও যোগ্যতা দেখে। তারা এটা কখনো বুঝতে চেষ্টা করে না, আদৌ ছেলের সাথে মেয়েটির অ্যাডজাস্টমেন্ট বা মিল হবে কিনা, যেটা একজন মানুষের সাথে কিছুদিন চললে বোঝা যায়। এ-ক্ষেত্রে মেয়েটির ভাগ্যের ওপর সবকিছু ছেড়ে দেয়া ছাড়া কিছু কি করার আছে? আপনার দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই।

উত্তর : প্রেম বা প্রেমের বিয়েকে আমরা সাফল্যের প্রধান অন্তরায় কখনোই বলি নি। আমরা যেটাকে অপছন্দ করি, সেটা হচ্ছে শিক্ষার্থী জীবনে প্রেম। কারণ মা-বাবা আপনাকে জ্ঞান অর্জনের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে পাঠাচ্ছেন, প্রেম করার জন্যে নয়। কিন্তু আপনি ক্লাস-পড়াশোনা বাদ দিয়ে ফুচকা খাচ্ছেন, সিনেমা দেখছেন, এখানে-সেখানে ঘুরছেন; পড়াশোনার দিকে আপনার আর মন থাকছে না।

ফলে আপনি ভালোলাগার নাম করে প্রেমরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ তাকে ছাড়া আর কোনোকিছুই ভালো লাগছে না। সারাক্ষণ তার কথা চিন্তা করছেন। আপনি এতে এমনভাবে জড়িয়ে যাচ্ছেন—আপনার মূল লক্ষ্য যে পড়াশোনা, সেটাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

আর অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ অথবা পারিবারিক সম্মতির বিয়ে, এ-ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুব পরিষ্কার। বিয়ের ব্যাপারে ছেলে/ মেয়ের পছন্দ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট। দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা সমান হতে হবে। হয়তো মেয়ে পর্দা করে, ছেলে নাট্যকর্মী। দুজনের সামাজিক স্তর যদি সমানও হয়, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ভিন্ন হওয়ার কারণে স্বামী তো বিয়ের পরদিনই চাইবে যে, তার স্ত্রী পর্দা ছাড়ুক। তাই এখানে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই মেয়েটি মানিয়ে নিতে পারবে না।

আর কিছুদিন সাথে চললে পরস্পরকে চেনা যায়, এটাও ভুল ধারণা। কারণ প্রেমের সম্পর্ক হচ্ছে মেকি সম্পর্ক। শুধু একজন আরেকজনকে খুশি করার ও প্রশংসা করার সম্পর্ক। এই সম্পর্কে কোনো দায়দায়িত্ব নেই। বিয়ের পরও আপনি ছয় মাস হোটেলে হোটেলে থাকুন, ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করুন, দেখুন চিনতে পারেন কিনা। পারবেন না। কারণ সেই সম্পর্কটা হচ্ছে ঠুনকো। যদি তা না হতো, তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকার বিয়েগুলো এত ডেটিংয়ের পরেও ভেঙে যেত না।

আমাদের দেশেও প্রেমের বিয়ের একটা বড় অংশ ব্যর্থ হয় এবং ভেঙে যায়। কারণ প্রেমের সম্পর্ক হলো পরস্পর পরস্পরকে তেল দেয়া। কিন্তু বিয়ে হচ্ছে পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যের এবং এটা সারাজীবনের সম্পর্ক। প্রেম মানে হচ্ছে ফুচকা আর ফাস্ট ফুডের দোকান। কিন্তু বিয়ের পরে তো ফুড তৈরি করতে হয়। তখন শুরু হয় সমস্যা। মনে হবে, 'আরে, বিয়ের আগে এত সুন্দর করে কথা বলত! এখন দেখি ধমক দিয়ে বলছে—এখনো নাশতা রেডি হয় নি?' ব্যস, অশান্তির শুরু।

যতক্ষণ পর্যন্ত দায়িত্বের মুখোমুখি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে কেউ কাউকে চিনতে পারে না। ইউরোপ-আমেরিকাতে বিয়ের আগেই চেনা-চিনি

সব শেষ হয়ে যায়। তবুও দেখবেন তাদের ডিভোর্সের হার অনেক। আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ স্ট্যাটিসটিকস ২০২৪ অনুসারে, তাদের ডিভোর্সের হার ৫০ শতাংশ। অতএব বিয়ের ক্ষেত্রে আপনার সিক্সথ সেন্সটাকে প্রাধান্য দেবেন। অন্তরকে জিজ্ঞেস করবেন, মানুষটা কেমন হবে আমার জন্যে? আর কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট তো করতেই হবে। ৬০% বা ৭০% মিল হলেই তো অনেক। ইনটুইশন—অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে প্রজ্ঞাকে প্রাধান্য দেবেন। তাহলে আপনি ভুল করা থেকে বেঁচে যাবেন।

আর পছন্দের ব্যাপারে মা-বাবার মতামত অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সবকিছু মা-বাবা নিজেরাই ঠিক করে ফেলবেন—আমরা এতে বিশ্বাস করি না। কারণ ঘর করবেন আপনারা। তাই পারিবারিক সম্মতির পাশাপাশি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের দুজনের পারস্পরিক পছন্দ।

বিয়ের ব্যাপারে সহজ ফর্মুলা হচ্ছে, প্রত্যেকেরই পজিটিভ এবং নেগেটিভ কিছু পয়েন্ট থাকে। আপনি যদি মেয়ে হন, ছেলের নেগেটিভ এবং পজিটিভ পয়েন্টগুলো নোট করুন এবং দেখুন আপনার পজিটিভ পয়েন্ট ও নেগেটিভ পয়েন্ট কী কী? দেখুন কতটা ম্যাচ হয়। যদি ৬০/৭০ ভাগ মিলে যায়, বাকিটা নিয়ে আর খুঁতখুঁত না করাই ভালো। সেটুকুকে মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ বিয়ের পুরো ব্যাপারটাই হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট। যদি মতের এবং চিন্তার মিল থাকে, অ্যাডজাস্টমেন্ট তুলনামূলক সহজে হয়।

প্রশ্ন : আমি একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু আমার পরিবার থেকে কোনোদিনও তার সাথে আমার বিয়ে দেবে না। এদিকে আমার মনও তাকে ছাড়া অন্য কাউকে চাইছে না। মনে হচ্ছে ওকে ছাড়া বাঁচব না।

উত্তর : পছন্দ যে-কাউকে হতে পারে, ভালো যে-কাউকে লাগতে পারে। কিন্তু বিয়ে হতে হবে দুই পরিবারের সম্মতিতে। কারণ বিয়েটা শুধু দুজনের ব্যাপার নয়। বিয়ের সাথে অনেকগুলো জীবন, অনেকগুলো মানুষ জড়িয়ে যায়। তাই পারিবারিক সম্মতি না থাকলে সে বিয়েতে অশান্তি ছাড়া আর কিছু হয় না।

আর মন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে চাইছে না—এর চেয়ে ভুল ধারণা আর কিছু হতে পারে না। কারণ সময়ের সাথে, ঘটনার প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন কারণে চাওয়া সবসময় বদলাতে থাকে।

বিখ্যাত একজন মানুষ ইউনিভার্সিটিতে যখন পড়েন, তখন তিনি এক মেয়ের জন্যে আত্মহত্যা করতে গেলেন। কিন্তু মারা গেলেন না, কোমায় চলে গেলেন। বন্ধুরা ভাবল, এবার নিশ্চয়ই মেয়েটির মন গলবে। তারা দল বেঁধে

গেল তার কাছে। বলল, একবার তুমি তার কাছে চলো। তোমার কণ্ঠ শুনে যদি সে কোমা থেকে ফিরে আসে! মেয়েটি তখন বলল, আমি মনে করি না সে আমার জন্যে আত্মহত্যা করতে গেছে। সে আসলে মানসিক রোগী, একজন প্রেমরোগী। আমি নিশ্চিত যে, সে সুস্থ হয়ে উঠলে আগামী একবছরের মধ্যেই আবার প্রেমে পড়বে।

দুই/ তিন সপ্তাহ পর তিনি কোমা থেকে ফিরলেন। মজার ব্যাপার হলো, একবছর যেতে না যেতেই আরেকজনের প্রেমে পড়লেন এবং তার সাথে বিয়েও হয়ে গেল। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আত্মহত্যা মহাপাপ জেনেও তুমি কেন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে? তিনি বললেন, আমি একটা আহাম্মক ছিলাম। যদি মরেই যেতাম তো জীবনের অনেক সুখ থেকে বঞ্চিত হতাম।

কাজেই যখন মনে হয় যে, ওকে ছাড়া বাঁচব না—মনে রাখবেন, এটা ভুল চিন্তা। জীবন এর চেয়ে অনেক বড়। জীবনে কেউই অপরিহার্য নয়।

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে ভালবাসি, বিয়ে করতে চাই। কিন্তু আমার মা-বাবা চান না। মাঝে মধ্যে মনে হয় তাকে ভুলে যাই। কিন্তু যখনই মনে হয় অন্য কোনো ছেলেকে বিয়ে করে সে সংসার করবে, তখন আর মনকে স্থির করতে পারি না। আমি কী করতে পারি?

উত্তর : এতে অস্থির হওয়ার কী আছে? আসলে এখানে কয়েকটি ব্যাপার। প্রথমত বুঝতে হবে, কেন আপনার মা-বাবা আপত্তি করছেন। বিয়েতে সম-সামাজিক, সম-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। আপনার মা-বাবা যদি এরকম কোনোকিছুর ভিত্তিতে আপত্তি করে থাকেন, তাহলে সেটা যুক্তিসঙ্গত। যদি তা না হয়, মেয়েটি যদি সবদিক থেকেই আপনার উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদেরকে বোঝান।

আর যদি দেখেন যে, মা-বাবাকে বোঝানোর মতো কোনো যুক্তি আপনার কাছে নেই, তাহলে তার জন্যে দোয়া করুন, যেন তারও একটা ভালো বিয়ে হয়, সে-ও যেন সুখে থাকে।

প্রশ্ন : আমার সাথে একটি মেয়ের সম্পর্ক আছে। বিয়ের ব্যাপারে তার পরিবার রাজি থাকলেও আমার বাবা-ভাইয়েরা রাজি হচ্ছেন না। এদিকে আমার বাবার উগ্র মেজাজের কারণে তারাও বেশ ক্ষুব্ধ। কিন্তু আমাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে। তাই আমরা একে অপরকে ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করতে পারব না, তেমনি পারব না বাবার মনে কষ্ট দিয়ে নিজেরা কোনো

সিদ্ধান্ত নিতে। এখন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব কীভাবে? সারাজীবন কি অনুশোচনা করে যেতে হবে? এতে যদি কোনো অকল্যাণ থেকে থাকে, স্রষ্টা কি চাইলে তা কল্যাণে রূপান্তর করে আমাদের কবুল করে নিতে পারেন না?

উত্তর : তারুণ্যে বিপরীত লিঙ্গের সাথে সম্পর্কের শুরু হয় ভালোলাগা দিয়ে। ভালোলাগাটা আস্তে আস্তে শারীরিক আকর্ষণে পরিণত হয়। তা থেকে একটা সময় দৈহিক সম্পর্ক। কারণ তরুণ বয়সে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর সম্পর্কটা হচ্ছে মোম এবং আগুনের মতো। আগুন যে-রকম মোমকে গলিয়ে ফেলে সে-রকম কারো পক্ষে নিজেকে ধরে রাখাটা খুব কঠিন। তখন তা শারীরিক সম্পর্কের দিকে গড়ায়।

এখন আপনার ক্ষেত্রে যা হওয়ার তা-তো হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন, আর চেষ্টা করুন দুই পরিবারের সম্মতিতে যত দ্রুত সম্ভব বিয়েটা সেরে ফেলতে।

প্রশ্ন : একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে যদি পরস্পরকে পছন্দ করে এবং বিয়ে করতে চায় কিন্তু পরিবার থেকে যদি রাজি না হয়, সে-ক্ষেত্রে কী করা উচিত? একজনকে ভালোলাগার পর কি অন্য কোথাও বিয়ে করা সম্ভব?

উত্তর : অসংখ্য ঘটনা এমন যে, ভালবাসছে একজনকে আর বিয়ে করছে আরেকজনকে। আবার এমনও দেখা যায়, ভালবেসে বিয়ে করার পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে, আবার বিয়ে করছে। আসলে আমরা নাটক-সিনেমা দেখে একটা অবাস্তব জগতের মধ্যে চলে যাই। একজনকে ভালো লাগে, মোহে পড়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়ে বিয়ে করে, তারপরে ফাটাফাটি এবং আলাদা হয়ে যাওয়া। প্রচুর ঘটনা এমন ঘটছে।

ভালোলাগা এবং বিয়ে দুটো এক জিনিস নয়। প্রেমিক/ প্রেমিকা হওয়া বা স্বামী/ স্ত্রী হওয়া এক নয়। প্রেমিকা বা প্রেমিকের কোনো দায়িত্ব থাকে না। পয়সা কম থাকলে ফুচকা খাওয়া, পয়সা বেশি থাকলে বড় রেস্টুরেন্টে চাইনিজ। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রী হওয়া দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ব্যাপার। অতএব ভালোলাগা এবং বিয়ে দুটোকে এক করে ফেলবেন না।

আসলে এই ডিজিটাল জগত বা বায়বীয় ব্যাপারগুলোকে জীবনের সাথে জড়াবেন না। একটা ফুল আরেকজনের বাগানে ফুটে আছে। ভালো লাগতেই পারে। বলবেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! যার ফুল তার বাগানে থাকুক। আমার তো ওখান থেকে ছিঁড়ে আনার কোনো প্রয়োজন নেই।

বিয়ে দুই পরিবারের সম্মতিতে হওয়া উচিত। আপনার ভালোলাগা যদি পরিবারের সাথে মিলে যায়, আলহামদুলিল্লাহ! পরিবার রাজি না হলেও আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। কারণ ওই বিয়ের মধ্যে হয়তো কল্যাণ নেই।

প্রশ্ন : আমার মা-বাবা দুজনেই চাকরিজীবী। তাদের সাথে সবসময় আমার দূরত্ব ছিল। আমি একটা ছেলেকে ভালবাসি। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি, আমি কতটা ভুল করেছি। আমার পরিবার চায় না ওর সাথে আমার বিয়ে হোক। আমি জানি, ওকে বিয়ে করলে পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষ হবো। কিন্তু আমি সম্পর্কটা এত গভীর করে ফেলেছি যে, তাকে ছাড়া সম্ভব নয়। অন্য কাউকে বিয়ে করলেও পাপ হবে। আমি কী করব?

উত্তর : আপনি নিজেই নিজের বৃত্ত তৈরি করেছেন। আপনার কথা অনুযায়ী—ছেলেটিকে বিয়ে করলে আপনি পৃথিবীর সবচেয়ে দুঃখী মানুষ হবেন। আপনার পরিবারও চায় না বিয়েটা হোক। তারপরও আপনি কেন বিয়ে করতে চাইছেন? বিয়ের পরে কি ডিভোর্স হয় না? তাহলে ছাড়াছাড়ির সিদ্ধান্তটা বিয়ের আগে নিতে অসুবিধা কী?

আর একটা বিষয় হচ্ছে, পাপ যা হওয়ার তা-তো হয়ে গেছে। মানুষই ভুল করে এবং মানুষই ভুল থেকে মুক্ত হতে পারে। এখন আল্লাহর কাছে শুদ্ধচিত্তে ক্ষমা চান। তিনি ক্ষমাশীল। তিনি যে-কাউকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু একটা পাপকে টেনে নিয়ে আরো দুঃখী হওয়ার মানে কী? আমাদের দোয়া থাকবে, যাতে আপনি সুখী হন।

প্রশ্ন : আমি একজনকে ভালবাসি, সে-ও আমাকে ভালবাসে। আমাদের পরিবার শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন। কিন্তু মেয়ের বাবা আমাকে মেনে নেবে না বলেছে। আমার সাথে বিয়ে হলে ওকে নাকি বাসার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। কিন্তু পরিবারের দোয়া ছাড়া আমি কিছু করতে চাই না। এ অবস্থায় আমি কী করতে পারি? আমার মানসিক অবস্থা খুব খারাপ।

উত্তর : সম্ভবত এখানে একটা ইগো ক্ল্যাশ আছে। হয়তো মেয়েটির বাবার অন্য কোনো পাত্রকে পছন্দ ছিল। কারণ যা-ই হোক, এখন হবু শ্বশুরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। আসলে আন্তরিক হলে একজন মানুষের মন জয় করা কিন্তু সে-রকম কঠিন কিছু নয়। মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে হবু শ্বশুরকে এনে বোঝান যে, আপনার মেয়েকে আমি ভালো রাখব, সুখে রাখব।

প্রশ্ন : আমার প্রেমের বিয়ে ছিল। বিয়ের বয়স আট বছর। আমার শ্বশুরবাড়িতে আমাকে সবসময় ছোট করে দেখা হয়। আমার মা-বাবাকেও যথেষ্ট কথা শুনতে হয়। কোনো সন্তানও হয় নি। আমি কী করতে পারি?

উত্তর : বাস্তবতা হচ্ছে, আপনি প্রেম করে বিয়ে করেছেন এবং আপনার শ্বশুরবাড়িতে বিষয়টা মেনে নেয় নি। এখন তারা মেনে নেবে কিনা এটা নির্ভর করছে আপনার গুণের ওপর, আপনার ধৈর্যের ওপর। আপনি তাদের মনটাকে জয় করতে পারবেন কিনা এর ওপর নির্ভর করবে।

অতএব শ্বশুর-শাশুড়ি সবাইকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে ক্রমাগত বোঝান এবং দোয়া করতে থাকুন। নিজের মা-বাবার মতোই তাদের যত্ন নিন। তাদের তো বয়স হচ্ছে। তখন তারা আপনার ওপর নির্ভরশীল হয়ে যাবে। এজন্যে ধৈর্য ধরতে হয়। সংসার মানেই হচ্ছে ধৈর্যের খেলা।

প্রশ্ন : আমার মেয়ে একটি প্রতিষ্ঠিত কলেজের লেকচারার। কিন্তু তার চেয়ে কম যোগ্যতার এক বেকার ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। আমার স্বামী মেয়েকে সহ্যই করতে পারছেন না। আমার মনও সায় দিচ্ছে না। কী করব?

উত্তর : বিয়ে যখন করে ফেলেছে, এখন আর অশান্তি না করাই ভালো। কারণ মেয়ে ম্যাচিউরড। সে যদি মনে করে যে, বেকার ছেলেকে বিয়ে করে সে সুখী, আপনার বলার কী আছে? তাছাড়া মা-বাবা না মানলে এখন সম্পর্ক তেতো হওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। বরং দোয়া করুন যেন মেয়ে ভালো থাকে এবং তার স্বামীও যেন দ্রুত সম্মানজনকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

প্রশ্ন : আমার লাভ ম্যারেজ। দেড় বছরের সংসার। বর ইউএসএ থাকে। বিয়ের পর থেকেই সে খারাপ ব্যবহার করেছে। এখন আরেকটা বিয়ে করতে চাচ্ছে। এ নিয়ে সারাক্ষণ ঝগড়া হচ্ছে। আমাকে অনেক মানসিক নির্যাতন করে। দুই পরিবার সব জানে। কিন্তু তারা বলেছে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে। আমি এখন কী করব? দয়া করে আপনি পরামর্শ দিন।

উত্তর : দুই পরিবার তো ঠিকই বলেছে। কারণ লাভ ম্যারেজ মানে বিয়ের আগে প্রেম করেছেন, তারপর বিয়ে করেছেন। আপনি প্রেম করার আগে তো কারো সিদ্ধান্ত চান নি। প্রেমও আপনি করেছেন। বিয়েও আপনার উদ্যোগে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আপনার সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।

আমরা সবাইকে বলি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা পৃথিবীর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ এবং একইসাথে দুর্বোধ্য সম্পর্ক। এর মধ্যে কখনো নাক গলাতে হয় না। এমনকি মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া হলেও সেখানে যাবেন না। এটা সমাধানের দায়িত্ব সবসময় তাদের ওপর ছেড়ে দেবেন। কারণ তাদের ইকুয়েশন, তাদের কেমিস্ট্রি একেবারেই আলাদা। তারা কখন ঝগড়া করবে, কখন মিল হবে এটা অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

এখন আপনাকে তো পরামর্শ দেয়ার কিছু নেই। আল্লাহর ওপর ভরসা করে যেন সর্বোত্তম সিদ্ধান্তটি নিতে পারেন, সেজন্যে আমরা দোয়া করি।

প্রশ্ন : আমি প্রেম করে গোপনে বিয়ে করেছি। এরপর থেকেই মায়ের বাসায় থাকি। স্বামী তার পরিবারে বিয়ের বিষয়টি বলতে দেয় না। এমনকি জানাজানি হলে ডিভোর্স দেয়ার কথা বলে। কোথাও আমার পরিচয় দেয় না সে। ভরণপোষণও দেয় না, আলাদা বাসায়ও রাখে না। অথচ মুখে অনেক ভালবাসা দেখায়। তবে কি প্রকৃতই সে আমাকে ভালবাসে?

উত্তর : এরপরেও যদি না বোঝেন! এই স্বামী আপনার গায়ে হাত তুললেও কি মনে করবেন যে, ভালবেসে মারছে? আচ্ছা, বিয়ে কি পাপের কিছু? কেন আপনি গোপনে বিয়ে করবেন? এভাবে বিয়ে করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন পরিণতি ভোগ করতে হয়। কারণ ছেলেরা ভাবে যে, পেয়েই তো গেছি! যখন খুশি এই মেয়েকে ব্যবহার করব। এর পরিচয় দেয়ার দরকার কী?

এই মেয়েদের জন্যে খুব মায়া হয়। এরা নিজের সম্মান নিজে রাখতে শেখে নি। ছেলেরা এদেরকে কী সম্মান দেবে? সব মেয়েকে বলব, বিয়ে করবেন দুই পরিবারের সম্মতি ও দোয়া নিয়ে। কখনো প্রেম করে গোপনে বিয়ে করার মতো বোকামি কেউ করবেন না।

প্রশ্ন : আট বছর ধরে পারস্পরিক চেনাজানার পর চার বছর আগে আমরা বিয়ে করেছি। কিন্তু পরিবারকে জানাই নি। এখন আমার স্বামী চাকরি করেন। এর মধ্যে বাসায় বিয়ের কথা বলার পর আমার শ্বশুর খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন। তার ছেলেকে বলেছেন, হয় ওই মেয়ে, নয়তো আমি—এর মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তোমাকে। তবে পরিবারের বাকিরা এতটা বিপক্ষে না। তারা সবাই মিলে বোঝানোর পরও কোনো লাভ হয় নি। এদিকে আমার শ্বশুর হার্টের রোগী। তার জন্যে উত্তেজনা ক্ষতিকর। আমার স্বামী খুব হতাশ হয়ে পড়েছেন। এখন আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : বিয়ে তো করেই ফেলেছেন। করণীয়ের তো আর কিছু বাকি রাখেন নি। এজন্যেই আমরা বলি, বিয়ে সবসময় পারিবারিক সম্মতিতে হওয়া উচিত। নিজেরা নিজেরা এভাবে লুকিয়ে বিয়ে করাটা কখনোই উচিত নয়। এখন সত্যটাই বলতে হবে। ছেলে বাবাকে গিয়ে বলুক, বাবা, মারো-কাটো, যা করো—বিয়ে যেহেতু করে ফেলেছি, এখন না ছাড়তে পারব একে, না ছাড়তে পারব তোমাকে। জানি, আমি ভুল করেছি। কিন্তু এই তোমার পায়ের কাছে বসলাম। যতক্ষণ ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ এখান থেকে আমি উঠব না। আর শ্বশুরকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাতে থাকুন।

প্রশ্ন : আমি অনার্স চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। আমি পছন্দ করে বিয়ে করেছি নয় মাস আগে। আমার মা-বাবা রাজি হয়েছিলেন। কারণ ছেলেপক্ষ বলেছিল, আমাকে তারা চাকরি করতে দেবে। এখন বিয়ের পর আমার অনেক কাজ করতে হয়। আমি পড়াশোনা করার সময় পাই না। পড়ার সময় পেলেও আমি মনোযোগী হতে পারি না। কারণ সকালে নাশতার পরে আমার টেনশন হয়—দুপুরে কী খাবারের ব্যবস্থা করব? দুপুরের পর আবার রাতের টেনশন। রাতে একটু পড়তে বসলে আবার সকালে কী নাশতা বানাব, স্বামীকে কী লাঞ্চ দেবো, এসব কিছুতে আমার দিন চলে যাচ্ছে। আমার পড়াশোনা বা চাকরি কিছুই হচ্ছে না। এখন কী করব?

উত্তর : এখন আর কী করবেন? রান্নাবান্না করবেন! কারণ আপনার জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই। আপনি প্রেম করে বিয়ে করেছেন। সেসময় এসব বাস্তবতা নিয়ে ভাবেন নি। বিয়ে মানে তো অনেক দায়িত্ব। এখন রান্নার দায়িত্বও নিতে হবে, আবার পড়ালেখাও করতে হবে। বিয়ের পরে মহিলাদের ক্যারিয়ার গোছাতে হলে অনেক পরিশ্রমী হতে হয়। আমি বহু মহিলাকে জানি যারা বিয়ের পরে অনেক মেহনত করে ঠিকই পড়াশোনা করেছেন।

রান্না নিয়ে এত টেনশনের কী আছে? জীবন তো একটাই। শুধু খাবারের চিন্তা করেই শেষ করবেন? আপনাকে বুঝতে হবে যে, কোনটা আপনার প্রায়োরিটি। আপনার প্রায়োরিটি যদি পড়াশোনা হয়, তাহলে পড়াশোনাতে বেশি মনোযোগ দেবেন। অর্থাৎ জীবনের প্রায়োরিটিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। খাবার যা আছে, তা-ই রান্না করবেন। পরিবারের জন্যে রান্না করা তো ভালো কাজ। কিন্তু কাজটা আনন্দ নিয়ে করবেন।

আপনার লেখা থেকে বোঝা যায়, কাজটাকে আপনি ছাড়তেও পারছেন না, আবার পছন্দও করতে পারছেন না। এটা হচ্ছে জীবনে অশান্তির বড়

উপাদান। যে কাজই করেন টেনশন ও বিরক্তির সাথে নয়, কাজটাকে যেন আপনি উপভোগ করেন। তাহলে কাজে বরকত পাবেন। আর স্বামীর সাথে সরাসরি কথা বলুন—আমি চতুর্থ বর্ষে আছি। পড়াশোনা করে এই করতে চাই। এই সময়টা আমাকে সহযোগিতা করতে হবে।

আরেকটি দিক হলো, আপনার লেখাপড়া বা চাকরি করাটা যদি শুধু উপার্জনের জন্যে হয়, তাহলে কষ্ট আরো বেশি হবে। আপনার অশান্তি আরো বাড়বে। কারণ যখন কোনো বড় লক্ষ্য ছাড়া আপনি চাকরি করবেন, তখন আপনি চাকর ছাড়া আর কিছু হবেন না।

কিন্তু যদি বলেন যে, না, আমি আমার জ্ঞানটাকে কাজে লাগাব, তাহলে ঠিক আছে। কাজটাকে যদি আপনি সেবা হিসেবে নেন, আপনি মহান হবেন, জীবন সার্থক হবে। যেমন, একজন নার্স যদি মনে করেন যে, রোগীর সেবা করাটা আমার পরম ধর্ম, তাহলে সেবা করে তিনি স্মরণীয় হবেন। আর যদি শুধু চাকরির জন্যে নার্সিং পেশা বেছে নেন, এতটা থেকে এতটা ডিউটি! রোগী না ধরলে চাকরি থাকবে না, এটা তখন একটা চাকরের জীবন।

অতএব আপনি আপনার জীবনের লক্ষ্যটাকে ঠিক করুন। আপনার লক্ষ্য একটা সুন্দর সংসার হতে পারে। সন্তান লালন এবং তাদেরকে ভালো মানুষ বানানো হতে পারে। আপনার লক্ষ্য কোনো মহৎ কাজ হতে পারে যে, আমার মেধাকে আমি এই কাজে লাগাব। আপনি যখন লক্ষ্য খুঁজে পাবেন, আপনার সমস্যা থাকবে না। তখন আপনি দিনের সময়টা ভাগ করে নিয়ে সব কাজ ঠিকমতো করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি একজনকে বিশ্বাস করেছিলাম। সে বলেছিল, আমাকে অনেক ভালবাসে। কিন্তু চাকরির কারণে আমাকে সে গোপনে বিয়ে করে। পরে জানতে পারি, সে আমাকে তার সম্পর্কে অনেক মিথ্যা বলেছে। তখন আমি রাগ করে দুই পরিবারকে বিয়ের কথা জানিয়ে দেই। দুই পরিবার অবশ্য মেনে নিতে চাইল। এমন সময় সে বলছে, আমার সাথে আর সম্পর্ক রাখবে না, আলাদা হয়ে যাবে। আমার কী সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত?

উত্তর : সেই তো পরিবারকে জানালেন। কখন? সবকিছু হারিয়ে। মা-বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে করাটা তো অনেক বড় অপরাধ। তাদের স্নেহে লালিত হয়ে আপনি এত বড় হলেন। হঠাৎ আরেকটা পুরুষ তাদের চেয়েও বিশ্বস্ত হয়ে গেল? অন্তত মা-বাবার পরামর্শ ও দোয়া তো নেবেন! এখন তার মিথ্যা বলা নিয়ে রাগ করে কী হবে? এরকম বোকামি করলে তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

চাকরির কারণে সে কেন গোপনে বিয়ে করবে? চাকরি কি বিয়ে করতে নিষেধ করেছে? মা-বাবাকে জানানোর মতো সাহস তো থাকতে হবে যে, আমি তাকে পছন্দ করি, বিয়ে দিলে তার কাছেই দাও। তারা ছেলেটার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আপনাকে জানাতে পারতেন, যদি কোথাও মিথ্যা বা কোনো ঝামেলা থাকে। তখন রাগ হলেও সমাধানটা সহজ হতো। এখন আপনার সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো কিছু নেই।

মেয়েরা সবসময় মনে রাখবেন, পুরুষরা যখন কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাকে পাওয়ার জন্যে করে না বা বলে না এমন কিছু নেই। যদি বলেন যে এখন পানির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তাতেও রাজি হয়ে যাবে! কিন্তু এটা আপনাকে না পাওয়া পর্যন্ত। পেয়ে গেলেই শুরু হয় উল্টা দৌড়। কারণ সে-তো পেয়েই গেছে। তখন উল্টা আপনাকে দৌড়াতে হবে যে, 'আমাকে না ছাড়িয়া চলিয়া যায়'!

যখনই কোনো ছেলে গোপনে বিয়ে করতে চাইবে, সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যাবেন। কারণ সত্যিকার মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ কখনো গোপনে বিয়ে করে না। পুরুষ মানুষ জয় করতে পছন্দ করে। আর যে জয় করতে পারে না তার তো পুরুষ হওয়ার যোগ্যতাই নেই। অতএব বিয়ে করবেন পরিবারকে জানিয়ে এবং সবার দোয়া নিয়ে।

প্রণয় থেকে পরিণয়

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, শিক্ষার্থীদের প্রেম করা নিষেধ। একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের ছাত্র হয়ে যদি কোনো মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে সম্পর্ক রাখতে চাই, এমনটি করা যাবে কি? যেহেতু আর কয়েক বছর পরে বিয়ের পাত্রী খুঁজতে গিয়ে উপযুক্ত কাউকে পেতে অনেক কষ্ট হবে।

উত্তর : আপনি মাস্টার্স করছেন, আপনার বয়স কত হবে, ২৩/২৪। বিয়ে করার জন্যে উপযুক্ত হবেন আরো চার/ পাঁচ বছর পর ২৮-৩০ বছর বয়সে। তো পাঁচ/ ছয় বছর পর যখন বিয়ে করবেন, তখন পাত্রী পাবেন না—এ আশঙ্কায় ছাত্রাবস্থায় প্রেম করার ভাবনা তো হাস্যকর!

নিজেকে একজন সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলুন, আপনি যোগ্য হোন, পাত্রীর অভাব হবে না। পাত্রীর কোনো অভাব আসলেও নেই, আছে দায়িত্ব নেয়ার লোকের অভাব। এখন অনেক মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কারণ পুরুষরা

দায়িত্ব নিতে চায় না। বিয়ে করে আবার খাওয়াতে হবে, সংসার করতে হবে। এত ঝামেলায় না গিয়ে একটু ঘুরলাম, এই করলাম, সেই করলাম, বাসায় গিয়ে নিজের মতো থাকলাম। কাজেই ছাত্রাবস্থায় প্রেমের চিন্তা ত্যাগ করুন। বিয়ের সময় হলে দায়িত্ব নেয়ার মানসিকতা নিয়ে মেয়ে খুঁজে দেখুন, যোগ্য পাত্রী আপনি পেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন : আজকাল প্রেম না করলে ভালো মেয়ে বিয়ে করা সম্ভব নয়। বিয়ের আগে কারো সাথে সম্পর্ক রাখা উচিত কিনা—এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

উত্তর : আপনি তো এখনো বেলতলায় যান নি, তাই এরকম ভাবছেন। মেয়ে বা ছেলে ভালো, না খারাপ—এটা বোঝা যায় বিয়ের পরে, আগে না। বিয়ের আগে তো সব লিপস্টিক হাসি।

সব মেয়েই বিয়ের আগে যখন প্রেমে পড়ে নিজেকে নায়িকা মনে করে আর সব ছেলেই নিজেকে নায়ক মনে করে। যাকে যার পছন্দ হয়, মনে করে যে নায়ক বা নায়িকা চলে এসেছে। বিয়ের আগে সবাইকে খুব ভালো মনে হয়। বিয়ের পরে বোঝা যায় আসল রূপ।

যে মনে করে প্রেম না করলে ভালো মেয়ে বিয়ে করা সম্ভব নয়, তার মতো আহাম্মক পৃথিবীতে দ্বিতীয়টা নেই। কারণ প্রেমের সময় কে ভালো, কে মন্দ এটা বোঝার কোনো সুযোগ থাকে না। প্রেমে পড়লে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। যদি প্রেম করলেই বিয়ে সুখের হতো, তাহলে ইউরোপ-আমেরিকায় শুধু প্রেম না, ডেটিং করার পরে বিয়ে করে; তারপরেও বিয়ে টেকে না। এমনকি আমাদের দেশেও প্রেম করে যত বিয়ে, তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশান্তি।

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সে প্রত্যাখ্যান করে। তাকে কীভাবে রাজি করানো যায়? আমার নিয়ত কিন্তু মেয়েটিকে বিয়ে করা। অন্য কোনো বদ মতলব নেই।

উত্তর : এখানে আমরা ভুল করি। কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, সাথে সাথে আপনাকে মেনে নিতে হবে যে, আপনার যে-রকম বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার অধিকার আছে, তারও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা আছে। তিনি যদি প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন, তাহলে আপনি আনন্দিতচিত্তে তার জন্যে শুভকামনা করবেন যে, আপনার আরো ভালো বিয়ে হোক। অন্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো অথবা অপমানিত বোধ করা উচিত নয়।

প্রশ্ন : ইদানীং মনে হয় বিয়ের চেয়ে প্রেম করাটা বেশি সহজ। এটা বলার কারণ বলছি। আমি ব্যাংকে চাকরি করি। আল্লাহ আমাকে যা-কিছু দিয়েছেন সেজন্যে শুকরিয়া। শুধু বিয়েটা হলেই পরিপূর্ণ হয়। বিয়ের নিয়তে আমার সম্পর্ক হয় একজনের সাথে। আমরা একে অপরকে বিয়ে করতে চাই। সব ঠিক আছে, কিন্তু ছেলের বাবা রাজি হচ্ছে না। এদিকে আমার মা-বাবা অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। বিশেষভাবে দোয়া করবেন।

উত্তর : এটা খুব নির্মম সত্য যে, ইদানীং বিয়ে করার চেয়ে প্রেম করাটা সহজ হয়ে গেছে। এখন এই ফেসবুক ইন্টারনেট এসবের ফলে ভয়াবহ একটা অবক্ষয় আমরা দেখছি। আপনার সাথে হয়তো ছেলেটির সম্পর্ক হয়েছে, কিন্তু এখানে ছেলের বাবার সম্মতি নিয়ে বিয়ে করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে পরে কিন্তু পস্তাতে হবে।

আর বাবাকে রাজি করানোর দায়িত্ব ছেলেটির। যে ছেলে মা-বাবাকে রাজি করাতে পারে না, সে ছেলেকে বিয়ে করার দরকার কী? ছেলে যদি মা-বাবাকে রাজি করাতে চায়, তার পক্ষে এটা খুব সহজ। কিছু না, শুধু মমতা দিয়ে বোঝাতে হবে যে, বিয়ে আমি এখানেই করব এবং তোমরাই দেবে। না হলে বিয়েই করব না।

আর আপনার এখন দোয়া ছাড়া কিছুই করার নেই। তবে দোয়া করার সময়ও কুশলী হবেন। বলবেন যে, আল্লাহ! এই ছেলের সাথে বিয়েটা যদি কল্যাণকর হয়, তাহলে যেন সবাই রাজি হয়ে যায়। সবকিছু যেন সময়মতো হয়, সুন্দরভাবে হয়। সময়মতো না হলে সসম্মানে এ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসবেন। দীর্ঘসময় ধরে অপেক্ষা করার মতো বোকামি করবেন না।

বিয়ে

বিয়ে ॥
বিয়ে কী? কেন?

প্রশ্ন : তরুণ বয়স থেকেই আমার কিছু বন্ধুদের দেখেছি বিয়ে নিয়ে তারা খুব মাথা ঘামায়। তাদের কাছে বিয়েটা রোমাঞ্চকর একটা ব্যাপার। আমি এখন লেখাপড়া শেষ করে চাকরিতে ঢুকেছি। বিয়ের জন্যে অভিভাবকরা তাগাদা দিচ্ছেন। অথচ বিয়ের আগের ও পরের এত সমস্যা শুনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। আমি যদি বিয়ে না করি, তাহলে কি এর পরিণাম ভালো হবে?

উত্তর : তরুণ-তরুণীরা এখন প্রেম ও বিয়েকেই ভাবে জীবনের সবচেয়ে 'মহৎ কাজ' এবং তাদের অধিকাংশের প্রায় সমস্ত চিন্তাভাবনা আবর্তিত হয় বিয়ের এই জৈবিক আসক্তিকে ঘিরে, যেভাবে তারা মিডিয়াতে দেখছে। সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়া ভোজন এবং জৈবিক চাহিদা পূরণ—শুধু এই দুটো বিষয়কেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে প্রচার করতে সদাতৎপর।

আবার বিয়ের জন্যে একটি ছেলে বা মেয়ে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত মনে না করলেও অভিভাবকরা অনেক সময় সন্তানের জন্যে বিয়েকে বাধ্যতামূলক মনে করেন এবং নিজেদের ইচ্ছাকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেন। এটা অবিদ্যা এবং অপরাধ।

আসলে বিয়ে জীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং এমন একটি দায়িত্ব যেখানে দৈহিক, মানসিক, বংশধারা রক্ষা এবং আত্মিক—এ চারটি চাহিদাকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে সমন্বিত করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ বিয়ের মাধ্যমে একটি সফল পরিবার গড়ে তুলতে এই চারটি প্রয়োজন পূরণের শর্তই থাকতে হবে। প্রথম তিনটি প্রয়োজন মেটানোর পর কোনো পরিবার যদি শুধু শেষটিকেও বাদ দেয়, অর্থাৎ আত্মিক চেতনা ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব না দেয়, তাহলে সে পরিবার আর পশুর খোঁয়াড়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

কাজেই বিয়ে একটি দায়িত্ব এবং সে দায়িত্ব পালনে দৈহিক, মানসিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম হলে বিয়ে অর্থহীন। এতে অশান্তিই হবে বেশি। কিন্তু একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট দায়িত্ব পালনে ভয় পাবে কেন? বিয়েকে প্রয়োজন মনে করছেন না বা অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত পছন্দ হচ্ছে না—সেটা আলাদা কথা। কিন্তু দায়িত্ব এড়াতে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে কেন? বরং বিয়ের মাধ্যমে একটি সফল পরিবার গড়ে তোলার জন্যে যা যা করা দরকার, তা করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রশ্ন : বিয়ে করার দরকার কী? প্রত্যেক সফল মানুষই সেলফ-মোটিভেটেড। তাছাড়া বিয়ে তো বিরাজমান কোনো সমস্যারই সমাধান নয়, তাহলে কেন বিয়ে? দয়া করে এর ব্যাকগ্রাউন্ড ফিলসফিটা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বিয়ে না করলে কেউ সফল হতে পারবে না—একথা যেমন ঠিক নয়, তেমনি বিয়ে করলেই যে একজন সফল হবে, সেটাও ঠিক নয়। প্রচুর মানুষ আছেন, যারা বিয়ে করেছেন কিন্তু অসফল। আবার বিয়ে করেন নি এমন অনেকেই আছেন, যারা অসফল। আসলে সফলতার জন্যে বিয়ে নয়, দরকার সাফল্যের সূত্রগুলোকে অনুসরণ করা।

এখন আসি প্রথম প্রশ্নে—বিয়ের দরকার কী? বিয়ে হলো একজন মানুষের দৈহিক, মানসিক, বংশধারা রক্ষা ও আত্মিক প্রয়োজন পূরণের একটি সমাজসিদ্ধ ও ধর্মসিদ্ধ প্রক্রিয়া। কেউ যদি এ প্রয়োজনগুলো অনুভব না করে, এ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজন অনুভব করলে তাকে অবশ্যই বিয়ে করতে হবে। বৈধভাবে এ প্রয়োজন পূরণের ভিন্ন কোনো সুযোগ নেই। সামাজিক সম্প্রীতি ও ভারসাম্যের জন্যেই বিয়ে দরকার।

প্রশ্ন : আমি আমার জীবনে একটা ভুল করে ফেলেছি। যখন ভুল করেছি তখন ভুল মনে হয় নি। কিন্তু যার সাথে সারাজীবন কাটাব ভাবছিলাম, এখন পাঁচ মাস পর আমাকে ওর ভালো লাগছে না। আমারও ভালো লাগছে না ওর ব্যবহার। ভুল বলার কারণ হলো ও আমাকে অন্য এক সংসার থেকে নিয়ে এসেছে এবং সেই ঘরে আমার একটা মেয়ে আছে। বিয়ে করার সময় সে বলেছিল যে, আমার মেয়েটির দায়িত্ব নেবে। কিন্তু এখন মেনে নিচ্ছে না।

উত্তর : আসলে যারা অন্যের সংসার ভাঙেন বা সংসার ভেঙে আসেন তারা অধিকাংশই এই ভুলটা করেন। সমস্যা হচ্ছে, ভুলকে তখন ভুলই মনে হয় না। আবেগের বশবর্তী হয়ে অন্ধ বিশ্বাসে নিজের সংসার ছেড়ে এভাবে চলে আসাটা হলো ভুল জায়গায় সুখ খোঁজার মতো। নাসিরুদ্দীন হোজার ওই গল্পটার মতো—

একবার হোজাকে দেখা গেল রাস্তার পাশে বাতির নিচে ঘাসের ওপর কী যেন খুঁজছে! রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল হোজার এক পরিচিত লোক। সে-ও খুঁজতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর এলো আরেকজন! তারপর আরেকজন। একসময় খোঁজাখুঁজির এই চেষ্টায় জুটে গেল রীতিমতো একটা দল! সবাই খুঁজছে। যখন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, একজন প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আমরা কী খুঁজছি?

হোজা বলল, সোনার মোহর! 'সোনার মোহর' শুনে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আবার খুঁজতে লাগল তারা। তারপরও যখন পাওয়া যাচ্ছে না, একজন জিজ্ঞেস করল—হোজা, মোহরটা তুমি ঠিক কোথায় হারিয়েছ? হোজা বলল, মোহরটা হারিয়েছে ওই দূরের পাহাড়ের নিচে অন্ধকারে।

সবাই বিস্মিত—কী! মোহর হারিয়েছে পাহাড়ের নিচে, আর তুমি খুঁজছ এখানে! হোজা বলল, ওখানে যে ঘোর অন্ধকার! এত অন্ধকারে কি কখনো কিছু খুঁজে পাওয়া যায়? এখানে কত আলো! সেজন্যেই এখানে খুঁজছি!

এই গল্পের মতো আমরাও সুখ খুঁজি কোথায়? অধিকাংশই সুখ খুঁজি বাইরে, আলো বা চাকচিক্যের মধ্যে, অন্যের মিষ্টি কথায় আর মিথ্যা আশ্বাসে। সুখ যেখানে রয়েছে সেখানে খুঁজি না। ফলে সুখী হতে পারি না। আসলে সুখ পেতে হলে যাত্রাটা হতে হবে ভেতরের দিকে—অন্তরে।

আপনার সন্তানকে আরেকজন তার নিজের সন্তানের মতো দেখবে এটা খুব দুর্লভ ঘটনা। নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় প্রতারণামূলক কথা আর হয় না। বরং বিয়ের পরদিনই এদের চেহারা বদলে যায়। বাক্যটাও হয় খুব সরল—তোমার আমার মাঝে আর কাউকে সহ্য করতে পারছি না। কত ইনোসেন্ট কথা! কিন্তু এটা সে বিয়ের আগে প্রকাশ করে না।

আগে তো তবুও যৌথ পরিবারে অনেক মানুষ থাকত। সেই ভিড়ে সন্তান বড় হতে পারত। এখন তো যৌথ পরিবার নয়, বরং হাম দো হামারা দো। এর মধ্যে আরেকজনের সন্তানকে মেনে নিতে কষ্ট হয়। আজ পর্যন্ত আমার অনুসন্ধানে দুয়েকটা ক্ষেত্র ছাড়া কোথাও পাই নি যে, সতিনের সন্তানকে নিজের সন্তানের মতো দেখছে। কেস স্টাডির ক্ষেত্রে এটা কোনো পরিসংখ্যানের মধ্যে পড়ে না।

অতএব এই চিন্তা করে কেউ বিয়ে করলে পরে পস্তাবেন। বিয়ের আগে আপনাকে পাওয়ার জন্যে এরকম অনেক আশ্বাস দেবে, কিন্তু আপনাকে সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে পারতে হবে। প্রয়োজনে প্রবীণদের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই ভুল যিনি করেছেন তাকে ভুলের মাশুল সারাজীবনই দিয়ে যেতে হবে। কারণ আপনি প্রজ্ঞাহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। এর ভোগান্তিও আপনার।

প্রশ্ন : আপনি ২৯-৩০ বছর বয়সের আগেই বিয়ের পরামর্শ দিয়েছেন। চারিত্রিক শুদ্ধতার জন্যে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা আমিও বোধ করি। কিন্তু আমার চাকরি হয় নি। পারিবারিকভাবেও এতটা সামর্থ্যবান নই। এ অবস্থায় কীভাবে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে পারি?

উত্তর : এই পরামর্শ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ব্যাপারে বেশি প্রযোজ্য। ছেলেদের জন্যেও বয়সটা ভালো। তবে আগে তো কাজের প্রস্তুতি নিতে হবে, উপার্জন করতে হবে। চাকরি হয় নি তাতে কী, যে-কোনো কাজ করুন। আজকাল যে মাটি কাটে সে-ও দিনে পাঁচশ টাকা উপার্জন করে। অর্থাৎ একজন পুরুষকে তো দায়িত্ব নিতে হবে। কারণ আপনি বিয়ে করবেন স্ত্রীকে তার ভরণপোষণের শর্তে। অবশ্য যদি এরকম কাউকে পান—যে আপনাকে ঘরজামাই রাখবে, তাহলে আলাদা কথা।

প্রশ্ন : কোনো ছেলে বা মেয়ের বিয়ে যদি এমন মানুষের সাথে হয় যার প্রতিনিয়ত মিথ্যে বলার অভ্যাস এবং চক্ষুলজ্জাও নেই, তার কী করা উচিত?

উত্তর : বিয়ে যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে কিছু বলা মুশকিল। কারণ বিয়ের সম্পর্ক আইনী হলেও এর সাথে আবেগ জড়িত। যেখানে আবেগ জড়িত থাকে, সেখানে বাইরের বুদ্ধি পরামর্শ কার্যকর হয় না। এই উত্তর নিজেকেই বের করতে হবে।

প্রশ্ন : আমার এক বান্ধবীর মা দীর্ঘদিন ধরে স্বামী পরিত্যক্তা। কিন্তু এখনো তিনি ভাবেন যে, যাদের স্বামী নেই, তারা সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীন। ক্রমে আমার বান্ধবীটির চিন্তাভাবনাও সে-রকম হয়ে যেতে শুরু করে। উচ্চশিক্ষার পরে তার যখন বিয়ে হয়ে যাবে, তখন মা কীভাবে থাকবে—ক্লাস এইট/নাইন থেকেই এ ধরনের চিন্তা তাকে পেয়ে বসে। কিছুদিন আগে তার বাবার খোঁজ পাওয়া গেছে। জানা গেছে, সেই লোকটি আরো দু-একজনের সাথে লিভ-টুগেদার করার পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। এ অবস্থাতেও আমার বান্ধবীর মা তার সঙ্গে আবার বিয়েতে রাজি হয়েছে। শুধু জানিয়ে রেখেছে, একই ঘরে একসঙ্গে থাকবে না। অর্থাৎ এতকিছুর পরও ওই লম্পট লোকটির সাথে নামকাওয়াস্তে বিয়ের চুক্তিতে তার আপত্তি নেই। আমার বান্ধবী তার মাকে বলেছে, দরকার নেই; তোমাকে আমি একটা ভালো জায়গায় পরে বিয়ে দেবো। তার চিন্তাভাবনাও বিয়েকেন্দ্রিক। এ অবিদ্যা থেকে তাদের কীভাবে মুক্ত করতে পারি?

উত্তর : আমাদের হাজার বছরের অবিদ্যাই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমরা যখন নিজেরা অবিদ্যা থেকে মুক্ত হবো, যখন বিয়ের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি হবে যে, বিয়ে দাসীগিরি বা বাঁদীগিরি নয়; বরং বিয়ে হচ্ছে একটি অত্যন্ত

সম্মানজনক সহাবস্থান, যেখানে সমমর্মিতা রয়েছে, সহানুভূতি রয়েছে, শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে এবং যেখানে আমার নিজের পরিচয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তখনই এসব অবিদ্যা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে।

সাধারণ মানুষ আসলে প্রচলিত গণ্ডির বাইরে কখনো বেরোতে চায় না। কারণ সে ভয় পায়। সে মনে করে, বৃত্তের মধ্যেই তার নিরাপত্তা। বৃত্তের বাইরে গেলেই অনিশ্চয়তা। যেমন, ফার্মের মুরগি খাঁচার বাইরে যেতে চায় না। খাঁচার ভেতরটাকে সে নিশ্চিত, নিরাপদ মনে করে। যেহেতু এখানে অন্তত খাওয়াদাওয়াটা সে ঠিকমতো পাচ্ছে।

একজন মানুষ এ অবস্থা থেকে তখনই বেরিয়ে আসতে পারবে, যখন তার ভেতরে আস্থা সৃষ্টি হবে। আর সেই আস্থা সৃষ্টির কাজটিই আমরা করছি। এখন আপনার বান্ধবী বা তার মাকে এই অবিদ্যা থেকে মুক্ত করাটা আপনার জন্যে কিছুটা কঠিন। কারণ তারা এই চিন্তাভাবনা নিয়েই বেড়ে উঠেছে।

আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কটিই এমন, যেখানে সাধারণত যুক্তিবুদ্ধির চেয়েও আবেগ বেশি থাকে। দেখা যায়, অনেক কিছু হওয়ার পরও একজন স্ত্রী সেই স্বামীর সংসারই করতে চাইছে স্রেফ আবেগের কারণে। কাজেই এ বিষয়গুলো তাদের ব্যক্তিগত এবং এখানে তৃতীয় পক্ষের কেউ সম্পৃক্ত না হওয়াই ভালো।

প্রশ্ন : আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করছি আজ একবছর। মা-বাবা আমার বিয়ের জন্যে পাত্র খুঁজছেন। কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদ সবার সাথে এক বাড়িতে থাকার চাইতে স্বামীকে নিয়ে আলাদা বাড়িতে থাকাটাই আমার পছন্দ। এটা কি অবিদ্যা?

উত্তর : হাঁ, অবিদ্যা। এবং এটাই 'আধুনিক' বিয়ের প্রথম অবিদ্যা। বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ এবং একজন নারী যে পরিবার গঠন করেন, শুধু স্বামী-স্ত্রী মিলে কখনো সে পরিবার পরিপূর্ণ হয় না, যদি না মা-বাবা ভাইবোন শ্বশুর-শাশুড়ি শ্যালক-শ্যালিকা অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রীর উৎস-পরিবারের স্বজনদের সে পরিবারের সাথে একাত্ম করা যায়।

আর তাই 'হাম দো-হামারা দো' স্লোগানের একক পরিবারের যে ধারণা এখন প্রচলিত, তা আসলে কখনোই সুখী পরিবার নয়। কারণ একের সাথে এক যোগ করলে 'দুই' হয়, কিন্তু একের পাশে এক রাখলে হয় 'এগারো'। ইচ্ছা করলেই মা-বাবাকে আলাদা করা যায় না। মায়ের গর্ভে জন্ম নেয়া, বাবার কষ্টার্জিত অর্থে লালিতপালিত হওয়া, ভাইবোনদের মমতায় বেড়ে

ওঠা—এ সত্যগুলোকে অস্বীকার করা যায় না। এ সম্পর্কও ছিন্ন করা যায় না। এটা একজন পুরুষের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, নারীর ক্ষেত্রেও সত্য।

একজন সফল গৃহকর্তা বা কর্ত্রী তিনিই, যিনি এরকম একটি পরিপূর্ণ পরিবারের প্রতিটি বিষয়কে ব্যালেন্স করে চলেন দক্ষ জাদুকরের কুশলতায়। তাই আপনি বিয়ের পর আপনার স্বামীকে নিয়ে আলাদা হতে পারেন, কিন্তু সুখী হতে পারবেন না। কারণ দুজন মিলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে কখনো সুখী হওয়া যায় না।

আমরা যেহেতু সামাজিক, তাই পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সহযোগিতা ছাড়া আপনি বাঁচতে পারবেন না, এগোতে পারবেন না। আর এ সম্পর্কগুলোই এমন যে, সচেতনভাবে ছিন্ন করলেও ভেতরে ভেতরে তা থেকেই যায় এবং অনুশোচনাবোধের যন্ত্রণা কুরে কুরে খায়।

প্রশ্ন : আমার জীবনে কিছু নেতিবাচক ঘটনার কারণে আমার মনে হয় আমি কখনোই আমার মনের মতো জীবনসঙ্গী খুঁজে পাব না। এটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সামনে পরীক্ষা। এখন আমার দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : স্রষ্টা মানুষকে এত শক্তি এত মেধা দিয়ে তৈরি করেছেন, এরপরও কেন নেতিবাচক ভাবনা দিয়ে নিজের শক্তিকে ক্ষয় করবেন? যখনই মনে হবে আমি ভালো জীবনসঙ্গী পাব না, সাথে সাথে তওবা তওবা বলবেন। কারণ মানুষকে নেতিবাচক করে তার মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করা শয়তানের কাজ। অতএব ভালো ভাবুন, ভালো জীবনসঙ্গী পাবেন। ভাবতে হবে যে, সময়মতো আমি ভালো জীবনসঙ্গী পাব।

তবে সামনে আপনার পরীক্ষা। এখন জীবনসঙ্গীর চিন্তা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আজকাল মেয়ে হয়েও রক্ষা নেই। আগে তো মেয়েরা বেঁচে যেত যে, বিয়ে হয়ে গেলে অধিকাংশই আর পড়ালেখা করত না। এখন সেই যুগ নেই। এখন ছেলেরাও কর্মজীবী মেয়ে বিয়ে করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। অতএব পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে এবং পরীক্ষার চিন্তা সামনে রেখে পড়ালেখায় মন দিন।

প্রশ্ন : আমার স্বামীর ভালো কোনো চাকরি হয় নি। আমার বাবাও ঋণে জর্জরিত। তাই আমার বিয়ে কাবিন করে রাখলেও টাকার জন্যে আমাকে তুলে দিতে পারেন নি। এটা নিয়ে আমার স্বামীর সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এখনও ভুল বোঝাবুঝি সমাধান হয় নি। দোয়া করবেন।

উত্তর : বিয়ের পর তুলে নেয়াটা তো সামাজিকতা। আপনার বাবা ঋণগ্রস্ত এবং স্বামীর ভালো চাকরি হয় নি—এ অবস্থায় সামাজিকতার দরকারটা কী? এ নিয়ে খামোখা কেন সম্পর্কের অবনতি ঘটবে? বিয়ে তো আনন্দের ব্যাপার। বিয়ের খরচ নিয়ে যদি আরো পেরেশানির মধ্যে পড়তে হয়, তাহলে কি আনন্দ থাকে?

শুধু আনুষ্ঠানিকতার দোহাই দিয়ে বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকা উচিত নয়। এতে ঝামেলা বাড়ে। অনুষ্ঠান না করে বউ ঘরে তোলা যাবে না, এমন কোনো নিয়ম তো নেই। আপনার স্বামী আপনাকে পারিবারিকভাবে তার বাসায় নিয়ে গেলেই হলো। এতে আইনগতভাবে বাধা দেয়ার কিছু নেই। আনুষ্ঠানিকতার নামে খরচ যত কম করেন তত ভালো। মনে রাখবেন, বিয়েতে এখন ধনীরা যে বিপুল অপচয় করে এটা তাদের বিনিয়োগ। কিন্তু গরিবের জন্যে এটা হচ্ছে মরণফাঁদ। এই ফুটানি করতে গিয়ে নিজের এবং পরিবারের সর্বনাশ করবেন না।

প্রশ্ন : মায়ের সঙ্গে আমার মিল হয় না বলে সবাই আমাকে বিয়ে দিয়ে দিতে চায়। আমি কি এই মুহূর্তে বিয়ে করব? আমার বয়স ২০। লেখাপড়া করছি।

উত্তর : ২০ বছর বয়সেও যদি মায়ের সাথে মিল না হয়, তাহলে কার সাথে মিল হবে? যে মায়ের সাথে মিলতে পারে না, সমঝোতা করতে পারে না, পৃথিবীর কারো সাথেই সে সমঝোতা করতে পারবে না।

শ্বশুরবাড়ি এখন যতটা মধুর হাড়ি মনে হচ্ছে, বাস্তবে তা না-ও হতে পারে। হিন্দি সিনেমার সেই 'রাজা বান কে আনা রে, মুঝে লেকে জানা রে, ছম ছমাছম ছম'-এর মতো শ্বশুরবাড়িতে রানির মতো থাকবে—এরকম ভ্রান্ত ধারণা এসেছে মিডিয়া থেকে। ফলে কোনো কোনো মেয়ে মনে করে, বিয়ের পর সমস্ত দুঃখকষ্ট শেষ হয়ে যাবে।

আর এখন আপনার পরিচয় গড়ার সময়। পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়ার সময়। মায়ের সাথে ঝগড়া করার সময় নয়। মায়ের সাথে মিল হচ্ছে না বলে যদি মা-বাবা বিয়ে দিয়ে দেন, সেটা হবে ভীষণ লজ্জার ব্যাপার। কারণ সবচেয়ে আপনজনকে আপনি বোঝাতে পারেন নি।

প্রশ্ন : প্রত্যেক প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কি আমার জীবনসঙ্গী আগে থেকেই নির্ধারিত? যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে আমি খারাপ কাউকে পেলে আমার দোষ কোথায়?

উত্তর : আপনি খারাপ কাউকে পেলে যন্ত্রণা যা ভোগ করার তা তো আপনিই করবেন। আবার উল্টোটা ঘটলেও আপনিই সুখী হবেন। এখানে আপনাকে তো কেউ দোষ দিচ্ছে না। আর প্রত্যেক প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে মানে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে নির্ধারণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা নয়। এখানে জোড়া বোঝানো হয়েছে ব্যাপক অর্থে যে, বিপরীত এবং পরিপূরকরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই নারী-পুরুষ অর্থে জোড়া শব্দটি এসেছে। জোড়া মানে স্বামী-স্ত্রী নয়।

প্রশ্ন : বিয়ের প্রয়োজন আছে। তা না হলে কিছু ছেলে বা মেয়ে বলবে বিড়ালের তো পুকুর নেই, গরুও নেই। কিন্তু মাছও খায়, দুধও খায়।

উত্তর : অবশ্যই বিয়ের প্রয়োজন আছে—যিনি বিয়ে করবেন তিনি যদি অনুভব করেন। আর কারো যদি শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতা থাকে, তার জন্যে বিয়ের প্রয়োজন নেই। কেউ যদি বিড়ালের মতো জীবনযাপন করে যে, গরু নেই, পুকুরও নেই; তবুও দুধ খাচ্ছে, মাছও খাচ্ছে; তাহলে তাকে ভ্রষ্টাচারী ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।

প্রশ্ন : বিয়েটা কি ভাগ্য, নাকি মানুষ নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? এ ব্যাপারে কোয়ান্টাম কী মনে করে?

উত্তর : আসলে বিয়ের ক্ষেত্রে ভাগ্যের ওপরে নির্ভর করবেন না, কর্মের ওপরে নির্ভর করবেন। যে-কোনো ব্যাপারে আপনার প্রস্তুতি আর প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করবেন। যেমন একটা ভালো চাকরি বা ভালো রেজাল্টের জন্যে চেষ্টা করেন, পরিশ্রম করেন; তেমনি বিয়ের জন্যেও আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে।

সবকিছুর জন্যে পরিকল্পনা করবেন আর বিয়েটাকে বলবেন ভাগ্য, তাহলে কীভাবে হবে? সমস্যা হলো, বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কোনো পরিকল্পনা থাকে না, শুধু কল্পনা থাকে। তারপর কল্পনার সাথে গরমিল হলে ভাগ্যকে দোষারোপ করি।

তাই বিয়ের ব্যাপারে পরিকল্পনা করতে হবে যে, আমি কেমন জীবনসঙ্গী চাই। সেইসাথে নিজের যোগ্যতাটাও দেখতে হবে। বর্তমানে বিয়ের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষের চিন্তাভাবনাই মোটামুটি বাস্তবতাবর্জিত। আর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো, টিভি সিরিয়াল দেখতে দেখতে আমাদের চিন্তাভাবনাও

বায়বীয় হয়ে যাচ্ছে। আমরা অনেক সময় মনে করি, জীবনটাও টিভি সিরিয়াল। কিন্তু জীবন তো টিভি সিরিয়াল নয়। সফল জীবনের জন্যে লক্ষ্য, পরিকল্পনা এবং সে অনুযায়ী কাজ—এই তিনটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাস্তবতা হলো, বিয়ে একটা প্রয়োজন। বিয়ে আর প্রেম এক নয়। বিয়ে এবং প্রেমকে একাকার করে ফেলি বলেই আমরা ভুল করি। প্রেমিকা আর স্ত্রী এক নয়, তেমনি প্রেমিক আর স্বামীও এক নয়। প্রেমিক-প্রেমিকার কোনো দায়িত্ব নেই—শুধু রেস্টুরেন্টে ঘোরাঘুরি ছাড়া। কিন্তু বিয়ের পরে দায়িত্ব আছে। সকাল হলে নাশতার ব্যবস্থা কী হবে, এই দিয়ে দিন শুরু। স্বামী হলে তাকে নাশতার উপকরণ আনতে হবে। স্ত্রী হলে তা তৈরি করে পরিবেশন করতে হবে। এরপর আরো আরো দায়িত্ব তো আছেই।

এই বিষয়গুলো যখন বুঝবেন, অনুধাবন করবেন তখন দেখবেন, আর কোনো সমস্যা নেই। তখন আপনি বিয়েটাকে আর ভাগ্য মনে করবেন না। বিয়ের ব্যাপারে আপনার যথাযথ প্রস্তুতি থাকবে এবং আপনি সেভাবেই কাজ করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি একটি গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত আছি। চাকরিতে যোগদান করার পর থেকে আমার চেয়ারম্যান মাঝে মাঝেই আমাকে ডেকে বলেন এই কোম্পানি ছেড়ে না যেতে—তিনি আমাকে ইন্ডাস্ট্রি করে দেবেন। একদিন হঠাৎ করে আমাকে ডেকে বললেন, আমার বিয়ের দায়িত্ব তিনি নেবেন, এতে আমার কোনো সমস্যা আছে কিনা? কোনো সমস্যা নেই বলে জানাই আমি। তারপর বলেন, তিনি আমাদের বাসায় যাবেন, মা-বাবার সাথে কথা বলবেন। কয়েকদিন পর আবার বলেন, তিনি আমাকে গার্মেন্টস করে দেবেন। আমি যেন তার দুই ছেলেকে নিয়ে ব্যবসা করি—কথাটি তিনি বার বার বলেন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, তিনি আমাকে চেনেন না, জানেন না, আমার জন্যে এত ভালবাসা কেন? গুরুজী, ব্যাপারটি নিয়ে আমি খুবই সন্দিহান।

উত্তর : আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং ভালো-মন্দ বোঝার বয়স আপনার হয়েছে। আপনি যে এখন পর্যন্ত টোপ গিলে ফেলেন নি তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, বুদ্ধিশুদ্ধি আপনার আছে। মনে রাখবেন, বিয়ের দায়িত্ব সবসময় নিজে নেবেন। কারণ সংসার করবেন আপনি। তাই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আপনি মাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরিতে ঢুকেছেন, আর চেয়ারম্যান সাহেব বিয়ের দায়িত্ব নিচ্ছেন, তার মানেটা কী? আপনাকে তিনি কী কারণে

গার্মেন্টস বানিয়ে দেবেন? যদি পাঁচ/ দশ বছর কাজ করতেন, তারপর আপনার কাজে তিনি অনেক সন্তুষ্ট হতেন, তাহলেও তো একটা কথা ছিল। অতএব খুব সতর্ক থাকবেন। তবুও ভালো যে, আপনি কিছু একটা সন্দেহ করছেন এবং সমাধান খুঁজছেন।

এ ধরনের প্রস্তাব কিন্তু ছেলে/ মেয়ে যে-কারো ক্ষেত্রেই আসতে পারে। যে প্রস্তাবই আসুক, আগে ভালো করে খোঁজখবর নেবেন, বিবেচনা করবেন। আর বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আপনার, এটা ঠিক। কিন্তু হতে হবে পরিবারের সম্মতিতে। অবশ্যই পরিবারকে বোঝাতে হবে—কেন আপনি হাঁ বলছেন। পরিবারকে রাজি করিয়ে বিয়ে করবেন।

আবার পরিবার কাউকে পছন্দ করল কিন্তু আপনার যদি পছন্দ না হয়, তাহলে সরাসরি বলবেন, আমার মন টানছে না। কারণ বিয়ের পরে আনন্দ যা সেটাও আপনার, কষ্ট যা সেটাও আপনার। কেউ এটা শেয়ার করতে আসবে না। পারবেও না। এ-ক্ষেত্রে খেয়াল করবেন—যার সাথে আপনার বিয়ের কথা হচ্ছে, তাকে দেখে আপনার মন টানছে কিনা। ভেতর থেকে সাড়া পাচ্ছেন কিনা। আর পছন্দ হলে তো শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী গত ১৯ মাস পূর্বে পরলোকগমন করেছেন। বর্তমানে আমি একাকী জীবনযাপন করছি। ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক আবার বিয়ে করতে চাই। এটা এই ষাটোর্ধ্ব বয়সে ঠিক হবে কিনা?

উত্তর : আপনি যেহেতু প্রয়োজন অনুভব করছেন, এর মধ্যে দোষের কিছু নেই; বরং পরকীয়া আর ব্যভিচারের চেয়ে বিয়ে করাটা অত্যন্ত সম্মানজনক। এখানে পাছে লোকে কিছু বলার ভয় কেন পাবেন? এ-ক্ষেত্রে আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যাকে পছন্দ হবে, আগে খোঁজ নেবেন—তিনি সিঙ্গেল (অবিবাহিত/ তালাকপ্রাপ্ত/ বিধবা) কিনা। দোয়া করি, একজন সমব্যথী মানুষকে যেন পেয়ে যান, আপনার নিঃসঙ্গতা যেন দূর হয়।

প্রশ্ন : আমি অবিবাহিত। আমি একজন চরিত্রবান ভালো মেয়ে বিয়ে করতে চাই। হোক সে বিবাহিত, থাকুক তার আগের সংসারের সন্তান।

উত্তর : আগে দেখবেন আপনি চরিত্রবান কিনা। যদি আপনি চরিত্রবান হয়ে থাকেন, তাহলে আল্লাহ যেন চরিত্রবান পাত্রী জুটিয়ে দেন সেজন্যে দোয়া করবেন। আর কারো আগের সংসারের সন্তান থাকলে খুব ভালোমতো চিন্তা

করে বিয়ে করবেন—আসলেই আপনি সেই সন্তানকে মেনে নিতে পারবেন কিনা। এটা আবেগের বশে শুধু বলে ফেললেই হয় না। বিয়ের পর সেই সন্তানকে নিজের সন্তানের মতো করে লালন করতে হবে।

প্রশ্ন : মাওলানা সাহেব শুধু কালেমা পড়ে বিয়ে পড়াবেন। সাক্ষী থাকবে, তবে লিখিত কাবিন অর্থাৎ রেজিস্ট্রি হবে না এবং দেনমোহর নামমাত্র, মৌখিক হবে, এই বিয়ে কি ঠিক আছে?

উত্তর : আমাদের দেশের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে রেজিস্ট্রি ছাড়া কোনো বিয়েই বৈধ নয়। আপনি যখন যে দেশে থাকছেন, সে দেশের আইন অনুসরণ করা উচিত। আর নামমাত্র দেনমোহর একটা ফাঁকিবাজি চিন্তা।

প্রশ্ন : আমার ১৮ বছর এখনো হয় নি। আমি আমার লক্ষ্য স্থির করেছি। কিন্তু মা সারাক্ষণ বিয়ে বিয়ে করে। এতে আমার পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটে।

উত্তর : আমরা দোয়া করি, যেন আপনার মা সারাক্ষণ বিয়ে বিয়ে না করে। কারণ একজন নারীর পরিচয় সৃষ্টির জন্যে জ্ঞানার্জন করতেই হবে। এটা ফরজ। অতএব পড়াশোনার একটা পর্যায়ে গিয়ে, অন্তত গ্রাজুয়েশন লেভেলে গিয়ে বিয়ে করা উচিত।

প্রশ্ন : আমরা ঢাকায় থাকি। ঢাকার বাইরের এক ছেলেকে আমার মেয়ে পছন্দ করে। ছেলে ব্যাংকার। সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি না করে দেই এই বলে যে, এত দূরে মেয়েকে বিয়ে দেবো না। এরপর থেকে আমার কেমন যেন অস্থির লাগতে থাকে। মেয়ের বিয়ে হলে কীভাবে থাকব? মেয়ে এত বছরের সম্পর্ক ভুলতে পারবে কিনা? অন্য কোথাও মেয়েকে বিয়ে দিলে কোনো সমস্যা হবে কিনা? আমি এখন কী করব?

উত্তর : আসলে মায়েরা আবেগপ্রবণ হন। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কীসে তার কল্যাণ হচ্ছে তা-ও গুরুত্বপূর্ণ। সেটিও আপনাকে ভাবতে হবে। এমনও হতে পারে, মেয়েকে কাছে রাখার জন্যে পাশের বাড়ির ছেলের সাথে তার বিয়ে দিলেন। সে-ক্ষেত্রে মেয়ে যে সুখী হবেই এমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়?

আর কাছে থাকলেই কাছে থাকা হয় না। তেমনি দূরে থাকলেই দূরে থাকা হয় না। দূরে থাকলেও মানুষ অনেক কাছে থাকতে পারে। আবার কাছে

থাকলেও মানুষ অনেক দূরে থাকতে পারে। তাই মেয়ের যাতে মঙ্গল হয় এবং যদি সৎপাত্র পাওয়া যায়, তবে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিন। কারণ কারো না কারো সাথে তো বিয়ে দিতেই হবে। মেয়েকে তো আর আপনি সারাজীবন আপনার কাছে রেখে দিতে পারবেন না। যদি রেখে দেন পরে নিজেই আফসোস করবেন। অতএব অন্যান্য বিষয়গুলো ঠিকঠাক থাকলে শুধু দূরত্বের কারণে মেয়ে বিয়ে দিতে কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়।

প্রশ্ন : স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান ৩০-এর ওপরে। সে-ক্ষেত্রে স্বামী যদি সত্তরোর্ধ্ব বয়সে মারা যান, তবে স্ত্রী কি তার একাকিত্ব বা অবলম্বনের জন্যে আবার বিয়ে করতে পারবে?

উত্তর : এখানে আইনগত বা ধর্মীয় কোনো বাধা নেই। তবে বিয়েটা যেহেতু শুধু ব্যক্তিগত নয়, পারিবারিক একটি ব্যাপার—তাই কোনো মহিলার যদি সন্তান থাকে, সন্তানদের ইতিবাচক সম্মতি নিয়ে বিয়ে করা উচিত। সন্তানেরা যদি বিয়েতে সম্মতি না দেয়, তাহলে চরম অশান্তি সৃষ্টি হবে। কারণ একজন মহিলা সন্তানদের ছাড়তে পারবেন না, আবার স্বামীকেও ছাড়তে পারবেন না। বাঙালি মায়েদের পক্ষে বিষয়টি খুব চ্যালেঞ্জিং।

সন্তানেরা মাকে কারো সাথে সাধারণত শেয়ার করতে চায় না। আবার আপনি আপনার সন্তানকে ছাড়তেও পারবেন না। কিন্তু এটাও সত্য যে, সন্তান বড় হলে বিয়ে করবে, নিজেকে নিয়ে ও তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তাই আপনার একাকিত্ব সন্তান ঘোচাতে পারবে না।

আপনি যদি মনে করেন, সন্তানের দূরত্ব আপনাকে ব্যথিত করবে না—আর সন্তান যদি সম্মতি দেয়, আনন্দিতচিত্তে অনুভব করে যে, তার মায়েরও একটি জীবন আছে, তার জীবনের যে-কোনো সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেন; তখন আপনি সহজে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ধর্মীয় এবং আইনগতভাবে কোনো বাধা নেই। আসলে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সমমর্মিতা যত গড়ে উঠবে তত পরিবারগুলো সুখের হবে।

আর 'অবলম্বন' একটি ভ্রান্ত চাওয়া। আল্লাহ ছাড়া মানুষের আর কোনো অবলম্বন নেই, সে নারী হোন অথবা পুরুষ। স্বামী আপনার অবলম্বন না-ও হতে পারেন। তিনি আপনার কষ্টের কারণও হতে পারেন। অতএব কেউ কারো অবলম্বন হয় না। অবলম্বন একমাত্র আল্লাহ। তাঁর ওপর ভরসা রাখুন এবং সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন।

পাত্র/ পাত্রী নির্বাচনের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন : বিয়ের জন্যে কনে বা বর পছন্দের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : বিয়ের ব্যাপারে অন্যতম ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি হলো অভিভাবকদের নিজেদের পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া। অনেক সময় তাদের পছন্দটা তারা ছেলেমেয়ের ওপর চাপিয়ে দেন। কিন্তু এর পরিণতি নিয়ে ভাবেন না। এটা ভাবেন না যে, জোর করে চাপানো এই সিদ্ধান্তের ফলে পরবর্তীকালে বনিবনা না হলে বিচ্ছেদও ঘটতে পারে।

বর/ কনে পছন্দের ক্ষেত্রে আধুনিক অবিদ্যা হচ্ছে ডেটিং। বিয়ের আগে ছেলেমেয়ে একসাথে ঘোরাঘুরি করলে বোঝাপড়া ভালো হবে—অনেকে এরকমটাই ভাবে। কিন্তু এর ফলাফল কী? এটা আমরা ইউরোপ-আমেরিকার ডেটিং কালচারের পরিণতিতে দেখতে পাই। আমেরিকাতে গত ৫০ বছরের ডেটিংয়ের ফল হলো, ৯০-এর দশকে ৭০% ডিভোর্স।

আবার অনেক অভিভাবক তার বখাটে ছেলের সাথে একটি ভালো মেয়েকে বিয়ে দিতে চান এ আশায় যে, এতে ছেলেটা ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণভাবে ছেলে তো ভালো হয়ই না, ওই মেয়ের জীবনটা সে নষ্ট করে ফেলে। এ ধরনের অভিভাবকেরা অপরাধী হিসেবে গণ্য।

তাছাড়া পাত্র যদি প্রচুর উপার্জন করে, তা অবৈধভাবে হলেও, অনেক সময় সেই পাত্রই অত্যন্ত সমাদৃত হয়। একইভাবে বিদেশি পাত্র শুনলেই পাত্রীর মা-বাবা বর্তে যান। দ্রুত বিয়ে দেয়ার জন্যে প্রতিযোগিতায় নামেন। আবার মেয়ে যদি সুন্দরী হয়, পাত্রপক্ষ আর কোনোকিছু দেখার চিন্তা করেন না। এ সবকিছু হলো ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ।

বিয়ের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখতে হবে, বিয়ে দিলে বা বিয়ে করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কারণ সুখী বিয়ে মানে দুটি মানুষ ও দুটি পরিবারের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সুসম্পর্কময় সহাবস্থান। অনেক ধনী বর বা ধনী শ্বশুরপক্ষ হলেই বিয়ে সুখের হয় না। এর জন্যে দরকার দুটি পরিবার এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চেতনার মিল।

প্রশ্ন : অ্যারেঞ্জড বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রী হিসেবে একটি মেয়ে কীভাবে বুঝবে যে, পাত্র সচ্চরিত্র এবং ভালো কিনা। অনেক সময় পাত্রকে সামনাসামনি খুব ভদ্র মনে হলেও পরে দেখা যায়, সে আসলে বদরাগী। তাহলে পাত্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানব কী করে?

উত্তর : এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক সময় ছেলের ডিগ্রি, চেহারা, বাহ্যিক আচরণ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু এটা মোটেই ঠিক নয়। সময় নিয়ে পাত্রের খোঁজখবর নেয়া উচিত। আর এটা তেমন কঠিন নয়। কারণ খোঁজ নিতে চাইলে শুধু পাত্র কেন, পাত্রের পরিবার সম্পর্কেও জানা সম্ভব। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য পাত্রীর চাইতে তার মা-বাবার দায়িত্বই বেশি।

আপনি যদি চান, যাকে আপনি বিয়ে করবেন তার ব্যাপারে ভালো করে জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নেবেন, আপনি অবশ্যই তা পারবেন। সমস্যা হয়, যখন মেয়েটি বিয়ের ব্যাপারে আবেগকে বেশি গুরুত্ব দেয়। সে মনে করে, কোনোরকমে বিয়েটা হয়ে গেলেই তার সব দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। একটি মেয়ের ঘটনা—

'মাস্টার্স পরীক্ষার পর বাবাহীন সংসারে বড় মেয়ে হওয়ার কারণে আত্মীয়দের চোখে পড়ে গেলাম খুব তাড়াতাড়ি। সারাক্ষণ খোঁটা শুনতে হতো যে, বয়স হয়ে যাচ্ছে, বিয়ে কেন হচ্ছে না। অথচ তারা কেউ এগিয়েও আসছে না। শেষমেশ আমাদের এক ভাড়াটিয়া একটা প্রস্তাব নিয়ে এলো। ছেলে আফগানিস্তানে চাকরি করে, অনেক বেতন পায়, বাড়িঘর ভালো, নামাজি ইত্যাদি। আম্মাকে বোঝাল, লাখে একটা এরকম ছেলে পাওয়া যাবে। হাতছাড়া করা ঠিক হবে না।

সরল বিশ্বাসে আমাদের পরিবার রাজি হয়ে গেল। আর বাবা না থাকায় আম্মা বা ছোট ছোট ভাইদের পক্ষে খোঁজখবর নেয়াও সম্ভব ছিল না। বিয়ের পর দেখলাম প্রত্যেকটা তথ্যই ভুল। তার ওপর আমার চেয়ে ১০ বছরের বড়। একবছর পর ডিভোর্স হয়ে গেল।

তারও দুই বছর পর আবার বিয়ে হলো আমার খালার ননদের ছেলের সঙ্গে। আমাকে বলা হলো, ছেলে নাকি রাজপুত্রের মতো দেখতে, গ্রামে দোতলা বাড়ি আছে, তিন মাসের মধ্যে আমাকে বিদেশে নিয়ে যাবে। বিয়ে হয়েছে আজ দুই বছর। বিদেশে নেয়া তো দূরের কথা, আমার ভরণপোষণ পর্যন্ত ঠিকমতো দেয় না। আমাকে চাকরি করতে দিতেও তার আপত্তি।'

এই মেয়েটি কিন্তু বার বার একই ভুল করেছে। তার সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াটাই ভুল। সে এবং তার পরিবার পাত্রের বাহ্যিক কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা শুনেই আকাশকুসুম কল্পনায় ভাসতে শুরু করেছে। আবেগকে গুরুত্ব দিয়েছে। ভেবেছে, বিয়ে করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। সব অভাব বঞ্চনা আর কষ্টকে পেছনে ফেলে সে বিদেশে যেতে পারবে। বাস্তবতার নিরিখে ভেবে দেখার প্রয়োজন মনে করে নি। অতএব পাত্র/ পাত্রী এবং পরিবারের ব্যাপারে সম্ভাব্য সবরকম খোঁজখবর করেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়াটা খুব জরুরি।

প্রশ্ন : আমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। ছয় মাস আগে তার স্ত্রী মারা গেছে। এর বেশি আমি জানি না। তবে আমি আমার অভিভাবকদের বিস্তারিত খোঁজ নিতে বলেছি এবং 'আপত্তি নেই' জানিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আমি একধরনের হীনম্মন্যতায়ও ভুগছি। আমি কি ঠিক করছি?

উত্তর : স্ত্রী বা স্বামী মারা যেতেই পারেন। এতে সেই ভদ্রলোককে বা ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করা যাবে না বা বিয়ে করলে হীনম্মন্যতায় ভুগতে হবে, এটি একটি অবিদ্যা। তবে তার সম্পর্কে যথাযথ খোঁজখবর নিতে হবে। কারণ অনেক সময় অনেক কিছু গোপন করা হয়। যেমন, ওই ভদ্রলোকের হয়তো সন্তান থাকতে পারে। সন্তান থাকাটা বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা নয়। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে যে, সন্তান আছে এবং আপনি তা জেনেই তার কাছে যাচ্ছেন। আর জেনেশুনে বিয়ের পর সেই সন্তানের মায়ের দায়িত্বও আপনাকে পালন করতে হবে।

আবার দেখা যায়, বিয়ের আগে পাত্রের আগের সন্তানদের কথা মহিলা জেনেছেন, তাদের লালনপালন করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিয়ের পরে সেই বাচ্চাদের আর দেখভাল করছেন না, অবহেলা-অত্যাচার করছেন, নতুন সংসারে তাদেরকে উৎপাত বলে ভাবছেন। এটি অপরাধ। কারণ এই শিশুদের মতো অসহায় তো আর কেউ নেই।

বাস্তবতা হচ্ছে, বাবার চেয়ে মা মারা গেলেই সন্তানেরা এতিম হয়। অথচ যে মহিলা এরকম এতিম শিশু পেয়েও তার মাথায় হাত রাখতে পারেন না, তিনি খুবই দুর্ভাগা। কারণ এতিমের মাথার ওপর যে হাত রাখে, তার মাথার ওপর আল্লাহর হাত থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত তার সাথে থাকে।

আবার পুরুষদের ক্ষেত্রেও এমনটি হতে পারে—বিধবা মহিলার ছোট সন্তান আছে জেনেই কোনো পুরুষ তাকে বিয়ে করল। কিন্তু এরপর এই সন্তানকে সে সাথে রাখতে চাচ্ছে না বা তার ওপর অত্যাচার করছে। সেই পুরুষটিও অপরাধী এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে সে বাঁচতে পারবে না।

মনে রাখতে হবে যে, বিয়ে বা পরিবার মানে দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বিয়ে করবেন না। আপনাকে কেউ বলে নি সন্তানসহ পুরুষ বিয়ে করতে বা সন্তানসহ মহিলা বিয়ে করতে। কিন্তু বিয়ে যদি করেন, তাহলে সব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রশ্ন : যদি কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সময় বলে—সে মাঝে মাঝে মদ্যপান করে, তাকে কোন দৃষ্টিতে দেখা উচিত? যদিও অন্য দিক থেকে ঠিক আছে।

উত্তর : একজন মদ্যপ কখনোই অন্য সবদিক থেকে ঠিক থাকতে পারে না। যে মদ খায় তার অন্য সব আচার-আচরণেও এর ছাপ পড়ে। আপাতদৃষ্টে তা নজরে না পড়লেও কোনো একসময় তা প্রকাশ পাবেই।

প্রশ্ন : টিভি দেখে প্রভাবিত হই না। তবে একটি সিনেমায় মেয়েদের প্রতি নায়কের শ্রদ্ধাবোধ দেখে খুব ভালো লেগেছিল। চাই জীবনসঙ্গীও যেন এরকম হয়। এটা কি অবিদ্যা?

উত্তর : টিভি দেখে প্রভাবিত হন না বলছেন। তাহলে সিনেমা দেখে কেন প্রভাবিত হচ্ছেন? আসলে আমরা যে প্রভাবিত হই, তা-ও মাঝে মাঝে বুঝি না। মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সিনেমার নায়কের কাছ থেকে কেন শিখতে হবে? মহামানবরাই তো এটি শিখিয়ে গেছেন।

নবীজীর (স) জীবনে আমরা দেখি, মেয়েদের প্রতি কত শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর। তিনি বলেছেন, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। বাবার বা স্বামীর পায়ের নিচে—তা বলেন নি। এর চেয়ে বড় সম্মান আর শ্রদ্ধা কী হতে পারে? সিনেমার নায়ক কি এর চেয়ে বড় সম্মান দেখাতে পেরেছে? আমরা অভিনয় দেখে বর্তে যাই। সিনেমায় তারা যা করে তা-ই ভালো লাগে। সে যে অভিনয় করে পয়সা উপার্জন করছে সে-কথা বুঝি না।

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে অ্যারেঞ্জড বিয়ের ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের দেখাশোনার মাধ্যমে কি পাত্র/ পাত্রীর আত্মিক সৌন্দর্য বা গুণাবলি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব, বিশেষত যেখানে তথ্য গোপন করার আশঙ্কাও রয়েছে?

উত্তর : এজন্যে পরিচিত পরিমণ্ডলে বিয়ে হওয়া উচিত, যেখানে পারস্পরিক জানাশোনা রয়েছে। সেটা অবশ্যই সম-সামাজিক ও সম-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। সাধারণত বিয়েতে ছেলেপক্ষের প্রত্যাশা থাকে মেয়ে ফর্সা, সুন্দরী এবং কমবয়সী হতে হবে এবং মেয়ের বাবার বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংক-ব্যালেন্স থাকতে হবে, যাতে যৌতুক পাওয়া যায়।

আবার মেয়েপক্ষের কাছে ছেলে ভালো বেতনের সরকারি/ বেসরকারি চাকরিজীবী, পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ী অথবা বিদেশে থাকলেই সে ভালো পাত্র হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। সে মদ্যপ, বদমেজাজি বা লম্পট কিনা বা বিদেশে সে কী করে, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনও তারা মনে করেন না। এমনকি বিয়ের পর মেয়ের পড়াশোনা বা ক্যারিয়ারের ক্ষতি হবে কিনা সে-সবও তারা ভাবতে

চান না। ফর্সা এবং সুন্দরের খোঁজে মরিয়া হলে পরিণতি যে কত করুণ হয় তার একটি বাস্তব উদাহরণ—

এক ছেলে এবং তার অভিভাবকরা ফর্সা সুন্দরী পাত্রী খুঁজছে। অনেক পাত্রী দেখা হলো। অবশেষে পাত্রী পছন্দ হলো। পাত্রীর অভিভাবকরা অনেক অর্থব্যয় করে তাকে ঢাকা শহরের সবচেয়ে নামী বিউটিশিয়ানের কাছে নিয়ে গেলেন সাজানোর জন্যে। একবার দেখেই তারা পাত্রী পছন্দ করে ফেলল। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল, দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল। পাত্রীপক্ষ কৌশলে বিয়ের আগে দেখাদেখির আর কোনো সুযোগ দিলেন না।

বিয়ে হয়ে গেল। মেয়ে যখন রাতে তার সাজসজ্জা তুলে ফেলল—সবার তো চক্ষু চড়কগাছ! এ কী দেখছি! নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে, আমরা তো এই মেয়ে দেখি নি। তখন ফাঁস হলো আসল ব্যাপার। মেয়ে তথাকথিত সুন্দরী ছিল না বলেই বিয়ের আগে তারা আর দেখাদেখির সুযোগ দেয় নি। ফর্সা ও সুন্দরের জন্যে মরিয়া পাত্রপক্ষ কনেকে দেখে হতাশ হলো। প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ব্যবধানের করুণ সমাপ্তি হলো বিয়েটি ভেঙে গিয়ে।

এখানে পাত্রপক্ষের ভুল ছিল, তারা বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং চাকচিক্যকে গুরুত্ব দিয়েছে। আর পাত্রীপক্ষ বিয়ের মতো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্কে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে, যা আসলে অপরাধ।

আবার দেখেন ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত গণমাধ্যমের একটি রিপোর্ট—সরকারি কর্মকর্তার একে একে ১৭টি বিয়ে করার অভিযোগ। বিদেশে পড়াশোনা, সরকারি চাকরি, বিমানবালা হিসেবে সুযোগ বা সম্পত্তি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এবং আগের বিয়ের বিষয়গুলো গোপন রেখেই ১৭ জন নারীকে বিয়ে করেছেন এক বন কর্মকর্তা। তার একজন স্ত্রী জানান, ‘২০১৮ সাল থেকে দেখছি তার সাথে বিভিন্ন মেয়ের সম্পর্ক। আমাকে বিয়ে করেছে নিজেকে অবিবাহিত দাবি করে। যৌতুক নিয়েছে; এসব নিয়ে কথা বললে অমানবিক নির্যাতন করত। সংসার বাঁচানোর জন্যে চুপ করে থাকতাম। তখনও জানতাম না সে এতগুলো বিয়ে করেছে!’

রিপোর্টে বলা হয়, এই কর্মকর্তা সর্বশেষ বিয়ে করেন ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। কিন্তু বিয়ের দ্বিতীয় দিন তিনি স্ত্রীর বাবার বাড়ির সম্পত্তির অংশ লিখে দেয়ার দাবি করেন। এতে রাজি না হওয়ায় সেই স্ত্রীকে সরকারি বাসভবন থেকে বের করে দেয়া হয়।

এই যে প্রলোভন দেখিয়ে এবং তথ্য গোপন রেখে এতগুলো বিয়ে, তা নিঃসন্দেহে সেই কর্মকর্তার জঘন্য অপরাধ এবং আইনের গুরুতর লঙ্ঘন। কিন্তু এখানে পাত্রীপক্ষের দায় কোনো অংশেই কম নয়। তারা এই পাত্রের

সরকারি চাকরি, বাসভবন ও গাড়ি দেখে আর কোনো খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন বোধ করে নি। তা না হলে এই বয়সের একজন মানুষ অবিবাহিত দাবি করে নতুন নতুন বিয়ে করছে কীভাবে?

মনে রাখতে হবে, বিয়ে একটি চুক্তি। এটি হতে হবে সহজ সত্যের ওপর। অনেক সময় দেখা যায়, মা-বাবা তার মাদকাসক্ত, মানসিক রোগী বা বখাটে ছেলের দোষ গোপন করে একটি ভালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। চিন্তা করেন, এতে ছেলেটি ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু সিনেমায় এমনটি হলেও বাস্তবে স্ত্রী তার বখাটে স্বামীকে ভালো করতে পারে না। উল্টো স্ত্রীর জীবনই বিষিয়ে ওঠে। আবার কখনো কখনো মেয়ের মা-বাবাও আগের সম্পর্ক, বিয়ে বা কোনো রোগের কথা গোপন রেখে মেয়েকে বিয়ে দেন। আগে বিয়ে হয়েছিল এটা কোনো দোষ নয়। কিন্তু এ জাতীয় তথ্য গোপন করে বিয়ে দিলে তার পরিণতি ভালো হয় না। এটা শুধু অবিদ্যা নয়, অপরাধও।

তাই অযৌক্তিক প্রত্যাশা করবেন না। পরিচিত পরিমণ্ডল এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমতার বিষয়টি মাথায় রাখুন। সঠিকভাবে খোঁজখবর নিন। তাহলে অ্যারেঞ্জড বিয়ে হলেও অনিশ্চয়তাকে এড়াতে পারবেন।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে যদি আমি বুঝি যে, সে মানুষ হিসেবে ভালো এবং আমাকে ভালো রাখবে, তাহলে কি তাকে বিয়ে করা উচিত? নাকি তার পোলিও আছে, দেখতে ভালো লাগে না বলে পরিবারের কথা শুনে বিয়ে না করা উচিত?

উত্তর : আপনি মনে করছেন, সে মানুষ হিসেবে ভালো। কিন্তু আসলেই ভালো কিনা, আপনাকে ভালো রাখবে কিনা, সেটা আপনি কতটুকু নিশ্চিত? হতে পারে আপনার পর্যবেক্ষণ সঠিক। আবার সেটা তো ভুলও হতে পারে।

আর আপনার পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গিকেও অযৌক্তিক বলা যায় না। একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর প্রতি সহমর্মিতা আর তাকে মেয়ের জামাই বানানো— দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে। একইভাবে একজনের প্রতি সমবেদনা আর তাকে জীবনসঙ্গী করার মধ্যেও ব্যবধান আকাশ এবং পাতালের।

একটি বাস্তব ঘটনা—

আমি তখন এস্ট্রলজার। এক মেয়ে একজন মানসিক রোগীকে পছন্দ করে এবং তাকে বিয়ে করবে বলে পরামর্শ চাইল। তাকে বললাম যে, আপনি তার সেবা করতে চাইলে খুব ভালো। কিন্তু মানসিক রোগীর সাথে ঘর করা—এটা খুব কষ্টকর, তিনি মহিলা হোন অথবা পুরুষ।

সে বলল, 'দ্বীপ জ্বেলে যাই' ছবিতে সুচিত্রাকে দেখেন নি—নায়ককে ভালো করে ফেলেছে। অর্থাৎ সেই মানসিক রোগীকে ভালো করার জন্যে সে বিয়ে করবে। তাকে বোঝানো হলো যে, সিনেমার স্ক্রিপ্টে অনেক কিছু হয়। ভালো হয়ে যেতে পারে, ভালো হয়ে বিয়েও হতে পারে; আবার তাকে ভালো করতে গিয়ে নায়িকাও পাগল হয়ে যেতে পারে!

কিন্তু বাস্তব জীবন খুব চ্যালেঞ্জিং। আপনি আপনার নতুন স্বামীকে নিয়ে যেখানেই যাবেন, প্রথম প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন—আচ্ছা, এটা কীভাবে হলো? কেন হলো? আশপাশের লোকজন, প্রতিবেশীরা কেউ-ই এটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করবে না। একদিন, দুদিন, তিন দিন, চার দিন, পাঁচ দিন—এই ব্যাখ্যা দিতে দিতে, আশপাশের সব আত্মীয় এবং পরিচিতজনদের নেতিবাচক কথা শুনতে শুনতে আপনার বিরক্তি চলে আসতে পারে আপনার স্বামীর ওপরে।

অতএব বিয়ের ব্যাপারে বাস্তববাদী হবেন। কারণ এটা বাস্তব জীবন। রোমান্টিক ব্যাপার আলাদা। 'আমি তোমাকে ভালবাসি' বলে হাওয়ায় উড়তে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বিয়েটা শুধু প্রেম নয়। বিয়ে হচ্ছে একটা সমঝোতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া। এটা একটা দেনাপাওনা যে, আমি এই এই দেবো, এই এই পাব। অতএব কী সিদ্ধান্ত নেবেন, এ ব্যাপারে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আমি শুধু এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বললাম, এগুলো বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রশ্ন : একসময় আমি খুবই অহংকারী ছিলাম। অনেক মেয়ে আমার কাছে আসত। কোনো মেয়েকে পাত্তা দিতাম না। বর্তমানে বিয়ে করার জন্যে মেয়ে খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না, সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও। কী করব?

উত্তর : সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। বসন্তকালের কাজ যদি বর্ষাকালে করতে যান, তাহলে তো হবে না। আমরা আপনার জন্যে দোয়া করি। আপনি মনছবি দেখতে থাকুন, যেন আপনি আপনার জন্যে মানানসই ভালো একজনকে পেয়ে যান।

প্রশ্ন : বিয়ের পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি মাথায় রাখব?

উত্তর : এ ব্যাপারে নবীজী (স) খুব সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'কোনো নারীকে চারটি যোগ্যতার জন্যে বিয়ে করা যায়। ধনসম্পত্তি, বংশমর্যাদা, রূপ এবং তার গুণ। এমন নারী খোঁজ করো, যার গুণ আছে। অন্য বিবেচনায় বিয়ে

করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' [আবু হুরায়রা (রা); *মুসলিম, আবু দাউদ, হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৮৯৫*]

অর্থাৎ একটি মেয়েকে আপনি বিয়ে করবেন, নাকি করবেন না—এটা সবসময় নির্ভর করবে, তার কী কী গুণ আছে তার ওপরে। মানুষ হিসেবে সে কেমন। তার মধ্যে কতটুকু সংবেদনশীলতা রয়েছে। তারপরে তার পরিমণ্ডল। একেবারে শেষ বিবেচনা হচ্ছে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য। যদি গুণ না থাকে, যদি তার মধ্যে সংবেদনশীলতা না থাকে, তাহলে সৌন্দর্য যতই থাকুক কোনো লাভ নেই। আর এটা যে কত বাস্তব, তা এখন সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরাও বলছেন।

প্রশ্ন : বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অল্প কিছু সময়ের জন্যে ছেলেমেয়ের যে দেখাদেখি, এতে পরস্পরের গুণ সম্পর্কে কোনো ধারণা করা যায় না। অথচ আপনি বলেছেন, সেই নারীকে বিয়ে করা উচিত, যার গুণ আছে। প্রশ্ন হলো, একবার দেখে সেই মেয়ের গুণ কীভাবে নির্ণয় করা যাবে?

উত্তর : একবার দেখে অবশ্যই গুণ নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে বিয়ের ব্যাপারে কিছু সাধারণ বিষয় রয়েছে। সেগুলো সঠিকভাবে খোঁজখবর নিন। যেমন, সে কোথায় পড়াশোনা করেছে বা করছে, তার পারিবারিক পরিমণ্ডল, তার আচরণ, চারপাশের মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ইত্যাদি। আর বিয়েটা যদি সম-সামাজিক এবং সম-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে হয়, তাহলে এসব খোঁজখবর নেয়া সহজ হয়। একবার তার পরিচিত বলয়ে ঢুকতে পারলে গুণ সম্পর্কে ঠিকই ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে আপনি বর-কনের গুণকে প্রাধান্য দিতে বলেছেন। কোন বৈশিষ্ট্যগুলোকে গুণ বলা যায়? গুণ আছে, তা কীভাবে বুঝব?

উত্তর : কোনো আবেগ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মুক্তমনে বোঝার চেষ্টা করবেন। দেখা যায়, অধিকাংশ সময় বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা গুণকে বোঝার চেষ্টা না করে অন্যান্য বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেই বেশি। পাত্রী দেখতে গেলে সৌন্দর্য নিয়ে মাথা ঘামাই বেশি। পাত্র দেখতে গেলে হ্যান্ডসাম খুঁজি বা পকেটের অবস্থা কী—এটা খুঁজি। ফলে আমরা ভুল করি।

এখন প্রশ্ন হলো, গুণ বলতে কী বুঝবেন? এজন্যে আমাদের একটি প্রকাশনা আছে—'সর্বোত্তম আদর্শ' কণিকা। এটি পড়তে পারেন। এখানে

রসুলুল্লাহ (স) মানুষের কিছু গুণের কথা বলেছেন। এ আলোকে বিচার করার চেষ্টা করবেন তার মধ্যে কতগুলো গুণ আছে। সবগুলো খুঁজতে গেলে আপনি হয়তো হতাশ হবেন। কারণ একজনের মধ্যে সবগুলো গুণ থাকা মুশকিল। ৫০% থাকলেই বুঝবেন তিনি খুব গুণবতী নারী। এর চেয়ে বেশি এ যুগে প্রত্যাশা করবেন না। পুরুষের ক্ষেত্রেও একই কথা। গুণ খুঁজবেন, ভালো মানুষ খুঁজবেন। আপনি জীবনে সুখী হবেন।

প্রশ্ন : উচ্চশিক্ষিত একটি মেয়ের জীবনসঙ্গী যদি তেমন শিক্ষিত না হয়, তাহলে কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : এটি নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। একজন স্বল্পশিক্ষিত স্বামীরও মাস্টার্স পাশ স্ত্রী থাকতে পারে এবং তাদের পরিবার সুখী হতে পারে। স্বামী যদি হীনম্মন্যতায় না ভোগেন এবং তার চেয়ে শিক্ষিত একজনকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে সম্মানিত বোধ করেন এবং স্ত্রীও যদি সেই স্বামীকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সম্মানের সাথে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলেই আর কোনো সমস্যা থাকে না।

প্রশ্ন : আমি এমবিএ করেছি। বিয়ের জন্যে পাত্রীর কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবো? পরামর্শ দেবেন দয়া করে।

উত্তর : যদি ভাবেন, বউ উপার্জন করবে আর আমি হাউজ-হাজবেন্ড হয়ে বাসা সামলাব, তাহলে অর্থনৈতিক অবস্থাকে গুরুত্ব দেবেন। এমন মেয়েকে বিয়ে করবেন, যে বাইরে উপার্জনের কাজে এত বেশি ব্যস্ত যে, বাসায় আর কিছু করার সুযোগ তার নেই। সে দায়িত্বটা তখন আপনি নেবেন।

যদি আপনি মনে করেন দুজনের উপার্জনে সংসার চলবে, তাহলে যাকে শ্রদ্ধা করতে পারবেন অর্থাৎ যার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও গুণ আছে, যাকে আপনি দায়িত্বশীল মনে করবেন, তাকে বিয়ে করবেন। আর যদি আপনি চান আপনার বউ ঘর সামলাবে, তাহলে তেমন কোনো মেয়েকে বিয়ে করবেন, যার চাকরি করার ইচ্ছা নেই।

তবে সবসময় বিয়ের ক্ষেত্রে সম-সামাজিক, সম-আর্থিক, সম-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বেছে নেবেন। ধরুন, আপনার চাকরিজীবী পরিবার, আপনি যদি ব্যবসায়ী পরিবারে বিয়ে করেন, তাহলে আপনার মানিয়ে চলতে সমস্যা হতে পারে। কারণ আপনি হয়তো আপনার স্ত্রীকে সেভাবে কেনাকাটা করে দিতে

পারবেন না, ব্যবসায়ী পরিবারে সে যা পেয়ে এসেছে। তখন পরিবারে অশান্তি হবে। বাস্তব জীবন অনেক কঠিন।

আর একজন মানুষ যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়, সেখান থেকে তার বেরিয়ে আসা কঠিন। যেমন ধরুন, আপনি রক্ষণশীল পরিবারের একজন, কিন্তু বিয়ে করলেন একজন সঙ্গীতশিল্পীকে। দুজনেই ভালো মানুষ, কিন্তু সংসারে শান্তি থাকবে না—সারাক্ষণ কাটাকাটি, মারামারি।

বিয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন, শুধু চেহারা দেখে, কথা শুনে বা রূপ দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাবেন না। তাহলে আপনাকে পস্তাতে হতে পারে। কারণ যে সুন্দরী, অনেক ক্ষেত্রে তার সৌন্দর্যের অহংকার মেটানোর জন্যে আপনাকে আরো ওপরে উঠতে হবে। অতএব শুধু সৌন্দর্য দেখে নয়, সবসময় গুণ দেখে বিয়ে করবেন—সে ভালো মানুষ কিনা।

প্রশ্ন : বছর তিনেক হবে আমি একটা ছেলেকে পছন্দ করি। ছেলেটা ব্যবসায়ী। আমার পরিবারের সবাই চাকরিজীবী পছন্দ করে। আর ছেলেটা আমার চেয়ে কম শিক্ষিত। সে আমার চেয়ে বয়সেও অনেক বড়, প্রায় ১০ বছর। কিন্তু আমি ছেলেটাকে ভালবাসি। আমার বাড়িতে মেনে নিতে চায় না। গুরুজী, আমি কী করব?

উত্তর : আপনি বলছেন, আপনি তাকে ভালবাসেন। কিন্তু সে কি আপনাকে ভালবাসে? সবসময় মনে রাখবেন, মেয়ে হয়ে কখনো কোনো ছেলের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাবেন না। কারণ যখনই কোনো মেয়ে কোনো ছেলের প্রতি বেশি এগিয়ে গেছে, সেই মেয়ে সেই ছেলের কাছে গুরুত্ব পায় নি। কোনো ব্যাপারে একটু দ্বিমত হলেই আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, তুমি নিজে এসেছ, আমি তো তোমাকে আনি নি। তুমি তো কাঁঠালের আঠার মতো আমার পেছনে লেগে ছিলে।

কারণ বিয়ের শর্ত অনুসারে প্রস্তাব দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে ছেলের, মেয়ের নয়। তো সেখানে আপনি যদি নিজে গিয়ে তার ঘরে উঠেন, সে আপনাকে কখনোই শ্রদ্ধা করবে না। তার কাছে তো আপনি কাঙ্ক্ষিত নন। কিন্তু যদি সে পছন্দ করে নিয়ে যেত, তাহলে আপনাকে গুরুত্ব দিত।

দ্বিতীয়ত, সে আপনার চেয়ে কম শিক্ষিত। যদি উদার মনের না হয়, তাহলে হয়তো সে ভাববে, স্ত্রী আমার চেয়ে বেশি শিক্ষিত। এ-ক্ষেত্রে বিয়ের পর সে হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে এবং আপনাকে মানসিক নির্যাতন করতে পারে। তাই ভেবেচিন্তে বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নেবেন, আবেগের বশে নয়।

প্রশ্ন : আমি একটা ছেলেকে পছন্দ করি। দূরসম্পর্কের আত্মীয়। ছোটবেলায় একবার তাকে দেখেছিলাম। ছেলেটি নিউইয়র্কে ছিল। বর্তমানে বিয়ে করার জন্যে দেশে এসেছে। সে ছেলে হিসেবে ভালো। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কীভাবে তার বাড়িতে প্রস্তাব পাঠানো যায়? আমি কীভাবে কোনো মাধ্যম পাব এবং তার সাথে দেখা হবে?

উত্তর : আপনি কীভাবে বুঝলেন, সে ছেলে হিসেবে ভালো? যে মেয়ে কোনো ছেলেকে পাওয়ার জন্যে নিজে এগিয়ে যায়, আমার দেখামতে সেই মেয়ের কপালে দুঃখ থাকে সবসময়। কারণ ওই ছেলে কখনো তাকে পাত্তা দেয় না। সে ভাবে, এ-তো এমনি এমনি চলে এসেছে। একে তো আমি চাই নি।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, খুশি হয়েছি। আসলে পছন্দ তো কতজনকে হয়। সিনেমার নায়ককে কতজন পছন্দ করে! কিন্তু সব মেয়ে কি সিনেমার নায়ককে বিয়ে করতে পারবে, না নায়কের পক্ষে সম্ভব সব মেয়েকে বিয়ে করা? অতএব এগুলো যত ভুলে যাবেন, তত ভালো।

প্রশ্ন : আমার পরিচিত এক মহিলাকে দেখলাম, যিনি তার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন এক ছেলেকে বিয়ে করেছেন এবং তার স্বামী সবসময় হীনম্মন্যতায় ভোগেন। এই ভাব চেপে রাখার জন্যে স্ত্রীকে শারীরিক-মানসিক সব ধরনের অত্যাচার করেন। স্ত্রী তাকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। উল্টো ফল হয়েছে তাতে। এ ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর : যে স্বামীরা হীনম্মন্যতায় ভোগেন, তাদের একটা বড় অংশ স্ত্রীর ওপর নির্যাতনও করেন। তাই বিয়ের ব্যাপারে সবসময় চিন্তা করতে হবে, সে ভালো মানুষ কিনা—ছেলে হোক অথবা মেয়ে। এটা হচ্ছে প্রথম যোগ্যতা। বাহ্যিক সৌন্দর্য, শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা হচ্ছে সেকেন্ডারি। একজন যদি ভালো মানুষ হয়, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম হলেও তার মধ্যে হীনম্মন্যতা থাকে না। কারণ সে একজন ভালো মানুষ। আর যদি সে ভালো মানুষ না হয়, তাহলে শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি হলেও তার সাথে অসুখী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

প্রশ্ন : আমার পরিবার থেকে পাত্রী দেখা হচ্ছে। কিন্তু গুরুজী, আমি কীভাবে বুঝব, এই পাত্রী আমার জন্যে বা আমি তার জন্যে পারফেক্ট। ১৫/২০ মিনিটের আলাপে জীবনসঙ্গী নির্বাচন কতটুকু সম্ভব বর্তমান যুগে?

উত্তর : বর্তমান যুগে ইউরোপ-আমেরিকায় ডেটিং-মেটিং করে যে-সব বিয়ে হচ্ছে, সেগুলোর কতগুলো টিকছে? সেখানে তো ডেটিং ছাড়া অর্থাৎ বিয়ের আগে যৌনসম্পর্ক ছাড়া তারা বিয়েই করে না। তারপরও তো বিয়ে টেকে না। কারণ বিয়ের আগে ডেটিং হয়ে গেলে বাকি থাকে বিটিং। যে কারণে আমেরিকায় স্বামী বা বয়ফ্রেন্ডরা সঙ্গিনীদের পেটায় সবচেয়ে বেশি।

আপনি যদি তাকে দেখে নির্মোহভাবে বুঝতে না পারেন তার সাথে আপনার ম্যাচিং হবে কিনা, তাহলে বুঝতে হবে, আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করছেন না। যদি নিয়মিত মেডিটেশন করেন এবং আপনার যদি নিয়ত থাকে যে, আমার সাথে যার মতের এবং মনের মিল হবে তাকে আমি বিয়ে করব এবং তাকে আমি দেখলে চিনব; আপনি তাকে দেখলেই চিনতে পারবেন—হাঁ, এই তো সে! আপনি সঠিক জীবনসঙ্গীকে পেয়ে যাবেন।

আর যদি চেহারার প্রতি বা কথার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে যান যে, দেখতে কী সুন্দর! একেবারে সিনেমার নায়ক/ নায়িকা। তাহলে বুঝতে পারবেন না। চেহারা বা বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে প্রভাবিত হলে আপনি কখনোই বুঝতে পারবেন না।

প্রশ্ন : আমি দেখতে শ্যামবর্ণের, চেহারা মোটামুটি ভালো, কাজকর্ম বেশ ভালোই পারি অর্থাৎ একজন নারীর যে গুণগুলো থাকলে সে বিবাহপরবর্তী সংসার করতে পারবে, আমার মধ্যে সে গুণগুলো আছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু আজ পর্যন্ত যে সকল পাত্র আমাকে দেখতে এসেছে তারা সবাই বলেছে, মেয়ে দেখতে কালো। এজন্যে আমি কী করতে পারি?

উত্তর : এজন্যে সবসময় ভাববেন, কালো জগতের আলো। শুকরিয়া আদায় করুন, আপনি কালো। নিজেকে জগতের আলো ভাববেন। তাহলে আপনি হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না। অর্থাৎ রংটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসলে হীনম্মন্যতাটা আসে নিজের ভেতর থেকে। নিয়মিত মেডিটেশন করুন। আত্মশক্তির জাগরণ ঘটান। নিজেকে আকর্ষণীয় ভাবুন। আপনার অন্তর্গত প্রত্যয়ই আপনাকে পারিপার্শ্বিকতার ওপর বিজয়ী করবে।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অন্ধ বা পঙ্গু ছেলের কাছে একটি ভালো মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু অন্ধ, পঙ্গু মেয়েকে কোনো ছেলে বিয়ে করতে চায় না। বিয়ে দিলেও যৌতুক দিয়ে ঘর সাজিয়ে দেয়া হয়। কালো মেয়ের ক্ষেত্রেও তা-ই। এরকম কেন?

উত্তর : আসলে বিয়ে নারী এবং পুরুষের মধ্যে শারীরিক মানসিক পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের পারস্পরিক অঙ্গীকারের একটি সামাজিক চুক্তি। অর্থাৎ বিয়ে মানেই দেনাপাওনা। এ-ক্ষেত্রে কোনো পুরুষ যদি শারীরিকভাবে বা মানসিকভাবে অক্ষম কোনো নারীকে বিয়ে করতে না চান, তাকে দায়ী করা যায় না। মেয়েটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

কিন্তু তারপরও এটি ঘটছে, অন্ধ-পঙ্গু পুরুষটি হয়তো কোনো সুস্থ নারীকে বিয়ে করছে। আসলে এর পেছনেও আছে একধরনের দেনাপাওনা। হয়তো পুরুষটির আর্থিক সামর্থ্য আছে, পারিবারিক ভিত্তি আছে, যা ওই নারীকে বা তার পরিবারকে আগ্রহী করেছে। কাজেই বিষয়টিকে সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে দেখতে পারেন, আবার বিয়েতে জড়িত দুটো পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতা হিসেবেও দেখতে পারেন।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে হবু পাত্র বা পাত্রীর দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতা সম্পর্কে জানতে পারলে কী করণীয়? এ-ক্ষেত্রে কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত?

উত্তর : মনে রাখবেন, বিয়ে হলো একটা কন্ট্রাক্ট, একটা চুক্তি। এখানে দুই পক্ষের কিছু অধিকার আছে, আছে দায়িত্ব এবং কর্তব্য। আপনি যদি জানতে পারেন যে, হবু পাত্র বা পাত্রী অসুস্থ এবং আপনি তাকে বিয়ে করতে চান না, তাহলে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আপনার আছে।

এ সমস্ত ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর নিজে থেকেই তা বলা উচিত। না হলে এটা প্রতারণা বলে গণ্য হবে। চুক্তিরত কোনো পক্ষ যদি অপরপক্ষের কাছ থেকে কোনো তথ্য গোপন করে সেটা যে-রকম অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, এটিও সে-রকম অপরাধ।

আরেকটা দিক হলো, আপনার সমমর্মিতা, মানবিকতা কিংবা মমতা। আপনি যদি মনে করেন, আহারে! এই অসুস্থতা নিয়ে সে যাবে কোথায়? আমি তাকে বিয়ে করব এবং তার পাশে থাকব। সেটার স্বাধীনতাও আপনার আছে। কিন্তু যা-ই করবেন, আপনাকে জেনেবুঝে স্বেচ্ছায় করতে হবে।

প্রশ্ন : পাত্রী ভালো কিনা, কুমারী কিনা বুঝব কীভাবে?

উত্তর : পাত্র ভালো কিনা, কুমার কিনা তা বোঝার কি কোনো উপায় আছে? একজন পাত্র কুমার কিনা, এটা বোঝার যেমন উপায় নেই, তেমনি একজন পাত্রী কুমারী কিনা সেটা বোঝারও কোনো উপায় নেই। আসলে চরিত্র একজন

নারীর জন্যে যেমন, একজন পুরুষের জন্যেও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পাত্রীর চরিত্র নিয়ে ভাববেন আর পাত্র যা খুশি তা করুক, তাতে কোনো অসুবিধা নেই—আমরা এই ভ্রান্ত ধারণার বিপক্ষে।

প্রশ্ন : আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পছন্দমতো বিয়ে হচ্ছে না। আমি কীভাবে এগোব?

উত্তর : 'পছন্দমতো' বিয়ে হওয়া আসলে কঠিন। সাধারণভাবে আমরা মেয়ের জন্যে নায়কের মতো চেহারা, উপরি আয় কত—এমন পাত্র খুঁজি। আর ছেলের জন্যে খুঁজি ফর্সা, সুন্দরী আর যৌতুক দিতে পারবে এমন পাত্রী। কিন্তু আপনি যদি কিছু ছাড় দেন, বৈষয়িক পছন্দকে গুরুত্ব না দিয়ে যদি 'মানুষ' খোঁজ করেন, গুণের গুরুত্ব দেন, তাহলে আপনি সুখী হবেন। পরিবার কণিকার 'বিবাহ পর্ব' পড়ুন। মেডিটেশন করুন, মনছবি দেখুন।

প্রশ্ন : মেয়েকে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা বিদেশি পাত্র ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না বা বিয়ে দেবো না—মা-বাবার এরকম মনোভাব অবিদ্যার পর্যায়ে পড়ে কি?

উত্তর : একেবারেই অবিদ্যা। এরা হতভাগা মা-বাবা। এদের ছেলেমেয়েরাও হতভাগা। মেয়েকে 'মানুষের' সাথে বিয়ে দিন, যে ভালো মানুষ।

প্রশ্ন : আমরা যারা জীবনে কোনো না কোনো সময় সাইকিয়াট্রিস্টদের শরণাপন্ন হয়েছিলাম অর্থাৎ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়েছিলাম, সুস্থ হওয়ার পর কি আমরা বিয়ে করতে পারব? ভবিষ্যতে সন্তানদের ওপর এর কোনো প্রভাব পড়বে কিনা?

উত্তর : মানসিক রোগীদেরকে নিয়ে আমাদের অহেতুক একটা ভীতি রয়েছে। সাধারণভাবে এদেরকে আমরা মনে করি পাগল। মানসিকভাবে অসুস্থ মানেই কিন্তু পাগল নয়। যখন আমাদের শরীরের কোনো অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, তখন আমরা শারীরিকভাবে অসুস্থ হই।

মানসিক অসুস্থতাও এরকম এবং নানা কারণে তা হতে পারে। দুঃখ, হতাশা, বিষণ্নতা, অস্থিরতা বা ক্রমাগত মানসিক চাপ থেকে এটা হতে পারে। ফলে কিছু সময়ের জন্যে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং আমরা বলি, সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়েছে। একবার সাইকোলজির এক ছাত্রী খুব বিচলিত

হয়ে বলল, এমএ ক্লাসে তাদের শিক্ষক নাকি বলেছেন, সব মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু পাগলামি থাকে। তার মানে সবাই পাগল। তাকে বললাম, তোমার শিক্ষকের কথামতো যদি সবাই পাগল হয়, তাহলে তো তিনিও পাগল। আর পাগল কী বলে তা নিয়ে না ভাবলেও চলে।

পাগল হচ্ছে, যে বর্ডারলাইন অতিক্রম করে গেছে। আর মানসিক অসুস্থতা মানে সে এই সীমানা অতিক্রম করে নি। সে আবার সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে। কাজেই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া মানেই পাগল নয়।

অধিকাংশ মানুষ এই ভুল ধারণা পোষণ করে যে, কেউ একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেছে মানে তার সব শেষ হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে! অথচ দৈহিক রোগ থেকে মানুষ যে-রকম মুক্ত হয়, সে-রকম মানসিক অসুস্থতা থেকেও মানুষ মুক্ত হতে পারে।

আবার কিছু কিছু শারীরিক রোগ আছে, যার ওষুধ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। মানসিক অসুখের বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। যেমন, সাধারণ ডিপ্রেশন থেকে শুরু করে মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার, অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার, সিজোফ্রেনিয়া, হ্যালুসিনেশন—এ অসুখগুলো পুরোপুরি ভালো না হলেও যথাযথ কাউন্সেলিং, অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ, পরিজনদের সহযোগিতা ইত্যাদি থাকলে এই রোগীরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। বিশেষ করে পরিবারের সহযোগিতাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ মানসিকভাবে সাধারণত তারাই বেশি অসুস্থ হয়, যারা মনের দিক থেকে একটু অনুভূতিপ্রবণ। যাদের বিষণ্নতা, হতাশা, অস্থিরতায় ভোগার প্রবণতা বেশি। এদের জন্যে সার্বক্ষণিক পারিবারিক সমর্থন খুব প্রয়োজন।

আর সন্তানদের ওপর প্রভাব পড়বে কিনা সে ব্যাপারে সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে আলাপ করে নেবেন। তবে আমরা বলতে পারি, আপনি এখন থেকেই সুন্দর দাম্পত্য জীবন এবং সুস্থ আলোকিত সন্তানের মনছবি দেখুন। বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে এটা করুন। নিয়মিত প্রার্থনা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার সন্তান সুস্থ হবে। তবে বিয়ের আগে অবশ্যই হবু জীবনসঙ্গীকে সমস্যাটা সম্পর্কে জানাতে হবে।

প্রশ্ন : আমার সাথে একটি মেয়ের সম্পর্ক রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে আমি বুঝতে পারি যে, তার সাথে আমার মানসিক বোঝাপড়া নেই। পরবর্তীকালে আমরা দুজনেই সময় নিই এবং সচেতন হওয়ার চেষ্টা করি। এতেও কোনো লাভ হয় নি। এ অবস্থায় আমাদের কি বিয়ে করা উচিত?

উত্তর : দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্যে মানসিক বোঝাপড়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বিয়ের আগেই আপনি বুঝতে পারছেন, আপনাদের মধ্যে এ নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে, সেহেতু এ বিয়ে না হওয়াটাই সমীচীন। কারণ এ-ক্ষেত্রে দুটি জীবনই নষ্ট হতে পারে।

প্রশ্ন : আমি একজন ফ্রিল্যান্সিং গ্রাফিক ডিজাইনার। এই পেশা বেছে নিয়েছি, কারণ যে-কোনো চাকরির চেয়ে এতে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে, আত্মমর্যাদা খুঁজে পাই। সমস্যা হচ্ছে বিয়ের সময়। সম্পর্ক করতে গেলে সবার আগে শুনতে হয়, ছেলের কোনো চাকরি নাই অথবা সরকারি চাকরি ছাড়া মেয়ে বিয়ে দেবো না। একটি মেয়ে আমাকে পছন্দ করত। তাকে বললাম, আমি প্রেম করব না, বিয়ে করব। তুমি কি রাজি? মেয়েটি জানাল, সে প্রেম করতে রাজি, কিন্তু তার পরিবার নাকি চাকরিজীবী না হলে বিয়ে দেবে না। তাহলে কি বিয়ের জন্যে আপনি আমাকে পেশা পরিবর্তন করতে বলবেন?

উত্তর : আপনি ফ্রিল্যান্সিং করছেন। আপনার উদ্যোগটা খুব ভালো। কারণ স্বাধীন পেশাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি সঠিক লাইনেই আছেন। যার আত্মসম্মানবোধ রয়েছে সে স্ত্রীকে সম্মান করতে পারে। যারা এটা বুঝতে পারবে তারা ঠিকই মেয়ে বিয়ে দেবে। আপনি চেষ্টা করতে থাকুন।

আর আপনি মেয়েটিকে সাহস করে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। কারণ প্রেম করবে মানেটা কী? আপনার পয়সায় ঘোরাঘুরি করবে, খাওয়াদাওয়া করবে। এরপর যে কথাটা বলত 'ছেলে চাকরি না করলে পরিবার বিয়ে দেবে না', সেটা আগে বলে ফেলেছে। ফলে আপনি বিপদ থেকে বেঁচে গেছেন। এজন্যে শুকরিয়াস্বরূপ দান করেন যে, আল্লাহ এরকম পরগাছা থেকে বাঁচিয়েছেন। তা না হলে ছ্যাঁকা খেয়ে বেঁচে থাকতে হতো।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিয়ে

প্রশ্ন : আমার বড় ভাই অন্য ধর্মের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী। মেয়ের পরিবার বোধহয় এ ব্যাপারে সহযোগিতা করছে। কিন্তু আমরা আগ্রহী নই। তাকে কীভাবে বোঝাব?

উত্তর : আপনারা যে আগ্রহী নন, বিষয়টা তাকে জানাবেন। মেডিটেশনের কমান্ড সেন্টারে এনে নিয়মিত তাকে বোঝাবেন। বিয়ে শুধু একজন নারী ও

একজন পুরুষের মধ্যকার বিষয় নয়, এটি একটি পারিবারিক ব্যাপার। বিয়ের সিদ্ধান্ত পারিবারিকভাবে সবাই মিলে নেয়া উচিত।

প্রশ্ন : আমি একটা হিন্দু মেয়েকে ভালবাসি। সে-ও আমাকে ভালবাসে। এখন আমরা কী করতে পারি?

উত্তর : বিয়ে সবসময় সম-সামাজিক, সম-সাংস্কৃতিক, সম-আর্থিক এবং সম-ধর্মীয় পরিমণ্ডলে হওয়া উচিত। কারণ বিয়েটা শুধু একজন নারী এবং একজন পুরুষের নয়, দুই পরিবারের ব্যাপার। দুই পরিবার যদি পরস্পরকে পছন্দ না করে, মেনে না নেয়, তাহলে সেই বিয়ে কখনো সুখের হয় না, সেখানে সবসময় একটা অশান্তি লেগেই থাকে। ভালোলাগা দুজনের ব্যাপার। কিন্তু বিয়ে শুধু দুজনের ব্যাপার নয়।

নিকটাত্মীয়ের সাথে বিয়ে

প্রশ্ন : মামাতো চাচাতো খালাতো ভাইবোনকে বিয়ে করা কি কোয়ান্টামের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য? যদি কাউকে ভালো লেগে থাকে, তবে তাকে বিয়ে করা কি অযৌক্তিক কিছু হবে?

উত্তর : আসলে বিয়ে নিকটাত্মীয়ের মধ্যে না হয়ে রক্তের সম্পর্ক নেই এমন কারো সাথে হওয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার জন্যে উত্তম। রক্তীয় সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে হলে সন্তান অনেক ক্ষেত্রেই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং জন্মগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। হযরত ওমরের (রা) একটি বক্তব্য হচ্ছে, 'তোমরা নিকটাত্মীয়কে বিয়ে কোরো না ধারাবাহিকভাবে। কারণ এতে তোমাদের সন্তান দুর্বল ও মেধাহীন হতে পারে' (ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত)। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণাও একই কথা বলে।

২০১৩ সালে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী মেডিকেল জার্নাল *ল্যানসেট*-এ প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের একটি গবেষণা রিপোর্টে বলা হয়, চাচাতো ফুফাতো খালাতো মামাতো ভাইবোনদের মধ্যে বিয়ে হলে তাদের সন্তানদের জন্মগত ত্রুটিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

অন্যদিকে যত অনাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হবে অর্থাৎ যত ক্রস কানেকশন হবে তত বংশগত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এবং সন্তান তত বেশি মেধাবী হবে। আর দুটো ভিন্ন জিনের সংমিশ্রণ হলে দেখা যায়, স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজন ত্রুটিপূর্ণ জিনের বাহক হলেও পরবর্তী প্রজন্মে তা হারিয়ে যায়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, বিয়ের আগে অবশ্যই পাত্র-পাত্রী উভয়ের রক্ত পরীক্ষা করে নেয়া উচিত। যাতে থ্যালাসেমিয়ার মতো বংশ পরম্পরায় সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটতে না পারে।

প্রবাসী পাত্র/ পাত্রী

প্রশ্ন : দেশের বাইরে থাকে এমন ছেলের সাথে দুই পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিয়ে করার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? ফোনে কথা এবং ছবি দেখা ছাড়া সামনাসামনি কেউ কাউকে দেখি নি।

উত্তর : শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষেত্রে বিদেশি পাত্র বা পাত্রীর সাথে এ ধরনের বিয়ে প্রতারণামূলক বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেজন্যে খুব ভালোভাবে খোঁজখবর না নিয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়। আর বিয়েটা ফোনে নয়, সরাসরি সশরীরেই হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : আমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাই, সে বিদেশে থাকে। কিন্তু আমার ইচ্ছা তাকে নিয়ে আমাদের দেশেই থাকব। এটা কি সম্ভব হবে?

উত্তর : কেন সম্ভব হবে না? আপনি নিজেই যদি বিশ্বাস করতে না পারেন, তাহলে কীভাবে হবে? আগে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। তারপর আপনার যিনি হবু স্ত্রী, তাকে বোঝাতে হবে, রাজি করাতে হবে। সেইসাথে তিনি যেন দেশে থাকতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ সবকিছু করতে হবে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত লোকজন বিদেশে পাড়ি জমায় তাদের কেউ কেউ বিদেশিদের বিয়ে করে সেখানে থেকে যায়। তাদের কারো বিয়ে টিকেছে; কারো বিয়ে টিকে নি। বিশেষত অনেক বাংলাদেশি মেয়ের বিদেশি স্বামীর সাথে সংসার ভেঙে গেছে। আমার পরিচিত এক এয়ার হোস্টেসের

সাথে আর্জেন্টিনার এক পাইলটের প্রেম করে বিয়ে হয়। কিছুদিন পর তাদের পুত্র সন্তান হয়। কিন্তু বর্তমানে সে ডিভোর্সি। আবার ঢাকার একটি আবাসিক এলাকাতে প্রচুর বিদেশি বিশেষ করে আফ্রিকান থাকে, যারা এদেশে ব্যবসার জন্যে আসার পর আর নিজ দেশে ফেরত যেতে চায় না। তাদের একটি উদ্দেশ্য থাকে এদেশের মেয়ে বিয়ে করা ও স্থায়ীভাবে বসবাস করা। কেউ কেউ সেটা করছেও। সার্বিক বিষয়ে আপনার পরামর্শ আশা করছি।

উত্তর : বাঙালিদের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে উদারতা। যারাই এই বাংলায় এসে থাকতে চেয়েছে, আমরা কখনো তাদের ফিরিয়ে দেই নি। এটা আমাদের জাতির সবচেয়ে বড় ক্ষমতা। কেউ যদি এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে চায় এবং সে যদি ভালো মানুষ হয়, তাহলে বিয়ে হতেই পারে।

তবে আমরা যেটা সবসময় বলি, বিয়ে হওয়া উচিত সম-সামাজিক, সম-ধর্মীয় এবং সম-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। কারণ পরিবারের একটা বড় উপাদান হচ্ছে ধর্ম এবং সমাজ। এর মধ্যে যখন সাযুজ্য থাকে, তখন পরিবার সুন্দর ও স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তা না হলে পারিবারিক বিরোধ-বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ একেক জায়গার সংস্কৃতি একেকরকম। সাংস্কৃতিক মিল থাকলে পারিবারিক জীবনটা সহজ হয়। আর মিল না থাকলে অনেক কিছু মানিয়ে চলতে হয়।

বিয়ের ব্যাপারে পারিবারিক সাপোর্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারকে বুঝিয়ে পরিবারের সম্মতিতে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তবে প্রতারণার বিষয়টাও মাথায় রাখতে হবে যে, এদেশে আসতে ভিনদেশিদের কেউ কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে বা প্রতারণার জন্যে বিয়ে করতে চাচ্ছে কিনা। এসব ক্ষেত্রে নিজে এবং পারিবারিকভাবে ভালোমতো খোঁজখবর নিয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। তা না হলে জীবনে বড় ধরনের ক্ষতি ও দুর্ভোগের সম্ভাবনা থাকে।

বিয়ের বয়স

প্রশ্ন : জীবনের কোন পর্যায়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত?

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক একটি ছেলে বা মেয়ে জীবনের যে-কোনো পর্যায়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে—যদি সে মনে করে বিয়ের জন্যে শারীরিক, মানসিকভাবে সে প্রস্তুত এবং বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব নেয়ার সামর্থ্য তার আছে।

মনে রাখতে হবে, বিয়েটা শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণের উপায় নয়, শুধু হানিমুন বা রোমান্টিকতা নয়; বরং বিয়ে হচ্ছে একটি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত মনে করলেই কেবল একটি ছেলে বা মেয়ে যে-কোনো বয়সে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তবে সেইসাথে কাকে বিয়ে করবেন, সে বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকারের সুখী এবং আনন্দপূর্ণ পরিবার গঠনের জন্যে একটি ছেলে বা মেয়ের তাকেই বিয়ে করা উচিত, যাকে সে সম্মান করতে পারে, সহযোদ্ধা মনে করতে পারে। যে তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে এবং তার জন্যে প্রয়োজনে সবকিছু বিসর্জন দিতে পারবে।

তাই বিয়ের জন্যে শুধু সৌন্দর্য বা অর্থবিত্ত বা উচ্চ ডিগ্রি নয়; ভালো মানুষ খুঁজতে হবে, যার সাথে চেতনার মিল আছে এবং যে এ জীবনের পরেও মহাজাগতিক জীবনে আপনার সঙ্গী হতে পারবে।

প্রশ্ন : আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেছি এবং এখন চাকরি করছি। প্রত্যাশিত চাকরি পাওয়া এবং পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আমি বিয়ে করতে চাই না। কিন্তু চারপাশের মানুষজন ক্রমাগত আমার মা-বাবাকে বোঝাচ্ছে যে, মেয়েকে বিয়ে দেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। এরপরে নাকি আমার জন্যে যোগ্য পাত্র পাওয়া যাবে না। এখন আমার মা-বাবাকে কীভাবে বোঝাব, যেন তারা অন্যের কথায় প্রভাবিত না হন?

উত্তর : যোগ্য পাত্র বা পাত্রী—এ ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের কিছু প্রচলিত ভুল ধারণা আছে। যেমন, একজন পুরুষ তার চেয়ে কম যোগ্যতার একজন মহিলাকে বিয়ে করতে পারে এবং এটা সমাজের চোখে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কিন্তু একজন মহিলা যদি তার চেয়ে কম যোগ্যতার কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে চায় বা করে, তাহলে সেটা একটা আলোচিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি সেটা উভয় পরিবারের সম্মতিতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে হলেও।

আমরা মনে করি, মেয়ে এমবিএ করেছে, ছেলেকে তাহলে পিএইচডি করতে হবে। অর্থাৎ যোগ্যতার ব্যাপারটাকে আমরা বৈষয়িক দিক থেকে বিচার করি। কিন্তু সত্যিকার যোগ্যতা হচ্ছে—ছেলে বা মেয়ে ভালো মানুষ কিনা, স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে সে ভালো হবে কিনা।

স্বামী হিসেবে যদি ভালো হয়, তাহলে একজন বিবিএ গ্রাজুয়েটও এমবিএ মেয়ের জন্যে উপযুক্ত পাত্র হতে পারে, তারা সুখী দম্পতি হতে

পারে। একজন পেশাজীবী নারী—যিনি স্বাবলম্বী, নিজের পরিচয়ে পরিচিত, তার তো স্বামীর পরিচয়ের কোনো প্রয়োজন নেই।

আর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে কেউ বিয়ে করতে পারে না। কারণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠার কোনো শেষ নেই। একটা লক্ষ্যে পৌঁছার পর মনে হতে পারে, এবার আরেকটি লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, তারপর আবার। অর্থাৎ এটি একটি নিরন্তর প্রয়াস। বিয়ের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্পর্কের চেয়ে বিয়ের প্রয়োজন অনুভবের সম্পর্কটাই বেশি।

অর্থাৎ কেউ যদি প্রয়োজন অনুভব করেন, তাহলে যে-কোনো সময়ই তিনি বিয়ে করতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে তাই যে পরামর্শটি প্রযোজ্য তা হলো, আপনার নিজের সিদ্ধান্তের প্রতি যদি আপনার দৃঢ়তা থাকে, প্রত্যয় থাকে, তাহলে মা-বাবাকে অবশ্যই বোঝাতে পারবেন।

এজন্যে প্রয়োজন সবর এবং মা-বাবার প্রতি মমতা ও শ্রদ্ধার মনোভাব। তাহলেই দেখবেন, আপনি বোঝাতে পারছেন। আর বাস্তবতা হচ্ছে মেয়েদের মোটামুটি ৩০ বছর পার হওয়ার আগেই বিয়ে করা উচিত। ৩০ বছর পার হয়ে গেলে পাত্র পাওয়া খুব কঠিন।

প্রশ্ন : যে-সব মেয়ের বিয়ে হতে দেরি হয়, পরিবারের মুরব্বিরা তাদের তাবিজ নিতে বলেন। এর ভিত্তি বা প্রয়োজন কতটুকু?

উত্তর : এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অপ্রয়োজনীয়। ভণ্ডরা তাবিজের মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেয়। আসলে বিয়ে অনেক কারণে বিলম্বিত হতে পারে। উপযুক্ত পাত্রপাত্রী খোঁজা থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছু দেখে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে এই সময় লেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক। আর বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সংখ্যার চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশি।

এই বাস্তব কারণগুলোর জন্যে যদি কারো বিয়ে হতে দেরি হয়, তাহলে তাকে তাবিজ-কবচ দিলেই মুশকিল আসান হবে, এমন কল্পনা করা স্রেফ মূর্খতা। শুধু বিয়ের জন্যে নয়, অনেক সময় স্বামী বা স্ত্রীকে বশ করতে বা শত্রুকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে অনেকে তাবিজ-কবচের পেছনে ছোটেন।

এক ভদ্রমহিলা স্বামীকে ধরে রাখার জন্যে তথাকথিত পীর-ফকিরদের পেছনে খুব দৌড়াদৌড়ি করলেন। স্বামী তার সাথে সংসার করার ব্যাপারে কোনোভাবেই আগ্রহী নয়। ভদ্রমহিলাকে বোঝানো হলো যে, তার ব্যাপারে তার স্বামীর যেহেতু কোনো আগ্রহই নেই, তাই এসব 'ব্যর্থ চেষ্টা' না করে তিনি যেন নিজের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেন।

কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। তার স্বামীকে কব্জায় আনার চেষ্টায় তাবিজ-ঝাড়ফুঁকের পেছনে সঞ্চয়ের সব টাকা শেষ করলেন। ওদিকে স্বামীও তাকে ডিভোর্স দিলো। কাজেই এসব তাবিজ-কবচের পেছনে ছোটা সমস্যার সমাধান তো করেই না, উল্টো ক্ষতি করে এবং অশান্তি বাড়ায়।

প্রশ্ন : মেয়ে অনার্স ২য় বা ৩য় বর্ষে অথবা ডিগ্রি পড়ে, এ অবস্থায় বিয়ের ভালো প্রস্তাব এলে, মেয়েরও সম্মতি থাকলে শুধু মাস্টার্স পাশের কথা ভেবে কি বিয়ে দেবো না, নাকি দিয়ে দেয়া ভালো?

উত্তর : এটি পুরোপুরি নির্ভর করছে আপনাদের সিদ্ধান্তের ওপর। মেয়েদের ক্ষেত্রে অনার্স ২য় বা ৩য় বর্ষে এসে বিয়ে দেয়া যেতেই পারে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে বিয়ের পর মেয়েরা পড়াশোনা শেষ করেছেন।

প্রশ্ন : বর্তমান সময়ে যখন মেয়েরা বিয়ে করে ক্যারিয়ারের দিকে ঝুঁকছে, এ-ক্ষেত্রে মেয়েদের বিয়ের বয়স কত হওয়া উচিত? লেখাপড়া শেষ করে বিয়ে করা উচিত, না চাকরি পাওয়ার পরে?

উত্তর : যদি ক্যারিয়ার গড়তে হয়, তাহলে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পর বিয়ে করা উচিত। কিন্তু পাত্র খোঁজার পর্বটা শুরু করবেন আগে থেকেই। কারণ ভালো পাত্র পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর যাকে বিয়ে করবেন তার সাথে বোঝাপড়াটা গুরুত্বপূর্ণ। তাতে ক্যারিয়ার গড়া সহজ হয়। কারণ জীবনে কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তে হয়। সব একসাথে পাওয়া যায় না। জৈবিক জীবনে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। অর্থাৎ কিছু পাবেন, কিছু পাবেন না। যা পাবেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ! যা পাবেন না, মনে করবেন সেটা আপনার জন্যে নয়। সে-ক্ষেত্রেও শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলবেন।

প্রশ্ন : সুখী পরিবার গঠনের জন্যে কত বছর বয়সে বিয়ে হওয়া উচিত?

উত্তর : এর উত্তর বলা মুশকিল। যত বছর বয়সে বিয়ে করার প্রয়োজন অনুভব করবেন, আপনি তত বছর বয়সেই বিয়ে করবেন। কারো ২০ বছর বয়সে মনে হতে পারে, কারো ২৫, কারো ২৮ বছর বয়সেও মনে হতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধানও বলা মুশকিল। এ-ক্ষেত্রে সাইকোলজি বলে, স্ত্রীর চেয়ে স্বামীর বয়স পাঁচ থেকে সাত বছর বেশি হওয়া উচিত।

সাধারণভাবে আমরা মনে করি, মেয়ের বয়স যদি ছেলের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে পরস্পরের প্রতি টান বা আকর্ষণ থাকবে না। অথচ নবীজীর জীবনে আমরা দেখি, যখন মা খাদিজার সাথে বিয়ে হয় তখন তার বয়স ৪০ আর নবীজীর (স) বয়স ২৫। তাঁদের মতো সুখী পরিবার পৃথিবীতে নেই। একজন মহিলা ৫০ বছর বয়সে মক্কা থেকে হেরা গুহায় স্বামীর জন্যে খাবার নিয়ে যেতেন। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি স্বামীকে কতটা ভালবাসতেন! অর্থাৎ এটা নির্ভর করে মমতার ওপর, পারস্পরিক ভালবাসার ওপর। বিয়ের জন্যে বয়স কোনো ফ্যাক্টর নয়। এ ব্যাপারে ধরাবাঁধা কোনো নিয়মও নেই।

প্রশ্ন : অনেক সময় পারিবারিকভাবে মেয়েদের ১৬/১৮ বছর বয়সের পূর্বেই বিয়ে দেয়া হয়। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

উত্তর : আসলে মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। এটা আইনত নিষিদ্ধ। একটি মেয়ে ১৮ বছর এবং একটি ছেলে ২১ বছর বয়সের পরে যখনই মনে করবে যে, আমার বিয়ে করা প্রয়োজন, সেটাই বিয়ের উপযুক্ত বয়স। এর আগে বিয়ে দেয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : গুরুজী, আপনি বলেছিলেন, পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরেই একজন মানুষের বিয়ে করা উচিত। এ কারণেই শিক্ষিত মানুষের বিয়ে করতে দেরি হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সন্তানের সংখ্যা কম হয়। মেডিকেল সায়েন্স বলে, ৩৪ বা ৩৫ বছর বয়সের মধ্যেই একজন মহিলার পরিবার পরিপূর্ণ করা উচিত। ৩০ বছর বয়সের পর প্রথম সন্তান হতে গেলে অনেক জটিলতার সম্ভাবনা থাকে। তাই আত্মনির্ভরশীল হয়ে বিয়ে করা এবং সন্তানসমৃদ্ধ আদর্শ পরিবার গঠন করা—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে কীভাবে সামঞ্জস্য করা যায়?

উত্তর : প্রথমত, পড়াশোনা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পরে বিয়ে করা উচিত—এটি পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ আইনত এবং ধর্মীয় মতে, সংসারের ব্যয় নির্বাহ, স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর। কাজেই তাকে স্বাবলম্বী হতে হবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তেমনটি নয়। সংসারের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নারীর নেই।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষে প্রথম সুযোগেই বিয়ে করা উচিত। কারণ সন্তান ধারণ, লালন ইত্যাদির জন্যে বয়স অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হওয়া এবং পরিপূর্ণ পারিবারিক জীবন—এই দুয়ের সম্মিলন এক কঠিন ব্যাপার।

প্রশ্ন : একজন পুরুষ ও একজন নারীর বিয়ের সবচেয়ে উত্তম বয়স কত থেকে শুরু হয়?

উত্তর : উত্তরটা কিন্তু খুব সহজ। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি কোনো মেয়ে বা ছেলে মনে করে যে, এই বয়সে আমার বিয়ে করা প্রয়োজন, সেটাই বিয়ের উত্তম বয়স। এখানে মেয়ে বা ছেলে বলে আলাদা কোনো বিষয় নেই। এটার অন্য কোনো মানদণ্ড নেই। বিয়ের প্রয়োজন কেউ ১৮, ২০, ২৫, ৩০ বছর এমনকি ৪০ বছর বয়সেও অনুভব করতে পারেন। আবার কেউ হয়তো কোনোদিন প্রয়োজন অনুভব না-ও করতে পারেন। যেমন, লতা মুঙ্গেশকর। তিনি অনুভব করেন নি তার বিয়ের প্রয়োজন।

তবে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যদি বিয়ে করতেই হয় তো সঠিক সময়ে, শরীরে শক্তিসামর্থ্য থাকতে বিয়ে করাটা ভালো। কারণ বিয়ে শুধু দুজনের ব্যাপার নয়। যখনই কেউ বিয়ে করছে, সে একটা পরিবারের চিন্তা করছে, সে সন্তানের চিন্তা করছে। তখন বয়স যদি খুব বেশি হয়ে যায় তাহলে সমস্যা। এ-ছাড়া সন্তান লালনপালনের জন্যেও শরীরে শক্তিসামর্থ্যের প্রয়োজন। অতএব যুক্তিসঙ্গত সময়ে বিয়ে করা উচিত।

আমরা আসলে বিয়ের সাথে অহেতুক রোমান্টিসিজম যোগ করি। আজকাল তো পুরো মিডিয়া জুড়েই বিয়ে নিয়ে কল্পনাবিলাস। আমরাও এরকম কল্পনায় মত্ত থাকি। ফলে বাস্তবে ধাক্কা খেতে হয়। অথচ বিয়ে খুবই প্র্যাকটিক্যাল একটি বিষয়—একটি দায়িত্ব ও কর্তব্য যে, সকালে উঠে নাশতা কী হবে, দুপুরের খাবার তৈরি কিনা ইত্যাদি।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে যে-রকম কম পয়সায় ফুচকা আর চীনাবাদাম খেয়ে ঘোরাঘুরি করে কাটিয়ে দেয়া যায়, বিয়ের পরে এ সবই কিন্তু অবাস্তব। তাই যত প্র্যাকটিক্যাল হবেন তত ভালো থাকবেন। যেহেতু বিয়েটা হচ্ছে প্রয়োজন, অতএব যে বয়সে আপনি বিয়েকে প্রয়োজন মনে করছেন, সেটাই বিয়ের সঠিক বয়স।

প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে নানা সংস্কার বিয়ের মতো একটা পবিত্র কাজকে দিন দিন ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য করে তুলছে। ফলে বহু তরুণ বিয়ে করতে দেরি করছে, যা তাদের স্ট্রেস বাড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় বিয়ের সঠিক বয়স কত হলে

এবং আর্থিক সামাজিক অবস্থান কোন পর্যায় হলে বিয়ে করা তরুণদের জন্যে জরুরি তা জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর : আইনগতভাবে বিয়ের একটা নির্দিষ্ট বয়স তো আছেই—মেয়ের জন্যে ১৮ বছর এবং ছেলের জন্যে ২১ বছর। এরপর আপনি যে বয়সে বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করবেন সেই বয়সে বিয়ে করবেন। মুশকিল হচ্ছে সামাজিক এবং আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে আপনার বয়স যদি ৪৫ বা ৫০ হয়, তখন ২০ বা ২৫ বছরের কেউ আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না। অতএব বিয়ের ব্যাপারে আর্থিক এবং সামাজিক পর্যায় কোনো বিষয় নয়।

ভালো কাউকে পেলে সরাসরি বলবেন যে, অযথা ঘোরাঘুরি করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই, আমি বিয়ের প্রস্তাব করছি, তুমি তোমার মতামত জানাও। সেইসাথে বিয়ের আগে হবু স্ত্রীকে নিজের আর্থিক অবস্থা একেবারে খোলামেলা বলে নেবেন যে, আমার এই এই অবস্থা।

অর্থাৎ আলগা ফুটানি করবেন না। হাইকোর্টের ছবি দেখিয়ে বলবেন না যে, এটা আমার দাদার বাড়ি। নিজের অবস্থা পরিষ্কার করে নিলে অপরপক্ষ আপনার সততাকে সম্মান করবে। আপনার স্পষ্টবাদিতাই আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করবে। বিয়ে তো একটা পবিত্র সম্পর্ক, বিশ্বাসের সম্পর্ক। এখানে যেন কোনো প্রতারণা না থাকে। তাহলে দেখবেন যে, আপনার সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন : আমি একজন মেয়ে। আমার পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল। কিন্তু আমি নিজেও ক্যারিয়ার গড়তে চাই। এদিকে আমার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন কোনটা প্রাধান্য দেবো?

উত্তর : বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে মানে তো আপনার একটা বয়স হয়েছে। আপনি যেহেতু নারী, এখন আপনার বিয়েটাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। কারণ যত বয়স বাড়বে, বিয়ের প্রস্তাব কমতে শুরু করবে। অতএব সময়মতো বিয়ে করে সংসারের পাশাপাশি ক্যারিয়ারে মন দিতে পারেন।

প্রশ্ন : গুরুজী, আপনি বলেছেন, ১৫ থেকে ২২ বছর বয়সে ছেলেমেয়ে বাস্তবতা না বুঝে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াশোনার ক্ষতি করে। কিন্তু ২৩ বছর বয়সে কোনো ছেলে যদি দায়িত্ব নেয়ার সামর্থ্য রাখে, তাহলে কি বিয়ে করতে পারবে? তাতে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে?

উত্তর : যদি কোনো ছেলে দায়িত্ব নিতে চায় এবং স্ত্রীকে ভরণপোষণ করার সামর্থ্য থাকে, তাহলে সে ২৩ বছর বয়সে অবশ্যই বিয়ে করতে পারে। শুধু দায়িত্ব নিতে হবে। মা-বাবারও উচিত হবে বিয়ে দিয়ে দেয়া। বদমাইশি করে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে বিয়ে করা অনেক ভালো। অনেকে বিয়ে করেও বেশ ভালো পড়াশোনা করেছে। কারণ রেজাল্ট খারাপ করলে তো শ্বশুরবাড়িতে মানসম্মান থাকবে না।

পাত্র-পাত্রীর বয়সের ব্যবধান

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে পছন্দ করি। মেয়েটিও আমাকে পছন্দ করে। দুজনের চিন্তাচেতনায় মিল রয়েছে। দুই পরিবারের মধ্যেও অনেক সামঞ্জস্য। তারপরও আমাদের বিয়েকে দুই পরিবারের কেউই মেনে নেবে না, কারণ মেয়েটি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এই বিয়ে কতটা জায়েয এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এর কী প্রভাব রয়েছে?

উত্তর : জায়েয-নাজায়েযের প্রশ্ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব—এ দুটো আলাদা বিষয়। ছেলেমেয়ে যদি সুস্থ মস্তিষ্কে, সজ্ঞানে, পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে করে, তাহলে সেটা জায়েয। ছেলেকে মেয়ের চেয়ে বড় হতে হবে—তা না হলে বিয়ে জায়েয হবে না, এটা ভ্রান্ত ধারণা। কিন্তু এ ধরনের বিয়ের সামাজিক প্রভাব বা পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা আলাদা এবং সে-সম্পর্কে আপনাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আপনারা কতটা সাহস এবং অবিচলতার সাথে এটা মোকাবেলা করতে পারবেন। এর সাথে জায়েয-নাজায়েযের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে বয়সে বড় কোনো মেয়েকে যদি পছন্দ হয়, তাহলে অনেক কথা শুনতে হয়। পারিপার্শ্বিক অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ-ক্ষেত্রে কী করণীয়? নিজের চেয়ে বড় মেয়েকে বিয়ে করা কি সম্ভব?

উত্তর : সামাজিক দৃষ্টিতে এ বিষয়টি প্রচলিত নয়। ধর্মীয় বা আইনগত দিক থেকে অবশ্য কোনো বাধা নেই। আর পারিপার্শ্বিক সমস্যা থাকবেই। কারণ আপনি যদি এমন কাজ করেন, যা আপনার চারপাশের মানুষ করছে না, তখন তো আপনাকে কথা শুনতেই হবে।

আসলে এটি সবসময় নির্ভর করে পাত্র-পাত্রীর ওপরে এবং তারা যে পরিবেশে থাকবেন সেই পরিবেশের ওপরে। যদি পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া ঠিক থাকে, তাহলে এ বিষয়গুলো কখনোই সমস্যা সৃষ্টি করে না।

প্রশ্ন : কনের চেয়ে বরের বয়স বেশি হতে হবে। এটি কি অবিদ্যা, নাকি ধর্মীয় অনুশাসন?

উত্তর : এ ব্যাপারে ধর্মীয় কোনো অনুশাসন নেই। কনের বয়স বা বরের বয়স কত হবে এটা সবসময় নির্ভর করে, যারা বিয়ে করবে তাদের ওপর।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে বয়স কোনো সমস্যা না হলে আমাদের সমাজব্যবস্থায় কি কোনো পরিবর্তন আসবে না? অভিভাবকরা তার বড় মেয়েটিকে বয়সে কিছুটা ছোট কোনো ছেলের সাথে পাঠিয়ে কেন নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না?

উত্তর : কোনো মেয়েকে বয়সে ছোট কোনো ছেলের সাথে ছোট ভাই মনে করে পাঠানোটাই তো একটা অবিদ্যা। সে-তো আপন ছোট ভাই নয়। যদি ঘন ঘন পাঠাতে থাকেন এবং তারা মিশতে থাকে—একটা সময় তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে। তখন বলতে পারবেন না যে, ছোট ভাই মনে করেছিলাম! আগে থেকেই বুঝে চলতে হবে। বয়সে ছোট হলেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি জৈবিক আকর্ষণ বোধ করবে না—এমন কোনো কথা নেই।

যে-কোনো বয়সের মানুষের সাথে যে-কোনো বয়সের মানুষের জৈবিক সম্পর্ক হতে পারে, যদি সে-রকম সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেজন্যে প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হবে। আপনার কলেজপড়ুয়া মেয়েকে কেন স্কুলপড়ুয়া একটি ছেলের সাথে পাঠাবেন? পাঠানোর আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে। আপনি হয়তো ভাবলেন, মেয়ে যেহেতু বড়, ছেলের প্রতি তার আকর্ষণ থাকবে না। বিষয়টি তা নয়, আকর্ষণ মেয়ের দিক থেকেও হতে পারে।

প্রশ্ন : সমবয়সীদের মধ্যে কি বিয়ে সম্ভব? এতে কোনো অসুবিধা হয় কিনা?

উত্তর : যারা বিয়ে করবেন—এই দুজন হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তারা সিদ্ধান্ত নেবেন—সমবয়সী হবেন, না ছেলের বয়স বেশি হবে, না মেয়ের বয়স বেশি হবে। সাধারণভাবে ছেলে এবং মেয়ে যখন সমবয়সী হয়, তখন তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সংঘাত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

আবার মেয়েদের যেহেতু পারিপার্শ্বিকতা বোঝার ক্ষমতা একটু বেশি, সমবয়সী হলে দেখা যায় মেয়েটি ছেলেটির তুলনায় বেশি ম্যাচিউরড, যেটা তাদের দাম্পত্য জীবনে মতভেদ, জটিলতা ইত্যাদির কারণ হয়। যেমন, সাধারণত ২০ বছরের মেয়ের যে ম্যাচিউরিটি, ২০ বছরের ছেলের তা হয় না। যখন দুজনেরই বয়স ২০, মেয়েটি তখন তার স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। অন্যদিকে স্বামী ভাবে, আমার বয়স যা-ই হোক, আমি পুরুষ। তখন সংঘাতটা বেশি হয়।

আবার সমবয়সী বিয়ের আরো কিছু বিষয় আছে। ৪০ পেরোনো একজন পুরুষের স্ত্রী-ও যখন সমবয়সী হয়, তখন সাধারণভাবে তার প্রতি জৈবিক আকর্ষণ কমতে থাকে। তখনই পরকীয়া, ভুল বোঝাবুঝি ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এসব কারণে সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন বয়সের একটা ব্যবধান থাকা উচিত।

প্রশ্ন : সহপাঠী যদি ফাইনাল ইয়ারে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তবে কি বিষয়টা ভাবা উচিত হবে? সহপাঠীদের মধ্যে বিয়ে হওয়াটা আপনি কীভাবে দেখেন?

উত্তর : বিয়েটা কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ কেউ নিজের চেয়ে বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করেও সুখী হয়। কেউ নিজের চেয়ে কমবয়সী মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হয়েছেন। কেউ আবার সহপাঠীকে বিয়ে করেও সুখী হয়েছেন। এটা হচ্ছে নিজস্ব ব্যাপার। তবে সাধারণত সমবয়সীদের বিয়ে না করাটা ভালো। কারণ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ম্যাচিউরিটি বেশি থাকে। বয়সের ব্যবধান যদি না থাকে, একদিকে যেমন ম্যাচিউরিটির ক্ষেত্রে সমস্যা হয়, তেমনি সমস্যা হয় নেতৃত্ব নিয়ে।

কারণ সহপাঠীর সঙ্গে 'তুই-তুই' সম্পর্ক হওয়ায় কেউ কারো নেতৃত্ব মানতে চায় না। হয় আপনাকে স্ত্রীর নেতৃত্ব মানতে হবে, না হয় স্বামীর নেতৃত্ব মানতে হবে। এখানে দুজনই নেতৃত্ব দিতে চায় বলে অসুবিধাটা হয়। তাই সাধারণভাবে স্বামী-স্ত্রীর বয়সে পাঁচ-সাত বছরের পার্থক্য থাকা ভালো। তবে আপনাদের মধ্যে যদি সেই অসুবিধা না থাকে, আপনারা যদি পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে পারেন, সহপাঠী বিয়ে করার ক্ষেত্রে অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন : মেয়ের চেয়ে ছেলে ১০ বছরের বড়। ছেলেমেয়ে দুই জনই ডাক্তার। দুই জনের মতামতে বিয়ে হচ্ছে। বয়সের এই ব্যবধান কি কোনো সমস্যা তৈরি করবে?

উত্তর : ছেলে ১০ বছরের বড় হলে অসুবিধা কী? দুই জনের যদি সম্মতি থাকে এবং পারিবারিকভাবে যদি কোনো অসুবিধা না থাকে, বয়স কোনো সমস্যা নয়। কিন্তু দুই জনের মতামতটা এ-ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : আমি যেখানে পড়াশোনা করি সেখানে আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট একটা ছেলে আমাকে অনেক পছন্দ করেছে। মাকে জানালে তিনি বললেন, ছেলে তার পছন্দ হয়েছে, কিন্তু ছেলেদের মন তো আকাশের রঙের মতো। আজ পছন্দ করছে, কিন্তু পরে যদি সমস্যা হয়! আমি বুঝতে পারছি না, আমার কী করা উচিত?

উত্তর : আজকে ছেলেটি আপনাকে পছন্দ করছে বলে আপনিও মুগ্ধ হয়ে গেছেন। প্রথমত, মেয়ের চেয়ে কমবয়সী ছেলের সাথে বিয়ের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কোনো বাধা নেই। কিন্তু এ ধরনের বিয়ের কিছু সামাজিক, মানসিক এবং শারীরিক প্রতিক্রিয়া আছে, যা আপনাদের বিবেচনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজে সাধারণত কনেকে বরের ছোট, নিদেনপক্ষে সমবয়সী হতে হয়। আপনাদের বয়সের ব্যবধানটা খুব বেশি নয়, যে কারণে সামাজিকভাবে বিষয়টা হয়তো সেভাবে কারো চোখে না-ও পড়তে পারে।

এরপরে আসে মানসিক। সাধারণভাবে মেয়েদের মানসিক ম্যাচিউরিটি একটু তাড়াতাড়ি হয়। সে-ক্ষেত্রে এই ছেলেটির সাথে বায়োলজিক্যালি আপনার বয়সের ব্যবধান হয়তো মাত্র তিন বছরের, কিন্তু মানসিক ব্যবধান যে এর চেয়ে বেশি নয়, তার কী নিশ্চয়তা?

বাস্তবতা হলো, প্রকৃতিগত কারণেই একজন পুরুষ সবসময় প্রত্যাশা করে, যে নারীটি তার স্ত্রী হবে, সে তার সমস্ত কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব মেনে নেবে। কিন্তু বয়সে বড় একজন নারীর সাথে এই বোঝাপড়ায় ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আর সর্বশেষ হলো, শারীরিক বিষয়টি। বেশি বয়সী একজন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর দাম্পত্য চাহিদা পূরণের সামর্থ্যগুলো যখন কমতে থাকে, তখন তাদের সংসারজীবন অত সুখকর না-ও হতে পারে। তাই বয়সে বড় কাউকে বিয়ে করার আগে আপনার প্রতিটি বিষয়ই বিবেচনা করা কর্তব্য।

বিয়ের মনছবি

প্রশ্ন : বিয়ের মনছবি কীভাবে করব? নির্দিষ্ট কারো চেহারা যদি ভেসে আসে, তাহলে তাকে নিয়েই কি মনছবি দেখতে হবে? সে ভালো হবে কিনা, সেটা যাচাই করার কি দরকার নেই?

উত্তর : অবশ্যই দরকার আছে। বিয়ের ব্যাপারে সবসময়ই বাস্তবে পাত্র/পাত্রীর খোঁজখবর নিয়ে যাচাই করে দেখা উচিত, সে কতটা উপযুক্ত হবে। এ-ক্ষেত্রে অন্ধের মতো কখনোই স্বপ্ন দেখা উচিত নয়। কারণ বিয়ে হলো দুটো মানুষের শারীরিক মানসিক বৈষয়িক পারিবারিক ও সামাজিক সামঞ্জস্য, বোঝাপড়া ও ভারসাম্যের বিষয়।

এখানে আবেগের রঙিন চশমা পরে শুধু বাহ্যিক রূপ বা চাকচিক্যে মোহিত হওয়া উচিত নয়। পরিণামে তা শুধু অশান্তি আর কষ্টই এনে দেয়। কাজেই মনছবি দেখার আগে এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে অবশ্যই বাস্তবে পর্যাপ্ত খোঁজ নেবেন।

আর স্ত্রী সুন্দরী হবে বা স্বামী হ্যান্ডসাম হবে অথবা বিয়ের প্রোগ্রাম কেমন হবে, এগুলো নিয়ে অনেকে মনছবি করেন। আসলে জীবনসঙ্গীর মাঝে আপনি কী কী গুণ দেখতে চান এবং দাম্পত্য জীবন কেমন হবে সেই মনছবি করাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ জীবনসঙ্গীর গুণ এবং সবাইকে নিয়ে সুখী দাম্পত্য জীবনের মনছবিই হলো বিয়ের প্রকৃত মনছবি।

প্রশ্ন : ভালো বিয়ের ব্যাপারে মেডিটেশনে মনছবি দেখাই কি যথেষ্ট?

উত্তর : বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় নিজের যোগ্যতার কথা মনে না রেখে অপরপক্ষ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করি। যেমন, গ্রাম্য প্রবাদ আছে—*টাকা বারোটা, মেয়ে বড়টা, তার মধ্যে সুন্দরটা*। অর্থাৎ অনেক টাকা থাকতে হবে, বড় মেয়ে হতে হবে, আবার সুন্দরীও হতে হবে।

ভালো বিয়ের জন্যে মেডিটেশনে মনছবি দেখতে হবে, সেইসাথে নিজেকে সেই যোগ্যতায় নিয়ে যেতে হবে। আর আপনার মনছবিটাও করতে হবে বাস্তবানুগ এবং তাতে আপনার আস্থা থাকতে হবে। যেমন, আপনি মধ্যবিত্ত পরিবারের চাকরিজীবী যুবক। এখন আপনি যদি মনছবি দেখেন, আপনার স্ত্রী হবে কোনো বিশ্বসুন্দরী কিংবা কোনো দাপুটে মহিলা, তাহলে তো ঠিক হবে না।

আপনাকে আপনার অবস্থান থেকে ভাবতে হবে এবং আপনার সম-সামাজিক ও সম-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কাউকে বেছে নিতে হবে। তাহলে আপনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, দাম্পত্য জীবনে সুখী হবেন।

প্রশ্ন : বলা হয়, বিয়ে কার সাথে হবে, না হবে—এগুলো স্রষ্টার হাতে। তাহলে একজন যোগ্য জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে আমি কী প্রার্থনা করব? এ-ক্ষেত্রে মনছবি কীরকম হবে?

উত্তর : স্রষ্টার হাতে বলে কি আপনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন? স্রষ্টা তো এসে আপনাকে বিয়ে করিয়ে দিয়ে যাবেন না। প্রার্থনা করবেন। মনছবি দেখবেন—যে-রকম গুণের জীবনসঙ্গী আপনি চাচ্ছেন, সে-রকম পেয়ে যাচ্ছেন সময়মতো। সেইসাথে জীবনসঙ্গী কীভাবে পাবেন, সে খোঁজখবরও রাখতে হবে। প্রয়োজনে মা-বাবাকে বলতে হবে—ওখানে আছে, একটু যোগাযোগ করেন।

প্রশ্ন : প্রতিটি মেয়েই মনছবি দেখে সুন্দর শান্তিপূর্ণ বিবাহিত জীবনের। কিন্তু যখন বিবাহিত জীবনে ঝড় আসে, তখন একটি মেয়ের কী করা উচিত? কোন ধরনের মেডিটেশন করা উচিত? এ বিষয়ে আপনি কি কিছু বলবেন?

উত্তর : এখানে মনছবি না, বরং বলা যায় প্রতিটি মেয়ের কল্পনা হচ্ছে একটা সুন্দর সংসার। 'রাজা বানকে আনা রে, মুঝে লেকে যানা রে, ছম ছমা ছম ছম'—এটা হচ্ছে প্রতিটি মেয়ের কল্পনা। রাজা আসবে, আমাকে নিয়ে যাবে—কী আনন্দ! এসব কথা গানে, নাটক-সিনেমায় ঠিক আছে। বাস্তবতা অনেক কঠিন। এই 'রাজা'কে আকর্ষণ করার জন্যে 'রানি'র যে গুণ এবং যোগ্যতা প্রয়োজন, সেটা কি আপনি সৃষ্টি করছেন?

কাজেই শুধু বসে বসে রাজা-রানি হওয়ার কল্পনা করলে তো হবে না। যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। যেমন, মহাভারতের যুগে রানি হওয়ার জন্যে রাজকুমারীকে ষোলোকলায় পারদর্শী হতে হতো।

আর বিবাহিত জীবনে ঝড় এলে ধৈর্যধারণ করতে হবে, থাকতে হবে প্রো-একটিভ। কারণ সবর সবকিছুকেই জয় করতে পারে। এজন্যে নিয়মিত শিথিলায়ন এবং মনছবি মেডিটেশন করবেন।

প্রশ্ন : আপনার কথামতো বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে চাই। চাই সফল ক্যারিয়ার গঠন করতে, একইসাথে চাই বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করতে। এ দুটো মনছবি পাশাপাশি দেখা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হবে?

উত্তর : অযৌক্তিক হওয়ার কী আছে? দুটোই যেহেতু আপনার জন্যে প্রয়োজন, মনছবি দেখতে কোনো দোষ নেই। কাজেই যদি বিয়ের ব্যাপারে মনস্থির করে থাকেন, তো সিদ্ধান্তটি যত দ্রুত সম্ভব নেয়াই ভালো হবে।

প্রশ্ন : আমি বিয়ের জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছি। মনছবি করেছি। আমার পছন্দের কেউ নাই। আত্মীয়দের মধ্যে পাত্র খুঁজে দেয়ার মতো কেউ নাই। তাই ম্যারেজ মিডিয়াতে সিভি দেবো। আমি যেন সহজে সঠিক জীবনসঙ্গী খুঁজে পাই তার জন্যে অটোসাজেশন দিতে চাই। আপনার *জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন* বইটিতে এ-সংক্রান্ত কোনো অটোসাজেশন পাই নি। অটোসাজেশনের ক্ষেত্রে শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঠিক অটোসাজেশন কী হবে জানাবেন।

উত্তর : বলবেন, 'আমি মনের মতো জীবনসঙ্গী খুঁজে পাচ্ছি। আমি মনের মতো জীবনসঙ্গী খুঁজে পাচ্ছি।' সেইসাথে মনছবি করতে থাকুন। নিয়মিত দোয়া করুন। আর ম্যারেজ মিডিয়া থেকে প্রাপ্ত সিভি দেখেই বিয়ে করে ফেলবেন না। বরং সেই সিভিগুলোর ব্যাপারে ভালোভাবে খোঁজখবর নিন, যাচাই করুন। তারপর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রশ্ন : বিয়ের জন্যে মনছবি কীভাবে করব? ব্যাখ্যা করবেন। আমি বিয়ের মনছবিতে দেখছি শুধু শানবাঁধানো ঘাট আর পূর্ণিমার চাঁদ। এই মনছবি কি ঠিক হচ্ছে? বিয়ের মনছবি কেমন হতে পারে?

উত্তর : আপনার বিয়ে কেমন হবে এই ব্যাখ্যা তো আপনাকেই করতে হবে। এই ছবি আপনাকেই আঁকতে হবে। আরেকজন ছবি আঁকলে তো এটা তার ছবি হবে, আপনার ছবি হবে না। আসলে বিয়েটা শানবাঁধানো ঘাটও না, পূর্ণিমার চাঁদও না। বিয়ে নিছক রোমান্টিক বিষয় নয়। বিয়েকে রোমান্টিক রূপ দিয়েছে বেনিয়ারা। আজকাল বিয়েও হয়ে গেছে একটা ইভেন্ট। এতে লাভ শুধু ব্যবসায়ীদের।

বিয়ে হলো একটা দায়িত্ব, একটা বাস্তবতা। সকাল হলেই বাজার করা বা নাশতা তৈরি ও পরিবেশন করার বাস্তবতা, অর্থাৎ দায়িত্ব নেয়া। শারীরিক মানসিক সামাজিক আবেগিক যেভাবে বলেন, বিয়ে হলো মানুষের প্রয়োজন। প্রয়োজন কীভাবে পূরণ হবে, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব আপনি মনছবি দেখবেন, আপনার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এরকম ভালো জীবনসঙ্গী, যে

আসলেই ভালো মানুষ, যে আপনাকে বুঝবে এবং আপনি যাকে বুঝতে পারবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর মাঝে যে গুণগুলো দেখতে চান, সেগুলো মনছবিতে দেখবেন। কারণ দাম্পত্য জীবনে প্রয়োজন যদি পূরণ না হয়, পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি হতে আর শানবাঁধানো ঘাট থেকে পুকুরে পড়ে যেতে সময় লাগবে না।

প্রশ্ন : আমি একজন ডিভোর্সি। তালাক হয়েছে প্রায় তিন বছর। এরপর আমি নতুনভাবে নেক স্বামী, সন্তান ও সংসারের মনছবি দেখি। এটা কি আমার ভুল? এই মনছবি বাস্তবায়নের জন্যে আমি কী করতে পারি? আমি সবাইকে আমার তালাকের কথা বলি না, অবিবাহিত বলি। এতে কি পাপ হচ্ছে? আমি তো কাউকে প্রতারণা করতে চাচ্ছি না।

উত্তর : প্রতারণা কোনোভাবেই করা যাবে না। আপনি নিজেকে অবিবাহিত বললে এটা তো মিথ্যা বলা হলো। ডিভোর্স হওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই। কোনোরকম হীনম্মন্যতা মনে না রেখেই বলবেন—বনিবনা হয় নি, তাই ডিভোর্স হয়ে গেছে। সহজ কথাটাকে সহজভাবে বলবেন। তাহলে দেখবেন যে, আপনার জীবনে সমস্যা কম হচ্ছে।

নতুনভাবে বিয়ের মনছবি দেখার মধ্যে ভুল নেই। নেক স্বামী হওয়ার যোগ্যতা আছে তাদের মধ্যে যাকে পছন্দ হয় তার খোঁজখবর নিয়ে যোগাযোগ করবেন। আর এখন আপনার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হবে আপনার কাজ, উপার্জন, আপনার নিজের পরিচয়। তাই বিয়ে যখন হওয়ার তখন হবে। আপাতত আপনি নিজের পরিচয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করুন।

বিয়ের সিদ্ধান্ত

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, নবীজী (স) বিয়ের ব্যাপারে নারীদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু আমাকে আমার পরিবার জোর করে বিয়ে দিতে চায়। আমি এখনই বিয়ে করতে চাই না। আমি তাদেরকে অনেক বুঝিয়েছি, তারা আমার কোনো কথা শোনে না। এ অবস্থা থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে পারি?

উত্তর : আসলে বিয়ে করাটা তো প্রত্যেক নরনারীর নিজস্ব অধিকার। আর বিয়ে করতে না চাইলে মা-বাবা জোর করে বিয়ে দিতে পারে না। এখন আর সে যুগ নেই। জোর করে বিয়ে দেয়া সম্ভবই না।

মা-বাবা হয়তো বলেন যে, জোর করে বিয়ে দেবো। কিন্তু মা-বাবাদের এত বোকা মনে করা উচিত নয় যে, তারা জোর করে বিয়ে দেবেন। এটা হচ্ছে একটা মানসিক চাপ, যেন সন্তান বিয়ে করতে রাজি হয়। নিজের ইচ্ছা ছাড়া জোর করে কাউকে বিয়ে দেয়া যায় না।

এখন আমাদের দেশে নারী অধিকার রক্ষার জন্যে অনেক রকম ব্যবস্থা আছে। অতএব ঘাবড়ে যাবেন না। মা-বাবাকে বোঝান কেন আপনি এখনই বিয়ে করতে চান না। কারণটা যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে আপনার মা-বাবা অবশ্যই বুঝবেন।

আর কারণ যদি এটা হয় যে, সহপাঠী একজনের প্রতি দুর্বলতা আছে, তাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে সময় দেয়া দরকার। তারপর বিয়ে করবেন। মা-বাবা তো এটাতে রাজি হবেন না এবং রাজি না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ একটা ছেলে ৪০ বছর বয়সে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু একটা মেয়েকে যদি সহপাঠীর প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাহলে নিশ্চয়তা কী যে, বয়স ৪০ বছর হতে হতে সে অন্য কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে না। তখন ভোগান্তিটা তো মা-বাবারই হবে।

অতএব কেন বিয়ে করব না—এটা নিজের কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে এবং সেটার অবশ্যই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে হবে। আরেকজনকে পছন্দ করি এজন্যে আমি এখন বিয়ে করব না—এটা তো অনিশ্চিত ব্যাপার।

এমন ঘটনাও আছে—মেয়ে নিজের পয়সা দিয়ে ছেলেকে পড়িয়েছে, অপেক্ষা করেছে। তারপর যেই পড়াশোনা করে ভালো অবস্থান তৈরি হয়েছে, ভালো রেজাল্ট হয়েছে—আরেক মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে। অতএব এরকম বোকামি করবেন না। যদি কোনো সত্যিকারের কারণ থাকে যে, আমি এখন পড়াশোনা করছি, আমি নিজের পরিচয় সৃষ্টি করতে চাই—সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু কোনো ছেলের জন্যে অপেক্ষা করে বিয়েতে দেরি করবেন না।

প্রশ্ন : আমার মা-বাবা যদি আমার জন্যে এমন কোনো ছেলেকে পছন্দ করেন, যেখানে বিয়ে হলে ভবিষ্যতে আর্থিক দিক দিয়ে আমার ভোগান্তি হতে পারে, সে-ক্ষেত্রে তাদেরকে মানা করা কি অন্যায়? যদিও বুঝতে পারছি তারা কষ্ট পাচ্ছেন। নিজের দিক থেকে এই বিয়ের ব্যাপারে সাড়া না পেলেও কি রাজি হওয়া উচিত? আর্থিক দিকটিকে কি প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়?

উত্তর : আর্থিক দিক নাকি রূপের দিক প্রাধান্য দেবেন, সামাজিক দিক নাকি মানবিক দিক প্রাধান্য দেবেন—ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব। আপনি

যদি মনে করেন, আর্থিক দিক দিয়ে ভোগান্তি সহ্য করতে পারব না, তাহলে মা-বাবাকে সেভাবে বিনয়ের সাথে বুঝিয়ে বলবেন। কারণ জীবন আপনার। আর বিয়ের ব্যাপারে হাঁ বা না বলার স্বাধীনতাও আপনার পুরোপুরি আছে।

প্রশ্ন : আমি পিএইচডি করছি। ব্যবসায়ী বাবার একমাত্র সন্তান। আমাকে দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ একটি ছেলে পছন্দ করে। আমি তাকে বলি পরিবার যদি রাজি হয় আমার আপত্তি নাই। এই ১৪ বছরের মধ্যে ৩০ বারেরও বেশি আমাদের ব্রেক-আপ হয়েছে। আবার ঠিকও হয়েছে। আমি একটা বিদেশি ফার্মে জব করি এবং এর মধ্যে ফেসবুকের মাধ্যমে একটি ছেলের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়। তার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি। ছেলেটি শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং সারাবছর অসুস্থ থাকে জেনেও আমি তাকে গ্রহণ করতে চাই। তার ব্যক্তিত্ব, সততা, আমাকে বোঝা, সবকিছু মিলিয়ে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাসহ ভালবাসা কাজ করে। এখন পরিবার থেকে সেই ছেলেটার সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, যাকে ১৪ বছর ধরে অপেক্ষা করতে বলেছি। আমি কী করব বুঝতে পারছি না। পরিবারে আমি একটা দৃষ্টান্ত। ছোটদেরকে আমার মতো হতে বলা হয়। ছোট-বড়, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই আমাকে ভালো জানে। এখন দ্বিতীয় ছেলেটার কথা বললে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। আব্বু প্রচণ্ড কষ্ট পাবে। এদিকে এই অসুস্থ ছেলেটাকে যতটা ভালবাসি ৫০/ ৬০ বছরের আয়ুতে একসাথে থেকে সেই ভালবাসার প্রকাশ হবে না। তাই তাকে আমি মৃত্যুর পরেও চাই। গুরুজী, তাকে তার অক্ষমতার জন্যে বিয়ে না করলে প্রকৃতির প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ আমাকে বা আমার সন্তানকে কি প্রতিবন্ধী করে দেবেন? খুব মানসিক কষ্ট হচ্ছে। আমাকে সঠিক পথ দেখান।

উত্তর : যেখানে একজন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে ১৪ বছর ধরে, সেখানে দ্বিতীয় কারো সাথে জড়ানোটাই আপনার জন্যে একটা নৈতিক অপরাধ; যেহেতু একটা সম্পর্ক আছে আপনার। যাকে আপনি বলেছেন যে, পরিবার বিয়ে দিলে আপনার কোনো আপত্তি নেই। তার সাথে যদি সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেত, তারপর আরেকটা সম্পর্কে জড়াতেন, ঠিক ছিল।

অপরাধ আপনি করেছেন। দুজনকে আশা দিয়ে রেখেছেন। একজন মানুষ তো দুজনকে আশা দিতে পারে না। এটা অন্যায়। আল্লাহর কাছে এখনই ক্ষমা চান। আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং তিনি চাইলে যে-কাউকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু আপনার জন্যে বিয়ের ব্যাপারে প্র্যাকটিক্যাল হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। প্রথম ওয়াদাটা দ্বিতীয় ওয়াদার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

সবসময় মনে রাখবেন, বিয়ে একটা প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার। বিয়ে হচ্ছে একটা চুক্তি। এটা দেয়া এবং নেয়ার ব্যাপার। আপনার কিছু প্রয়োজন তিনি পূরণ করবেন, তার কিছু প্রয়োজন আপনি পূরণ করবেন। বিয়ে তো শুধু দুজনের ব্যাপার না। দুটো পরিবারের ব্যাপার, দুটো সংসারের ব্যাপার।

অতএব বিয়ের ব্যাপারে বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। পরিবারকে সাথে নিয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। পরিবার যেভাবে পছন্দ করে। আর যেহেতু এটা আপনারই পছন্দ। পরিবারও এখন সম্মত হয়েছে, অতএব প্রথমটিই আপনার জন্যে যুক্তিযুক্ত।

শারীরিক প্রতিবন্ধী একজন মানুষকে বিয়ে করার ব্যাপারে শুধু এটুকুই বলব—প্রতিবন্ধী বা মানসিক রোগীর সেবা করা মহৎ মানবীয় গুণ। কিন্তু তাকে বিয়ে করে সংসার করা অনেক কঠিন কাজ। দৈনন্দিন জীবনের নির্মম বাস্তবতায় প্রায়শই এসব আবেগ খানখান হয়ে যায়।

প্রশ্ন : মেয়ে ডিভোর্সি। এক ডিভোর্সি ছেলের সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। সম্প্রতি জানা গেল, ছেলে অফিসিয়াল পার্টিতে ড্রিংক করে। মেয়েটা ছেলেকে সুযোগ দিতে চাচ্ছে, কিন্তু মেয়ের পরিবার রাজি না। এমতাবস্থায় মেয়ের কী করা উচিত? মেয়ে নিজে ভালো বেতনে সম্মানজনক চাকরি করে।

উত্তর : ছেলে মদ্যপ, এটা জানার পরেও যদি কোনো মেয়ে সুযোগ দিতে চান, তাহলে ৯৯.৯৯% সম্ভাবনা যে, তিনি নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছেন। কারণ কোনো মদ্যপ বা নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির নেশা ছোটানো খুব সহজ ব্যাপার না। বিয়ের পরে জানলে এক কথা ছিল। কিন্তু বিয়ের আগে জেনেও যদি আগুনে হাত দেন এবং হাত পুড়ে যায়, তাহলে কারো কিছু করার থাকবে না। এটা স্রেফ বোকামি। আপনি জানেন যে, ধর্মীয় দৃষ্টিতে মাদক বা মদ হারাম। তাহলে জেনেশুনে হারামখোরকে কেন বিয়ে করবেন? যেখানে আপনি সম্মানজনক চাকরি করেন, সেখানে নিজেকে এত নিচে কেন নামাবেন?

প্রশ্ন : মন থেকে কাউকে ভালো না লাগলে কি তাকে বিয়ে করা উচিত?

উত্তর : কঠিন প্রশ্ন। এই ভালোলাগা বা না লাগাটা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। মন থেকে কাউকে ভালো লাগলেই যেমন তাকে বিয়ে করা উচিত নয়, তেমনি ভালো না লাগলেই যে বিয়ের জন্যে একজনকে অযোগ্য মনে করতে হবে, সেটাও ঠিক নয়।

কাজেই একজনকে ভালো লেগে গেল আর আমি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিলাম, বিয়ে করে ফেললাম সেটা তো না। কাউকে ভালো লাগলেই তিনি স্বামী হিসেবে ভালো হবেন বা স্ত্রী হিসেবে ভালো হবেন বা বিয়ে করলেই বিয়েটা সুখের হবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। কারণ ভালোলাগা এবং বিয়ে দুটো এক ব্যাপার নয়। ভালো লাগতে পারে, কিন্তু আপনি তার উপযুক্ত কিনা বা তিনি আপনার উপযুক্ত কিনা সেটা দেখতে হবে।

বিয়ে কিন্তু কোনো আবেগের বিষয় নয়। বিয়ে হচ্ছে বাস্তব জীবনে একসাথে চলার কমিটমেন্ট। ভালোলাগাটা বিয়ের একটা অংশ মাত্র। আমরা কোয়ান্টামে বলি, বিয়ে হয় দুটো পরিবারের মধ্যে। এখানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক অ্যাডজাস্টমেন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

আসলে ভালোলাগা একটা আবেগ। এই আবেগ খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। যদি স্থায়ী হতো, তাহলে এত এত প্রেমের বিয়ে ভাঙত না। বিয়ের ব্যাপারে সবসময় প্র্যাকটিক্যাল হবেন। আপনি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন তার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্টটা কীরকম হবে। ছোট্ট উদাহরণ দেই—

একটা বিয়ে ভাঙার শুরু শুধু ফ্যান নিয়ে। স্ত্রী যখন ঘুমাবেন ফ্যান ঘুরতে হবে। আর ফ্যান ঘুরলে স্বামীর ঘুম আসে না। আস্তে আস্তে আরো অপছন্দ যোগ হলো। পরে ডিভোর্স হয়ে গেল। অর্থাৎ পছন্দ-অপছন্দের দ্বন্দ্ব।

এখন যেহেতু ছেলেমেয়েরা অবাধে মেলামেশা করে, বিয়ের আগে চিন্তা করবেন, আমার কী কী পছন্দ, যাকে বিয়ে করব তার কী কী পছন্দ। আমার অপছন্দ কী কী এবং তার অপছন্দ কী কী। যদি ৫০% মিলে যায় বলবেন, শোকর আলহামদুলিল্লাহ। ৫০%-এর বেশি মেলা খুব কঠিন। ৫০% হলে বাকি ৫০% অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়।

বিবাহিত জীবন হচ্ছে সমঝোতার জীবন। এটা দেয়াল তোলার জীবন না, অভিমানের জীবন না। এখানে অভিমানের কোনো সুযোগ নেই। সকালবেলা নাশতা করতে হবে। নাশতা তৈরি করতে হবে এবং পরিবেশন করতে হবে। এ-ছাড়া তো কোনো বিকল্প নেই। এখন পরিবেশন যদি অন্যদিকে তাকিয়ে করেন, তখন কী অবস্থা হবে?

বিয়েটা হচ্ছে গিভ এন্ড টেইক। অর্থাৎ একটি কন্ট্রাক্ট। কন্ট্রাক্টটা সবসময় হয় দুটি স্বাধীন পক্ষের মধ্যে মুক্ত শর্তের ভিত্তিতে। শর্ত বুঝে দুজনকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। তাহলে আপনি সুখী হবেন। আর আবেগের বশবর্তী হয়ে বিয়ে করলে কী হবে?

যখন এস্ট্রলজার ছিলাম, আমি দেখেছি, ভুলগুলো বিশেষ করে মেয়েরাই করে। সোনার টুকরা একেকটা মেয়ে। যে-রকম দেখতে, এসএসসিতে

সর্বোচ্চ রেজাল্ট, পড়ছে এইচএসসিতে। আমাকে বলে যে, 'তাহাকে না পাইলে বাঁচিব না'। এত বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, মা, এখন তো বলছ তাহাকে না পাইলে বাঁচিবে না। যদি পাইয়া যাও, ছয় মাস পরে আবার আসিবে। আবার আমাকে জিজ্ঞেস করিবে—তাহাকে কীভাবে ছাড়িতে পারিব বলিয়া দিন। ছাড়িতে না পারিলে বাঁচিব না। কে শোনে কার কথা!

তখনকার দিনে মেয়েরা চিঠি পেত। 'রক্ত দিয়া লিখিয়াছি, তোমাকে না পাইলে মরিয়া যাইব।' সাধারণত মেয়েরা একবারও চিন্তা করত না এটা ছাগলের রক্ত, না মুরগির রক্ত! মা-বাবা ছেড়ে চলে এলো। যে মেয়ে তার মা-বাবাকে ছেড়ে কোনো ছেলের সাথে চলে যায়, সেই ছেলে তাকে বিশ্বাস করে না। একটা দুটো ঘটনা ব্যতিক্রম হতে পারে। কিন্তু ৯০% ক্ষেত্রে ছেলে মনে করে, যে মেয়ে মা-বাবা ছেড়ে এসেছে কবে না আমাকে ছেড়ে চলে যায়! সন্দেহ তৈরি হয়। আর এ কারণে ফাটল ধরে সম্পর্কে।

এ ধরনের ঘটনায় ৯০% ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, ছয় মাস থেকে দুই বছর টেকে। তারপর শেষ। অতএব যে-কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সবদিক চিন্তা করা প্রয়োজন যে, আমার সাথে তার অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কিনা, তার পরিবারের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কিনা।

প্রশ্ন : এ বছর পারিবারিকভাবে আমার এনগেজমেন্ট হয়। বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে, বিয়ে এখনো হয় নি। সমস্যা হলো, ছেলেটা কথায় কথায় আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে। আমাকে খুব এড়িয়ে চলে। তার এসব ব্যবহারে আমি খুব কষ্ট পাই। আমি বলেছি, যদি সে মনে করে যে, আমাকে পছন্দ করে ভুল করেছে তাহলে আমি সরে যাব। একথা শুনে সে তার ভুলের জন্যে ক্ষমা চায়, ওয়াদা করে—আর এমন করবে না এবং বলে যে, সে আমাকে খুব ভালবাসে, আমাকে ছাড়া থাকতে পারবে না। কিন্তু সে পাঁচ/ ছয় দিন পরেই সব ভুলে যায়। এই পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। আমাদের পরিবারও এসব নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছে।

উত্তর : সমস্যা কিন্তু শুধু তার মধ্যে নয়, আপনার মধ্যেও আছে। এই যে সে বলে, আপনাকে ছাড়া থাকতে পারবে না—এর চেয়ে বাজে কথা আর নেই। আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ বা কোনো স্ত্রী সহমরণে যায় নি যে, আমার স্বামী বা স্ত্রী মারা গেছে, আমিও মরে যাই। আগের যে-সব সহমরণের কাহিনী আমরা শুনি, সেগুলোতে জোর করে মেয়েদেরকে চিতায় তোলা হয়েছে। কেউ স্বেচ্ছায় যায় নি। আর কোনো পুরুষ কখনো সহমরণে যায় নি।

আসল কথা হলো, আপনাদের দুজনের মধ্যে বোঝাপড়াটা ঠিক হচ্ছে কিনা। বিয়ের আগেই যদি এ অবস্থা হয়, এটা নিয়ে আপনাকে যথেষ্ট চিন্তা করতে হবে। কিন্তু কী করবেন না করবেন সেটা পারিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। পরিবারের সাথে কথা বলুন। ঝুলে থাকবেন না। দোদুল্যমানতায় ভুগবেন না।

মিডিয়ার কল্যাণে বিয়ে সম্পর্কে একটা অযৌক্তিক ধারণা আমরা পোষণ করি, যেন পৃথিবীতে আপনার আগে কেউ বিয়ে করে নি। আপনার পরেও কেউ করবে না। কেবল আপনিই বিয়ে করতে যাচ্ছেন। অথচ একজন মানুষের জীবনে যে-রকম চাকরি, ব্যবসা, পড়ালেখা, মৃত্যু—একেকটা স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি বিয়েটাও একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

আর তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না—এসব বাজে কথা। যে মেয়ে বা যে ছেলে এসব বিশ্বাস করে, তাকে কিছু বলার নেই। এরা সব বায়বীয় জগতে বাস করে। বিয়ে আসলে একটা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন শারীরিক হতে পারে, মানসিক হতে পারে, আবেগিক, সামাজিক, পারিবারিক নানান প্রয়োজনে হতে পারে। সেই প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়োজন পূরণ হলে বিয়ে টিকবে আর যদি পূরণ না হয়, তাহলে 'তোমাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না', এর চেয়ে অর্থহীন কথা আর কিছু নেই। আর প্রয়োজন পূরণ হলে 'তোমার জন্যে আমার মরার কোনো প্রয়োজন হইবে না। আমি বাঁচিয়া থাকিব', এটা হচ্ছে সহজ হিসাব।

কথাগুলো খুব রূঢ় মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই বাস্তবতা। এখনকার ছেলেমেয়েরা এই বিভ্রান্তিতে ভোগে। বিয়ের পরে রূপকথার মতো—'অতঃপর তাহারা সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করিতে লাগিল'—বিষয়টি এমন নয়। কারণ বিয়ের পরে তো আসল জীবন শুরু হয়। অতএব সেভাবে বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নেবেন। অহেতুক বিভ্রান্তিতে ভুগবেন না।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, যে মেয়ে বাবার বাড়িতে সম্মান পায় না, সে মেয়ে শ্বশুরবাড়িতেও সম্মান পায় না। তাহলে যে মা-বাবা ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈষম্য করেন, মেয়েকে যথাযথ সম্মান করেন না, সে মেয়েটির কি বিয়ে করা উচিত নয়? এ-ক্ষেত্রে তার করণীয় কী?

উত্তর : আমি সেই অর্থে বলি নি। একটি মেয়ে বা একটি ছেলের শিকড় হচ্ছে তার বাবার পরিবার। সেখানে সে যে মর্যাদা পাবে, শ্বশুরবাড়িতে গিয়েও দেখা যাবে সেই মর্যাদাই সে পাচ্ছে। আমি মেয়ের অভিভাবকদের এটাই বোঝাতে

চেয়েছি। তার মানে এই নয় যে, বিয়ে করা যাবে না। অনেক সময় এমনও হতে পারে, স্বামী যদি ভালো হয়, বিয়ের পরে মর্যাদা আরো বেড়ে যেতে পারে। সেইসাথে নিজের যোগ্যতাও সৃষ্টি করতে হবে। কারণ মর্যাদা পাওয়াটা অনেকাংশে নির্ভর করে যোগ্যতার ওপর।

প্রশ্ন : আমি এমবিবিএস পাশ করেছি। বাবা আমার জন্যে পাত্র দেখছেন। সমস্যা হলো, আমি একটি ছেলেকে পছন্দ করি। ছেলেটি অনেক ভালো। কিন্তু ফ্যামিলি স্ট্যাটাসের কথা চিন্তা করলে ও আমাদের থেকে একটু কমই সচ্ছল। বিষয়টি আমার বাবা জানেন না। তিনি আমাকে বড় ঘরে বিয়ে দিতে চান। আমি অবশ্য বাবার অনুমতির বাইরে কোনো কাজই করব না। তার কথামতোই হয়তো কোনো বড় ঘরে আমার বিয়ে হবে। জানি না সে পাত্র কোন ধাঁচের হবে? গুরুজী, আপনার মতামতটা জানা খুব জরুরি।

উত্তর : এখানে প্রশ্ন কয়েকটা। একটা হচ্ছে যে, আপনি এমবিবিএস ডাক্তার। আপনার নিজের জীবনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার এবং সুযোগ আপনার আছে। দ্বিতীয়ত, এ চিন্তাটা খুব ভালো যে, আমি আমার পরিবারের মতে বিয়ে করতে চাই।

তৃতীয়ত, সবসময় মনে রাখবেন, বিয়ে হওয়া উচিত সম-সাংস্কৃতিক এবং সম-সামাজিক পরিমণ্ডলে। ধরুন, একজন খুব রক্ষণশীল, আরেকজন অভিনয় করেন—হয়তো দুজনেরই অর্থনৈতিক অবস্থান সমান কিন্তু সাংস্কৃতিক অবস্থান সমান নয়। এ-ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্ট করা বেশ কঠিন।

চতুর্থত, বিয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, যাকে বিয়ে করবেন তিনি মানুষ হিসেবে ভালো কিনা। তিনি যদি মানুষ হিসেবে ভালো হন, তাহলে অন্য অনেক কিছু কাটিয়ে উঠতে পারবেন। বাবাকে আপনার পছন্দের কথা জানাতে পারেন। বিয়ের ব্যাপারে কাউকে পছন্দ করতে দোষ নেই।

প্রশ্ন : আমি বিবিএ করেছি। পরিবারের সদস্যরা বলছে বিয়ে করতে। কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। এমতাবস্থায় আমার কি বিয়ে করা উচিত?

উত্তর : যাকে বিয়ে করবেন, সে-তো তার রিজিক নিয়েই আসবে। তার রিজিকে যদি খাবার থাকে, তাহলে আপনার উপার্জনের পথও বেরিয়ে যাবে। একটা মেয়েকে কেন বলতে পারবেন না যে, দেখ, এই হচ্ছে আমার অবস্থা! আমাকে যদি বিয়ে করতে চাও, এখানে এভাবে আমার সাথে থাকতে হবে।

আমি খেলে তুমি খাবে। তোমাকে না খাইয়ে আমি খাব না। যদি খাবার না জোটে দুজনই না খেয়ে থাকব। আপনি দেখবেন, পাত্রীর কোনো অভাব হচ্ছে না। কারণ এরকম সাহসী পাত্রকেই পাত্রীরা পছন্দ করে।

প্রশ্ন : আমি ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছি। পারিবারিকভাবে একটি মেয়ের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। আমার মাস্টার্স শেষ হওয়ার পর বিয়ে হবে এমনটাই কথা। কিন্তু আমার ভাইবোনেরা যখনই এ বিয়ের প্রসঙ্গ তোলেন, মেয়ের পরিবারের লোকজনেরা চুপ করে থাকেন। মেয়ের মা-বাবা ইতালি প্রবাসী। এইচএসসি-র পর থেকে মেয়েটির সমস্ত খরচ আমিই দেখছি, এমনকি কখনো কখনো তার পরিবারের জন্যেও। এদিকে বিয়ের কথা বললে কেমন যেন এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু বিষয়টি আমার আত্মীয়স্বজন, সমাজের সবাই জানে। তাহলে তারা কি আমার মা-বাবা না থাকার দুর্বলতাটা ব্যবহার করছে? বিয়েটা যদি না হয়, তাহলে কী করব? প্রো-একটিভ থাকব নাকি অন্য কোনো পদক্ষেপ নিব?

উত্তর : আসলে এখানে আপনার দিক থেকে ব্যাপারটি একরকম। কিন্তু তাদের দিক থেকে আরেক রকম। আপনি মেয়ের সব খরচ দিচ্ছেন, তার পরিবারের ব্যয় মেটাচ্ছেন এবং ভাবছেন, এই মেয়েটি একসময় আপনার স্ত্রী হবে। কিন্তু মেয়েটি বা তার পরিবারের কাছে বিষয়টি হয়তো এরকম না-ও হতে পারে।

হতে পারে পারিবারিকভাবে একসময় ঠিক হয়েছিল, কিন্তু এখন হয়তো মেয়েটি আর স্বামী হিসেবে আপনাকে পছন্দ করছে না। সত্যি কথা বলতে, মেয়েটির কিন্তু সে অধিকার আছে। কারণ ইসলাম বলে, বিয়ের ব্যাপারে প্রতিটি মেয়ের রয়েছে স্বাধীন মতামত। তাকে প্রস্তাব দেয়া যায়—কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণ করার অধিকার যেমন তার আছে, তেমনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকারও তার আছে।

আপনার তো বরং শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলা উচিত যে, বিয়ের পরে এ ঘটনা ঘটে নি। কারণ বিয়ের পরে যদি বুঝতেন, সে এড়িয়ে যেতে চাইছে বা আপনার প্রতি তার কোনো অনুভূতি নেই, তখন আরো অশান্তি হতো। হয়তো শেষমেশ বিবাহবিচ্ছেদ হতো। সে-সব ঝামেলা থেকে তো আপনি বেঁচে গেলেন।

আর তার জন্যে দোয়া করুন—'তোমার যাকে খুশি বিয়ে করো, সুখী হও'। সেইসাথে আপনি নিজের জন্যে যাকে পছন্দ হয় তাকে বিয়ে করুন।

এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। কিন্তু কখনো জেদ করবেন না যে, অমুককে আমার পেতেই হবে। এ ধরনের জেদ কখনো শুভ কিছু নিয়ে আসে না।

প্রশ্ন : বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খাচ্ছি। আমার বয়স ৩২ বছর। বিজ্ঞজনেরা কম বয়সী মেয়ে বিয়ে করতে নিষেধ করছে। কিন্তু আমার পছন্দ ১৯ থেকে ২০ বছরের মেয়ে। দয়া করে বলবেন কি আমার কী করা উচিত?

উত্তর : আপনার বয়স ৩২ বছর। আর আপনি আপনার চেয়ে ১০ থেকে ১২ বছরের ছোট মেয়ে বিয়ে করতে চান। পাঁচ-ছয়-সাত বছরের ব্যবধান হওয়াটা স্বাভাবিক। এর চেয়ে বেশি না হলেই ভালো। আপনি সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খাচ্ছেন, কারণ আপনি ১৯ থেকে ২০ খুঁজছেন। আপনি ২২ থেকে ২৫ বছরের পাত্রী খুঁজতে থাকুন। দেখবেন, সহজে পেয়ে যাচ্ছেন।

স্বামী-স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান পাঁচ-সাত বছর হলে—এটা যুক্তিসঙ্গত। আবার পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকলে ২০ বছরের ব্যবধানও সুখের হতে পারে। অতএব এ বিষয়গুলো মাথায় রাখুন।

প্রশ্ন : আমার মা-বাবা আমার জন্যে যে ছেলেকে পছন্দ করছে আমার সেই ছেলেকে একেবারেই পছন্দ হয় না। কিন্তু ওনাদের খুব পছন্দ। আমি যদি রাজি না হই, তবে আমার মা-বাবা খুব কষ্ট পাবেন। আমি আমার আম্মাকে খুব ভালবাসি। আমার এখন কী করা উচিত?

উত্তর : আপনার এখন খোলাখুলিভাবেই বলা উচিত—মা, আমার এই ছেলেকে একদম পছন্দ হচ্ছে না। এখন হয়তো মা কষ্ট পাবেন। কিন্তু যাকে পছন্দ নয় তার সাথে যদি সংসার না টেকে, তাহলে কি মা আনন্দিত হবেন? বরং তখন মা আরো বেশি কষ্ট পাবেন।

স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করবেন আপনি, জীবন কাটাবেন আপনি। যাকে একদম পছন্দ হলো না, তার সাথে জীবন কাটানো খুব কঠিন। অতএব মাকে বুঝিয়ে বলতে হবে—মা, ছেলেকে আমার কোনোভাবেই পছন্দ হয় নি।

প্রশ্ন : আমার চেয়ে ডিগ্রি স্ট্যাটাস সবকিছু থেকে উঁচু এমন একজনের সাথে আমি সম্পর্ক করি। আমি তাকে আমার কোনোকিছু গোপন করি নি। সে-ও তার কোনোকিছু গোপন করে নি। কিন্তু তার পরিবার বিশেষ করে তার মা আমার সাথে বিয়ে দিতে আগ্রহী নয়। কারণ আমি গরিব, প্রতিষ্ঠিত হই নি

এবং তাদের স্ট্যাটাসের সাথে যায় না। আমরা কেউই মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে গোপনে বিয়ে করতে চাই না। এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর : একজনকে ভালোলাগা আর বিয়ে, দুটো কিন্তু আলাদা ব্যাপার। বিয়েটা শুধু দুজন ব্যক্তির মধ্যে হয় না। বিয়ে হয় সবসময় এক পরিবারের সাথে আরেক পরিবারের। যেখানে আপনার চেয়ে ওপরের স্ট্যাটাস এবং তার মা যেহেতু অপছন্দ করছেন, সেখানে আপনার অবহেলিত থাকার সম্ভাবনা বেশি। আপনি সেখানে সম্মান এবং মর্যাদা পাবেন না, বরং অনবরত দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে। আমি মোবারকবাদ জানাই যে, আপনারা মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে গোপনে বিয়ে করতে চান না। অতএব আপনারা দুজন পরস্পরের জন্যে দোয়া করুন, যেন দুজনই সুখী হতে পারেন এবং পছন্দমতো অন্য কাউকে খুঁজে পান।

প্রশ্ন : আমি যেন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি, সেই দোয়া করবেন। কারণ সিদ্ধান্তহীন জীবনযাপন করছি।

উত্তর : সিদ্ধান্তহীন স্বামীর ঘর কোনো স্ত্রী করতে চায় না। তাই এ সিদ্ধান্তহীনতা থেকে বের হওয়ার জন্যে সবসময় অটোসাজেশন দেবেন। *জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন* বইটি পড়ুন। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত এবং আত্মবিশ্বাস-সংক্রান্ত যে অটোসাজেশনগুলো রয়েছে, সেগুলো আয়ত্ত করুন এবং ক্রমাগত চর্চা করুন। আর সবসময় মনে মনে বলুন, 'আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী। আমি পারি আমি করব। আমার জীবন আমিই গড়ব।'

প্রশ্ন : আমি একজন প্রকৌশলী। সম্মানজনক চাকরি করছি। বয়স ২৯ বছর। আমি বিয়ে করতে আগ্রহী, কিন্তু বাসা থেকে বলছে সরকারি চাকরি না পেলে বিয়ে নিয়ে না ভাবতে। এটা কতটুকু যৌক্তিক? অন্যদিকে মা-বাবাসহ পরিবারের সবাই ভীষণ খুঁতখুঁতে। তাই অনেক ভালো প্রস্তাব ঠুনকো যুক্তি দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। আপনার পরামর্শ চাই।

উত্তর : সরকারি চাকরির সাথে বিয়ের সম্পর্কটা কী? সরকারি চাকরি করা যদি বিয়ের শর্ত হতো, তাহলে দেশের কয়জন পুরুষ বিয়ে করতে পারত? আর বিয়ে করবেন আপনি, সংসার করবেন আপনি। এখানে আপনার পরিবারের খুঁতখুঁতে আচরণ যৌক্তিক নয়। তবে যেহেতু তারা আপনার মা-বাবা, তাদেরকে বিষয়টা খুব বিনয়ের সাথে বোঝাবেন।

আমাদের পরামর্শ খুব পরিষ্কার। বিয়ে করলে সময়মতো করবেন। না করলে সেটা অন্য ব্যাপার। আপনার বয়স ২৯ বছর। এটা খুব ভালো সময়। তার ওপর আপনি সম্মানজনক চাকরি করছেন। সম্মানজনক উপার্জন থাকা মানে আপনি আপনার স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে পারবেন। আর আপনি নিজেই অনুভব করছেন যে, বিয়েটা আপনার প্রয়োজন।

এখন আপনার আগ্রহের কথা পরিবারে জানান। একটা বয়সের পরে মা-বাবা তো বন্ধু। খোলামেলা বলবেন, যেভাবে বললে তারা বুঝবেন। আর আপনার লক্ষ্য পরিষ্কার থাকলে সরকারি চাকরির প্রস্তুতি আপনি বিয়ের পরও নিতে পারবেন।

প্রশ্ন : আব্বা-আম্মা আমার বিয়ের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। তারা নিজেদের ইচ্ছা আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আবার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আমার আর তাদের পছন্দের মধ্যে অনেক ফারাক। আমাকে তাদের পছন্দের মধ্য থেকেই একজন মেয়েকে পছন্দ করতে হবে। গুরুজী, এ-ক্ষেত্রে কী করব বুঝতে পারছি না।

উত্তর : মা-বাবা যদি বাছাই করেন, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু চূড়ান্ত নির্বাচনটা আপনাকে করতে হবে এবং আপনাকেও তার পছন্দ হতে হবে। মা-বাবা বাছাই করার পরেও যদি আপনার পছন্দ না হয়, বিনয়ের সাথে মা-বাবাকে বলবেন যে, পছন্দ তো হলো না, আরো দেখ।

আপনি অপেক্ষা করতে থাকুন। যখন মা-বাবার পছন্দের সাথে আপনার পছন্দ মিলে যাবে—ব্যস, কবুল করে ফেলবেন। মা-বাবাকে বলবেন যে, আমার কষ্টটা তোমরা সহজ করে দিয়েছ। আপনি তাদেরকে মন থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবেন।

আর বিয়ের ব্যাপারে তরুণ-তরুণীদের বলি, নিজে না দেখে কখনো বিয়ে করবেন না। কারণ আপনি সংসার করবেন। প্রথম দেখাতেই যদি তার ব্যাপারে অনাগ্রহ জন্মায়, বিতৃষ্ণা জন্মায়, তাহলে সংসার করা খুব কঠিন। ছেলে হোন অথবা মেয়ে—মা-বাবা যতই দেখুক, আপনি নিজে না দেখে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন না।

প্রশ্ন : আজকাল অনেক ছেলেমেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করবে ভেবে বয়স হয়ে যাচ্ছে ৪০-৪৫ বছর। আবার তার ছোট ভাইবোনের বয়সও ৩৫-৩৬ হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় অনেক অভিভাবক দোটানায় পড়েছেন। কারণ বড়

ছেলেমেয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ছোটর প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। আবার ছোট ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে মনে হয় বড়টার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে। অভিভাবকের কী সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত বুঝিয়ে বলবেন।

উত্তর : এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা যে, বড়কে রেখে ছোটকে বিয়ে দেয়া যাবে না। ছেলে হোক বা মেয়ে, একজনের জন্যে অন্যদের বিয়ে আটকে রাখা অভিভাবকদের উচিত নয়, যদি তাদের বিয়ের যুক্তিসঙ্গত বয়স হয়। কারণ বড় সন্তান যদি অভিভাবকের কথা না মানে এবং সে যদি নিজের দায়িত্ব নিয়ে নেয়, তাহলে যে শুনবে তাকে বিয়ে দিয়ে দেবেন।

এখন একটা গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করতে চায়। সমস্যা হলো, প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাকে বস্তুগত অর্জন অর্থাৎ গাড়ি বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনা—এসব দিয়ে মাপা হচ্ছে। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবেন কিনা, তার ভরণপোষণ এবং তার মৌলিক চাহিদাগুলো আপনি পূরণ করতে পারবেন কিনা। যদি চাহিদা পূরণ করতে পারেন আপনি প্রতিষ্ঠিত। বাকি সবই সেকেন্ডারি। কারণ প্রত্যেকে তার রিজিক নিয়ে আসে। হতে পারে যে, আপনার অল্প উপার্জন বা হয়তো চাকরিও নেই; বিয়ে করার পর উপার্জন বেড়ে যেতে পারে।

অতএব সবসময় বিয়ের বয়স হলে বিয়ে করে ফেলা উচিত। তা না হলে প্রতিষ্ঠিত হতে হতে সারাজীবন পার হয়ে গেলে আর বিয়েই করা হবে না। অপেক্ষা করতে করতে বয়স হয়ে গেলে তাকে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না বা বয়স্ক কাউকে পাবেন। তাকে তো কোনো যুবক-যুবতী বিয়ে করবে না তখন, যদি একান্ত বাধ্য না হয়। অভিভাবক হিসেবে এই বিষয়গুলো বড় সন্তানকে বোঝাবেন। এরপরও কথা না শুনলে বড় ভাইবোনের জন্যে কখনো ছোট ভাইবোনের বিয়ে আটকে রাখা উচিত নয়।

প্রশ্ন : আমি মহাবিপদে আছি। আমার বয়স ২৫। যে আন্তরিক হয় তারই প্রেমে পড়ে যাই। কী করব কাকে বিয়ে করব ঠিক করতে পারছি না।

উত্তর : ইয়ং লেডি, আপনার বয়সটা বিয়ের জন্যে সবচেয়ে ভালো সময়। এসময় বিয়ের প্রস্তাব এলে নাক সিঁটকাবেন না। প্র্যাকটিক্যাল হবেন। এখন কাকে বিয়ে করবেন ঠিক করতে পারছেন না, পাঁচ বছর পরে দেখবেন আপনার পছন্দমতো কোনো প্রস্তাব আসছে না। তখন কিন্তু আপনি সমস্যায় পড়বেন। কারণ প্রত্যেকটা কাজের একটা সময় আছে। সময়টাকে নষ্ট করে

ফেললে পরে যত কান্নাকাটি করেন, কোনো লাভ হবে না। আর সময়মতো সিদ্ধান্ত নিলে আপনি সফল হবেন। অতএব অবিবাহিত মেয়েরা যদি বিয়ে করতে চান, সময়মতো করবেন। কদর থাকতে থাকতে বিয়ে করে নেবেন।

প্রশ্ন : আমার একবার বিয়ে হয়েছিল। সংসার ছিল খুবই স্বল্প সময়। এখন যদি স্বামী হিসেবে অবিবাহিত ভালো মানুষ আশা করি এবং আল্লাহর কাছে চাই, সেটা কি আমার ভুল হবে? এ ব্যাপারে আমি বিশ্বাসী। কিন্তু অন্যরা আমাকে আশাহত করছে। তারা বলছে, এমনটা চাইলে যৌতুক দিয়ে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু আমি যৌতুকবিরোধী। এখন আমার চাওয়া কেমন হওয়া উচিত? উল্লেখ্য, আমার বয়স ২৯, এমবিএ করেছি, কিন্তু চাকরি হয় নি।

উত্তর : এই দৃষ্টিভঙ্গিটা সঠিক নয়। খোলামেলা বলি—আপনি বিবাহিত ছিলেন। যে-কোনো কারণে হোক, বিয়ে ভেঙে গেছে। এখন অবিবাহিত খোঁজ করছেন, অবিবাহিত ছেলেটাও তো আপনার মতো ভাবতে পারে। আগে বিয়ে হয়েছিল এমন কাউকে বিয়ে করতে যদি আপনার জড়তা থাকে, আরেকজন অবিবাহিতেরও একইরকম জড়তা থাকতে পারে। সে কেন অবিবাহিত মেয়ে খোঁজ করবে না? আপনি তো আপনার কলে আটকা পড়ে যাচ্ছেন।

আপনার ডিভোর্সের পরও অবিবাহিত কোনো মানুষকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চাওয়ার মধ্যে দোষ নেই। এটা হতেই পারে। কারণ বিবাহিত হওয়া বা বিয়ে ভেঙে যাওয়া, পতি বা পত্নী বিয়োগ হওয়াটা কোনো অপরাধ নয়। এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। আগে বিয়ে না হলে সে ভালো, আর বিয়ে হলেই সে খারাপ, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এই চিন্তাটা পরিহার করা উচিত। আপনার চাওয়া উচিত আপনাকে বুঝবে এমন একজন ভালো মানুষ। বিয়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত যে, মানুষটা ভালো কিনা। তার সাথে আমার সমঝোতা হবে কিনা বা বোঝাপড়াটা ভালো হবে কিনা।

আর যৌতুক দিয়ে বিয়ে? এটা কোনো বিয়ে হলো না। শরিয়ত অনুসারে বিয়ে মানে হচ্ছে, স্বামী দায়িত্ব নেবে স্ত্রীর।

প্রশ্ন : গুরুজী, সম-সামাজিক দুজন মানুষের বিয়ে করার কথা আপনি বলেন। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, উচ্চ সামাজিক শিক্ষিত ছেলের পরিবারের চেয়ে নিম্ন সামাজিক ছেলের পরিবার ভালো। এ-ক্ষেত্রে বিয়েটা কি পারিবারিক উচ্চপদ দেখে করা উচিত? নাকি মানুষটার মানসিকতা কেমন তা বিবেচনা করা উচিত?

উত্তর : অবশ্যই মানুষটার মানসিকতা কেমন এটা দেখতে হবে। সেইসাথে পরিবারের মানসিকতা কেমন এটাও দেখতে হবে। আসলে সম-সামাজিক মানে হচ্ছে আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটা একই হওয়া। তাহলে বোঝাপড়া ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ বিয়ে হয় দুটো পরিবারের মধ্যে, শুধু ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে নয়।

ছেলেমেয়ের মধ্যে বোঝাপড়া ভালো থাকলেও দুই পরিবারে যদি ভালো বোঝাপড়া না থাকে, সেই পরিবারে অশান্তি লেগে থাকে। এজন্যে ছেলের পরিবার কেমন, অন্য সদস্যরা কেমন, ছেলের মতোই ভালো কিনা, এগুলো দেখা উচিত।

প্রশ্ন : আমি ডিভোর্সি। সন্তান নেই। আমি আমার জীবন নিয়ে হতাশ এবং দুশ্চিন্তায় আছি। কীভাবে এ থেকে মুক্তি পাব? নতুন জীবন শুরু করতে সঠিক জীবনসঙ্গী চিনব কীভাবে?

উত্তর : ডিভোর্স কেন হয়েছে এটা গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান না হওয়ার কারণে যদি ডিভোর্স হয়ে থাকে, তাহলে একরকম। আর স্বামীর অমানবিক নির্যাতনের কারণে অথবা আপনার নিজের কোনো ভুল বা বদমেজাজের জন্যে যদি ডিভোর্স হয়ে থাকে, তাহলে আরেকরকম।

এখন আপনি দোয়া করুন এবং নিজের পরিচয় সৃষ্টি করুন, যেন আপনাকে কারো ওপর নির্ভরশীল হতে না হয়। আপনি যদি নিজের পরিচয় সৃষ্টি করে উপার্জন করতে পারেন, যদি আপনার জীবনের একটা লক্ষ্য থাকে, তাহলে আপনাকেই মানুষ খুঁজবে। কারণ কেউ বোঝা বহন করতে চায় না। সবাই অ্যাসেট চায়। আপনি যদি অ্যাসেট হতে পারেন, আপনার খুঁজতে হবে না, আপনাকেই মানুষ খুঁজে বের করবে।

প্রশ্ন : পড়াশোনা শেষ করে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া ভালো, নাকি পড়াশোনা শেষ হোক বা না হোক সমাজের চোখে গ্রহণযোগ্য বয়সের মধ্যে বিয়ে করা অধিক বাস্তবসম্মত? আমি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের কথা ভাবছি। কিন্তু সবাই আমাকে বিয়ের বিষয় মাথায় রাখতে বলছে। কোন দিকটা বিবেচনা করে আমার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত?

উত্তর : বিয়ের পরে আপনি যত খুশি পড়েন, ডিগ্রি নিতে পারেন। মেয়েদের বিয়ের জন্যে অনার্স পাশ করার পর এটা একটা উপযুক্ত সময় বলা যেতে

পারে। মূল বিষয়টা হলো আপনার প্রতি আগ্রহ থাকতে থাকতে বিয়ে করা ভালো। ছেলে হলেও একই কথা প্রযোজ্য। ছেলেও যদি উচ্চতর শিক্ষা নিতে নিতে ৫০ বছর বয়স পার করে দেয়, তখন কোনো মেয়ে তো তাকে বিয়ে করতে চাইবে না। অতএব বিয়ে করলে সময়মতো করা উচিত। তা না হলে পরে অনুতপ্ত হতে হয়।

প্রশ্ন : আমি খুব অসহায় অবস্থায় আছি। তাই ভাবছি, বিয়ে করলে আমার একাকিত্ব দূর হবে। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে বিয়ে করতেও ভয় পাই। মনে হয়, বউকে খাওয়াব কী?

উত্তর : পুরুষ মানুষ অসহায় হয় কীভাবে? এই যুগে মেয়েরাও নিজেদেরকে অসহায় মনে করে না। অনেক মেয়ে বরং হাউজ হাজবেন্ড রাখার কথা চিন্তা করে, সেখানে পুরুষ হয়ে চিন্তা করছেন আপনি অসহায়! আগে তো ভয় দূর করবেন। সাহস সৃষ্টি করবেন। তা না হলে আপনাকে কে বিয়ে করবে?

আপনি বিয়ে করবেন স্ত্রীকে পরিপূর্ণ ভরণপোষণের শর্তে। আর বলছেন যে, খাওয়াব কী? আগে স্ত্রীকে ভরণপোষণের নিয়ত ঠিক করবেন। তারপরে বিয়ে করবেন।

প্রশ্ন : আমি একজনকে পছন্দ করি। দুজনই বিয়ের প্রয়োজন বোধ করছি। কিন্তু সে বেকার। এদিকে আমার পরিবার জন্মের পর থেকেই আমার দায়িত্ব নেয় নি। আমিই বরং তাদের দায়িত্ব নিই। এখন বিয়ে করলে আমরা পড়ার পাশাপাশি উপার্জন করব। আর আমার শ্বশুর আমাদের কিছু দায়িত্ব নেবেন বলেছেন। এ অবস্থায় আমরা কি বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল করছি?

উত্তর : আগেও সংসারের দায়িত্ব নিয়েছেন, ঠিক আছে। কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর দায়িত্বও আপনাকে নিতে হবে, যেহেতু সে বেকার। হবু শ্বশুর দায়িত্ব নেবেন এই চিন্তা করে ছেলেটিকে বিয়ে করতে যাওয়াটা বোকামি হতে পারে। কারণ বাস্তবতা হলো, বেকার ছেলের বউয়ের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেন এরকম শ্বশুর সমাজে খুব কম।

আপনি যাকে পছন্দ করেন, তার কল্যাণে যদি নিজেকে নিবেদিত করতে চান, তাহলে ঠিক আছে। আপনি জেনেশুনে দায়িত্ব নিতেই পারেন। সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে—কোথায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন আর বাস্তবতা কেমন হতে পারে!

প্রশ্ন : আমি চাকরি করি, বেতন মোটামুটি। পরিবারে বেশ কজন ভাইবোন। নিজের কোনো বাড়ি নেই, সে-ক্ষেত্রে আমার কি এখন বিয়ে করা উচিত? নাকি নতুন বাড়ি করে কিংবা ফ্ল্যাট কেনার পর বিয়ে করা উচিত? আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর : আপনার আয় মোটামুটি। নতুন বাড়ি করে বা ফ্ল্যাট কিনে বিয়ে করতে করতে আপনার বিয়ের বয়স তো পেরিয়ে যাবে। আসলে এই যে বাড়ি করা বা ফ্ল্যাট কেনা, এটা যেন নেশায় পরিণত হয়েছে। আগে বাড়ির চিন্তা ছিল, এখন ফ্ল্যাটের চিন্তা। অধিকাংশ মানুষই মনে করে, একটা ফ্ল্যাট কিনতে বা বুকিং দিতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। এ সুযোগে ফ্ল্যাট ব্যবসায়ীরাও জমজমাট ব্যবসা করছে এবং অনেকেই তাদের খপ্পরে পড়ছে।

ফ্ল্যাট বুকিং দেয়া বা ফ্ল্যাট কেনাটা আসলেই বোকামি। যারা বাড়ি বানায় তাদের জায়গার মালিকানা অন্তত থাকে। কারণ আপনি যে ফ্ল্যাট কিনলেন, ৩০ বছর পর তো ওটার তেমন কিছুই থাকবে না। জরাজীর্ণ হয়ে যাবে। আর ঢাকা শহরের যে অবস্থা, যদি একবার ভূমিকম্প হয় তাহলে আপনার ফ্ল্যাট একেবারে মাটির সাথে মিশে যাবে। কারণ বেশিরভাগ ফ্ল্যাটেরই নির্মাণ সামগ্রী খুব নিম্নমানের।

একথা আমি আজ বলছি না, যখন এস্ট্রলজার ছিলাম, তখনও ক্লায়েন্টদের বলতাম—এই বোকামিটা করবেন না। হুজুগে পড়ে ফ্ল্যাট কিনবেন না। কারণ ৭০/৮০ লক্ষ থেকে এক/ দেড় কোটি টাকা খরচ করে আপনি ফ্ল্যাট কেনার সিদ্ধান্ত নিলেন, এরপর কিস্তি দেয়া শুরু করলেন। এর মধ্যে আপনার নিজের হয়তো ৫-১০ লাখ টাকা। বাকিটা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে ঋণ অথবা শ্বশুরবাড়ি থেকে নয়তো ব্যাংক ঋণ।

রিয়েল স্টেট কোম্পানিগুলো আপনাকে উদ্বুদ্ধ করবে যে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিন। কারণ ব্যাংকের সাথে তাদের আবার যোগাযোগ থাকে। আপনাকে বড়শিতে আটকাতে পারলে তাদের সবার জন্যেই লাভ। কিস্তি পরিশোধ করতে আপনি একদিকে ঋণ নিচ্ছেন, আবার ব্যাংকে সুদও দিতে হচ্ছে।

রসুলুল্লাহ (স) সবসময় ঋণ থেকে পানাহ চেয়েছেন। কিন্তু আপনি যে ঘরের মালিক হতে যাচ্ছেন, সেটার মধ্যে ঋণ ঢুকল, সুদও ঢুকল। সুদ যখন ঢোকে, তার মধ্যে কোনো বরকত থাকে না। আর ঋণ সবসময় মানুষের পেরেশানি সৃষ্টি করে। আপনি হয়তো ব্যাংক থেকে ঋণ নিলেন ৩০ লক্ষ বা ৫০ লক্ষ টাকা। সুদসহ এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল ৮০ লাখ টাকা। আর ব্যাংক যখন কিস্তি কেটে নেয়, তখন আসল যদি ১৫ শতাংশ কাটে, সুদ কেটে

নেয় ৮৫ শতাংশ! তারা সুদ আগে কাটতে থাকে অর্ধেক সময় পর্যন্ত। সুদ শোধ হলো ৮০ শতাংশ এবং আপনি সাত/ আট বছর কিস্তি শোধ করার পর দেখলেন, আসল সেই আসলের মতোই রয়ে গেছে!

এটা কিন্তু আপনাকে দিতেই হবে। যতদিন যাবে চাপ বাড়তে থাকবে, টেনশন বাড়তে থাকবে। এত টাকা কোত্থেকে আসবে? ব্যস, আপনার শান্তি শেষ হয়ে গেল। আর আপনি যদি কোনো প্রতারক রিয়েল স্টেট ব্যবসায়ীর পাল্লায় পড়েন, তাহলে তো আম-ছালা সবই গেল। কারণ অনেকে আছেন, যারা বহু বছর ধরে কিস্তির টাকা দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ফ্ল্যাট বুঝে পাচ্ছেন না। ফ্ল্যাট কিছুদূর হয়ে আটকে আছে নয়তো দখল বুঝিয়ে দিচ্ছে না—এরকম ঘটনাও কম নয়।

আমরা ধরে নিলাম, আপনি খুব সৌভাগ্যবান, ফ্ল্যাট বুকিং দিলেন এবং পেয়েও গেলেন। কিন্তু কোথায় কিনলেন? আজকাল এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে ফ্ল্যাট হচ্ছে না। অমুক গলির কোনো এক পাঁচ তলার অমুক কোণায় আপনার ফ্ল্যাট হলো। কিন্তু কিছুদিন পর আপনার আর পছন্দ হচ্ছে না। যে দামে আপনি কিনেছিলেন, বিক্রি করতে গেলে দাম পাবেন তার অর্ধেক। তাই সেটাও পারছেন না। এজন্যেই কথায় বলে—কিনতে গেলে পাগল, বেচতে গেলে ছাগল।

আবার হয়তো দেখা গেল, আপনি যে ফ্ল্যাট নিয়েছেন তার পাশের ফ্ল্যাটের মালিক এক সন্ত্রাসী। সে মধ্যরাতে বাসায় ফেরে আর দরজায় লাথি মারতে থাকে। ঘুম ভেঙে আপনার হয়তো মনে হয়, আপনার দরজাই ভেঙে ফেলবে কিনা। কিংবা দেখলেন, আপনার প্রতিবেশী এক মাতাল এবং সে প্রতিরাতে বউ পেটায়।

অথচ ভাড়া বাসা হলে আপনি কিন্তু অন্যত্র চলে যেতে পারতেন। নতুন বাসা ভাড়া নিতে পারতেন। কিন্তু এখানে সে সুযোগ নেই। আগে অন্তত এ-ক্ষেত্রে আপনি ছিলেন স্বাধীন। কিন্তু ফ্ল্যাটের মালিক হওয়ার পর সেই স্বাধীনতাটুকুও হারালেন। আর সোয়া কোটি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনলেন, ভাড়া দিতে গেলে মাসে ৩০/৪০ হাজার টাকার বেশি ভাড়া পাবেন না।

অর্থাৎ ফ্ল্যাট বুকিং দিচ্ছেন আপনি, কিন্তু লাভটা হচ্ছে রিয়েল স্টেট কোম্পানিগুলোর। তারা ঝুলাচ্ছে কলা আর বিক্রি করছে মূলা। আপনিও কলা ভেবে আসলে মূলাই নিচ্ছেন। অতএব সবসময় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। আল্লাহ যে মস্তিষ্কটা দিয়েছেন সেটা ব্যবহার করুন। টাকা সঞ্চয় করুন।

আরেকটি বিষয় হলো, আগে আপনি যে পরিমাণ দান করতেন, যাকাত দিতে পারতেন, ফ্ল্যাট কিনতে গিয়ে সেই সুযোগ আর আপনার থাকবে না।

কারণ আপনার হাতে তো নগদ অর্থ নেই। প্রতি মাসের কিস্তি শোধ করতেই তো হিমশিম অবস্থা। আর যখন যাকাত নেই, দান নেই, তখন আপনার জীবনে শান্তি আসবে কীভাবে? তাই জীবনে যদি শান্তি চান, তবে কখনোই কোনো ব্যাপারে প্ররোচনায় প্রলোভনে এবং হুজুগে গা ভাসিয়ে দেবেন না। আগে একসময় বলা হতো যে, ঢাকা শহরে কেউ বাড়ি বানাতে গেলে তার হার্ট অ্যাটাক হয়। এখন শুনি যে, যারা ফ্ল্যাট কিনতে যাচ্ছেন, তাদেরও নাকি একই অবস্থা।

এবার আসি আরো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে। অনেকে মনে করেন, বাড়ি বানালে বা ফ্ল্যাট কিনলে সন্তানরা অন্তত ভালো থাকবে। ওদের জন্যে একটা আর্থিক নিরাপত্তা থাকবে। কিন্তু ততদিনে ফ্ল্যাটের টাইলস জায়গায় জায়গায় খসে পড়তে শুরু করবে। পিলারগুলো দুর্বল হয়ে ধসে পড়ার অবস্থা হবে।

সবচেয়ে বড় কথা, আপনার রেখে যাওয়া ফ্ল্যাটে—ওইটুকু গণ্ডির মধ্যেই আপনার সন্তান তখনই তার জীবন পার করবে, যদি সে হতভাগা হয়। এর মানে সন্তানকে আপনি উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারেন নি, সন্তান আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। সন্তানকে যথার্থ জ্ঞানী ও আলোকিত মানুষ হিসেবে এবং দক্ষতা ও যোগ্যতায় উপযুক্ত করে গড়ে তোলা পর্যন্তই মা-বাবার দায়িত্ব। বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিকানা বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া নয়।

তাই ফ্ল্যাট নামক চোরাবালির মধ্যে পড়বেন না। জীবনটাকে অহেতুক জটিল করবেন না। চেষ্টা করুন জীবনকে যতটা সম্ভব সহজ করতে। যত সহজ করবেন, তত শান্তিতে থাকবেন, স্বস্তিতে থাকবেন।

আর আপনাকে কেন নতুন বাড়ি বানিয়ে বিয়ে করতে হবে? নতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ছাড়া কেউ কি বিয়ে করছে না? একটা কথা মনে রাখবেন, যদি বিয়ে করার প্রয়োজন মনে করেন, সময়মতো বিয়ে করবেন এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে থাকবেন। এটাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

বিয়ের ব্যাপারে দ্বিধা

প্রশ্ন : আমি একজন প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা। কিন্তু বর্তমান সামাজিক অবস্থা দেখে বিয়ে করতে ভয় হয়। যদি স্ত্রীর সকল চাহিদা পূরণ করতে না পারি বা দুর্নীতিগ্রস্ত হতে হয়! আমার পক্ষে দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়াও সম্ভব নয়।

উত্তর : স্ত্রীর ব্যাপারে এভাবে কল্পনা করা উচিত নয় যে, স্ত্রী হলেই তার অনেক চাহিদা থাকবে। আমরা দেখেছি, শতকরা ১০ ভাগ ব্যতিক্রম বাদে,

মেয়েরা যদি নিশ্চিত হয় যে, স্বামী তাকে ভালবাসে, তার প্রতি মমতাময়, তাকে অনুভব করে এবং তার কষ্ট বোঝে—শতকরা ৯০ ভাগ মেয়ে এর অতিরিক্ত আর কিছু চায় না।

অনেক সময় তারা অনেক কথা বলে—এটা চাই, ওটা চাই। এটা মুখে বলে। আসলে সে চায় যে, স্বামী তাকে ভালবাসুক। আপনি যেহেতু দুর্নীতিগ্রস্ত হতে চান না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার এ ভালো ইচ্ছায় সহযোগিতা করবেন। মনছবি দেখুন যে, এরকম স্ত্রী পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ছোটবেলা থেকেই বিয়ে ব্যাপারটিকে আমার অসহ্য লাগে। আমি বড় কিছু করতে চাই। কিন্তু বিয়ের পর একজন নারীর অনেক ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমার মনে হয়, এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি আমার জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলব। মানসিকভাবে বিয়ের জন্যে প্রস্তুত হতে পারব বলে আমার মনে হয় না। আমি বিয়ে করতে চাই না। আমি কি ঠিক ভাবছি?

উত্তর : এখানে কথা কিন্তু দুটি। এক হলো, আপনি বড় কিছু করতে চান এবং বিয়েকে মনে করছেন সেটার পথে প্রতিবন্ধক। এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি যেটা ভালো মনে করবেন, সেটাই আপনি করবেন। আমরা শুধু এটা বলতে পারি যে, বড় কিছু করেছেন এমন বহু মানুষই বিয়ে করেছেন। আবার বিয়ে করে নি কিন্তু বড় কিছুও করে নি, এমন অনেক মানুষও আছে। বিয়ের সাথে বড় কাজ করা না-করার সম্পর্ক খুব বেশি নয়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, আপনি মনে করছেন—বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আপনি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলবেন। আমরা এ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। একজন স্বামীর দায়িত্ব আপনি নিতে পারবেন না, একজন বাবার এবং মায়ের দায়িত্ব নিতে পারবেন না, তাহলে বড় কাজের দায়িত্ব কীভাবে নেবেন? আপনার কথা শুনবে কিনা, আপনি তাদের মোটিভেট করতে পারবেন কিনা, এটা তো নির্ভর করছে আপনার প্রজ্ঞার ওপর।

তারপরও আপনি যখন নিজেকে বিয়ের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত মনে করবেন, তখনই আপনার বিয়ে করা উচিত। নিজের মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া বিয়ে করা মানে হচ্ছে, যার সাথে বিয়ে হচ্ছে তাকে প্রবঞ্চিত করা।

প্রশ্ন : আমি একজন পালিত কন্যা। আমার খুব ভয় আর টেনশন হয়—পালিত মেয়ে শুনে তা মেনে নিয়ে কোনো ছেলে আমাকে বিয়ে করবে কিনা।

উত্তর : আপনি তো সৌভাগ্যবান! আপনি তাদের নিজের সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও তারা আপনাকে নিজের সন্তানের মতো লালনপালন করেছেন। তাই যাকে বিয়ে করবেন, সবকিছু খুলে বলবেন। লুকোনোর কী আছে? যে বিয়ে করতে আসবে সে জেনেই আসবে যে, আপনি পালিত। এতে আপনার তো কোনো ভুল নেই, কোনো অন্যায় নেই। বরং আপনি এই মা-বাবার চোখের মণি হয়েছেন। একটা পরিবার পেয়েছেন। যারা আপনাকে দত্তক নিয়েছে, তারা আপন সন্তানকে যেমন আদর-যত্ন করতেন, আপনাকে তার চেয়ে কম আদর করেন নি। কম করলে আপনি এখানে আসতে পারতেন না।

শোকরগোজার হোন যে, 'আল্লাহ! তোমার কাছে শুকরিয়া করি, একটি পরিবার আমাকে এ পর্যন্ত আসতে সাহায্য করেছে'। সবসময় এটা নিয়ে ভেতরে আনন্দ অনুভব করুন। শুকরিয়ার অনুভূতি লালন করুন যে, আমি মা-বাবার স্নেহ পেয়েছি। অর্থাৎ সবকিছু মিলিয়ে আগে নিজেকে নিজে গ্রহণ করুন। সহজভাবে নিন পুরো বিষয়টি। তাহলে অন্যেরাও বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করবে।

আর সত্য গোপন করে কখনো কাউকে বিয়ে করবেন না। কারণ এটা জানাজানি হবেই। তাই আগেই সত্যটা জানান। আপনাকে যে বিয়ে করবে সে সবকিছু জেনেই বিয়ে করবে এবং আনন্দের সাথে করবে—এ মনছবিই সবসময় দেখবেন।

প্রশ্ন : আমার বয়স ২৭। নানা প্রতিবন্ধকতায় গ্রাজুয়েশনও শেষ করতে পারি নি। আগামী বছর আমার পড়াশোনা শেষ হবে। পরিবারের বড় মেয়ে হওয়া ও মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে আমার বাসা থেকে বিয়ের জন্যে খুবই চাপ দিচ্ছে। কিন্তু আমি উচ্চতর শিক্ষার জন্যে দেশের বাইরে যেতে চাই। বিয়ের জন্যে এখনো নিজেকে প্রস্তুত মনে হয় না। এই অবস্থায় পরিবারের সাথে আমার দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। আমি কী করতে পারি?

উত্তর : এটা হচ্ছে এখনকার ছেলেমেয়েদের একটি বড় সমস্যা—উপযুক্ত বয়সেও নিজেকে বিয়ের জন্যে প্রস্তুত ভাবতে পারছে না। আপনার বয়স ২৭ বছর। আপনি গ্রাজুয়েশন শেষ করবেন আগামী বছর। তারপরে বিদেশে যাবেন উচ্চতর পড়াশোনার জন্যে। তখন আপনার বয়স হবে ২৮। বিদেশে গিয়ে উচ্চতর পড়শোনা করতে করতে কমপক্ষে আরো চার বছর। বয়স হবে ৩৩ বছর। তখন স্বাভাবিকভাবে আপনাকে যারা বিয়ে করতে চাইবে, তাদের বয়স হবে ৪০ বছরের ওপরে।

মনে রাখবেন, সবকিছুর একটা বয়স আছে। একটা বয়সে যেভাবে প্রস্তাব আসে, সেই বয়সটা পার হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আর সেভাবে প্রস্তাব আসে না। ২৭ বছরে যদি নিজেকে যথেষ্ট ম্যাচিউর মনে না করেন, তাহলে তো ৭৭ বছরেও আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।

বিয়ে করা বা না-করা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু করলে সময়মতো করতে হবে। তা না হলে পরে পস্তাতে হতে পারে। আর যদি প্রিন্সের মতো কাউকে খোঁজেন, তো আপনাকেও প্রিন্সেস হতে হবে। বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে আপনার এটা খুব ভালো সময়। বিদেশ থেকে এসে বিয়ে করা আপনার জন্যে খুব কঠিন হয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন : কোনো ছেলেকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু যখন আমার বিয়ে হবে তখন সেই ছেলেকে আমি কীভাবে বিশ্বাস করব?

উত্তর : তাকে তো ছেলে হিসেবে বিশ্বাস করবেন না, স্বামী হিসেবে বিশ্বাস করবেন। তবে বিশ্বাস করার আগে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে নেবেন। আর যখন বিশ্বাস করবেন সেখানে কোনো ফাঁক রাখবেন না। ১০০ ভাগ বিশ্বাস করবেন। তাহলে দেখবেন বিশ্বাসের মূল্য আপনি পাচ্ছেন।

প্রশ্ন : আপনি বলেছিলেন প্রেম না করতে। তাই আর প্রেম করা হলো না। এদিকে বিয়ের বয়সও পার হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে করতে গেলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। গুরুজী, এখন কী করব? নতুন করে প্রেম শুরু করে বিয়ে করব নাকি এমনিই বিয়ে করব?

উত্তর : বিয়ে করতে গেলে ভয় পাওয়ার কী আছে? এটা হচ্ছে নিজের ওপরে আস্থাহীনতা। আমি প্রেম করতে না করেছি, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাব দিতে তো না করি নি কখনো। কেউ প্রস্তাব দিলে ভালো-মন্দ বুঝেশুনে রাজি হতে তো 'না' করি নি। অতএব দেখবেন, শুনবেন এবং বিয়ে করবেন।

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে প্রচণ্ড ভালবাসি। আমাদের সম্পর্ক অনেক দিন ধরে। হঠাৎ একটু ভুল বোঝাবুঝির কারণে আমার সাথে ওর যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আমার অজান্তে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। এখন ওর সাথে আবারো যোগাযোগ হচ্ছে আমার। এমন পর্যায়ে চলে গেছি, না পারছি আমি ওকে ভুলতে, না সে আমাকে ভুলতে পারছে। এখন সে বলে, তার পরিবারে বিয়ের

প্রস্তাব দিতে। আবার বলে, দিও না। ওকে ভুলে থাকার জন্যে আমি সব ধরনের পথ অবলম্বন করেছি, এমনকি দেশের বাইরেও থেকেছি। আমি মানসিকভাবে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভুগছি। এদিকে আমার ব্যবসা ও চাকরি দুটোই খারাপের দিকে যাচ্ছে দিন দিন। আমি কী করব? এ থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : আপনি বোকার মতো আচরণ করছেন। দেশের বাইরেও থেকেছেন। এগুলো তো সব সিনেমার ব্যাপার। একটা মেয়েকে পাওয়ার জন্যে পুরুষ মানুষের এত মিনমিন কিনকিন করতে হবে কেন? ব্যবসা ও চাকরিতে খারাপ করতে হবে কেন? এত মূল্যবান জীবন তো দেবদাস হয়ে অপচয় করার জন্যে নয়। ওগুলো উপন্যাসে বা সিনেমাতে হয়। আপনি যদি মনোযোগ না দেন, ব্যবসা চাকরি সব খারাপের দিকেই যাবে।

কোনো পুরুষের মধ্যে এই মাত্রার সিদ্ধান্তহীনতা থাকা উচিত নয়। মেয়েটিকে যদি বিয়ে করতে চান, সাহস করে প্রস্তাব নিয়ে তার পরিবারে যাবেন। সরাসরি তার মা-বাবাকে বলবেন যে, 'তার সাথে আমার পরিচয় আছে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। অবশ্য তার মত না থাকলে তো ঠিক আছে। আপনারা ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাবেন।'

অর্থাৎ তারা বিয়ে দিক বা না দিক, শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। ভালবাসা প্রত্যাখ্যাত হতেই পারে, কিন্তু এটাকে সহজভাবে নিলেই হয়। জীবনকে কখনো জটিল করতে হয় না। আমরা সবসময় বলি, আপনার অধিকার আছে প্রস্তাব দেয়ার, একইভাবে যাকে প্রস্তাব দিলেন তার অধিকার আছে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করার। সমানে সমান।

প্রত্যাখ্যাত হলে একটা হাসি দিয়ে বলবেন যে, আল্লাহ বাঁচিয়েছে! হয়তো সে আমার জন্যে কল্যাণকর ছিল না। এই প্রত্যাখ্যান যদি বিয়ের পরে হতো, তাহলে ঝামেলা আরো বেশি হতো। জীবন তো একটাই—কারো জন্যে বসে থাকার জন্যে নয়। আপনার জীবন আপনাকে যাপন করতে হবে। হায় আফসোস করে কোনো লাভ নেই। বিয়ের সম্পর্ক একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এটাকে স্বাভাবিকভাবেই নেবেন।

প্রশ্ন : আমি একজনের সাথে প্রায় দুই বছর ধরে চলছি। দুই পরিবারের সম্মতিতে আমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছেলেও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু সেই ছেলেকে আমার ভালো লাগে না। আমি তাকে বলেছি, বিয়ে হলেও আমি তাকে মেনে নিতে পারব না। এরপরও সে বিয়েতে আগ্রহী। কিন্তু আমি বিয়ে করতে চাই না। তাকে বিয়ে করা কি আমার উচিত হবে?

উত্তর : এগুলো হচ্ছে আজকালকার ভার্চুয়াল রিয়ালিটির মতো একটা অবাস্তব কল্পনার মধ্যে ঘুরে বেড়ানো। আপনি যদি তাকে বিয়েই না করবেন, তাহলে তার সাথে দু'বছর ধরে কেন ঘোরাঘুরি করছেন? আগেই তাকে সরাসরি বলা উচিত ছিল যে, আমার পছন্দ হচ্ছে না। আমি বিয়ে করব না। আপনি পছন্দ করেন না, বিয়ে হলে তাকে মেনে নিতে পারবেন না, আবার তার সাথে ঘোরাঘুরি করবেন, এটা তো পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। কবুল না করলে তো ধর্মমতে বিয়েই হবে না। কারণ আপনি মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। এটা তো ছেলেখেলা নয়।

যাদের মনে এরকম অস্থিরতা থাকে, তাদের জীবনে কখনো সুখ ধরা দেয় না। এখনকার অনেক মেয়ের কষ্টের মূল কারণ হচ্ছে এটা। কারণ আমাদের সমাজব্যবস্থাটা এমন যে, ছেলের গায়ে দাগ পড়ে না, দাগ পড়ে মেয়ের গায়ে। বলাই হয় যে, ছেলের কালি হচ্ছে গঙ্গা জলের বালি! অতএব এই ধরনের নোংরামি আর দ্বিচারিতা করবেন না। যাকে বিয়ে করবেন না তার সাথে চলবেন না।

বিয়ে ॥ মা-বাবার দায়িত্ব

প্রশ্ন : সন্তানদের পছন্দের ওপর ছেড়ে দিলে তো তারা কলেজ পড়াকালীন যাকেই পছন্দ, তাকেই বিয়ে করতে চাইবে। তাদের চোখে তখন রঙিন চশমা থাকে, তাই সবকিছুই ভালো লাগে। বিয়ের পর ছেলেরা যে বদলে যায়, সংসার করা যে কত দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার—এসব তাকে কে বোঝাবে?

উত্তর : আপনি নিশ্চয়ই মেয়ের বাবা অথবা মা। বিয়ের পর ছেলেরা বদলে যায়, এটি যদি আপনি আপনার মেয়েকে বোঝাতে না পারেন, তাহলে আর কে বোঝাবে? ছোটবেলা থেকেই যদি তাকে আত্মপ্রত্যয়ী করতে পারেন এবং তার মা-বাবার বাড়িই যে তার শিকড়—এই মনছবি যদি তাকে দিতে পারেন, তাহলে এরকম ভুল করার সম্ভাবনা খুব কম। ছেলে বা মেয়ের সামনে যদি লক্ষ্য বা মনছবি থাকে, তাহলে কলেজ পড়াকালীন বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলো তারাই করে যাদের জীবনে কোনো মনছবি নেই।

প্রশ্ন : আমার ছেলের বয়স ৩৪ বছর হলো। গত পাঁচ বছর যাবৎ তাকে বিয়ে করার কথা বলছি। সে কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না। উপযুক্ত মেয়েও পাচ্ছি না। এখন আমি তার ওপর রাগ করব, না কী করব, বুঝতে পারছি না।

উত্তর : ৩৪ বছরের ছেলের ওপরে রাগ করার কী আছে! ছেলে যদি বিয়ে করতে না চায়, খোঁজ নেবেন কেন করতে চাচ্ছে না। তার কোনো অসুবিধা থাকতে পারে, অপারগতা থাকতে পারে কিংবা কোনো পছন্দ থাকতে পারে। আগে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হোন, তার সাথে খোলাখুলি কথা বলুন। তারপরে মেয়ে খোঁজ করবেন। আর সে বিয়ে করলে আপনি যেহেতু খুশি হন, তাকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে মমতার সাথে বোঝান যে, বাবা, তুমি বিয়ে করলে আমি খুশি হবো।

প্রশ্ন : আমার মা আমার সঙ্গে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করছে এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছে। আমার অপরাধ—আমি মেয়ে এবং আমার বিয়ে হচ্ছে না। কারণ আমি দেখতে কালো এবং বয়স অনেক হয়ে গেছে। আমি খুব মনঃকষ্টে আছি, প্রতিরাতে কান্নাই আমার সঙ্গী।

উত্তর : আসলে বিয়ে না হওয়া নিয়ে আমাদের অনেক মা-বাবাই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে যান। অথচ এটা বোঝেন না যে, বিয়ে না হওয়া নিয়ে মেয়ের কষ্ট কিন্তু তার মা-বাবার চেয়ে কম নয়। আর বিয়ে করতে চাওয়ার পরও বিয়ে না হওয়া তো মেয়েটির দোষ নয়। এজন্যে তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দেয়া মানে তাকে রীতিমতো নির্যাতন করা। আর মেয়েকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা খুব অমানবিক এবং অবিবেচনাপ্রসূত। কারণ ১৪০০ বছর আগেই আল্লাহর রসুল (স) নারীকে দিয়েছেন সম্পত্তির অধিকার।

এখন প্রতিরাতে কান্না করে কোনো লাভ নেই। মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে নিজের পরিচয় সৃষ্টি করুন। স্বাবলম্বী হোন। তাহলেই আপনি সম্মানের স্থানে যেতে পারবেন। আর তেমন প্রস্তাব এলে বিয়ের ব্যাপারে গড়িমসি করবেন না। প্রতিদিন বিয়ের মনছবি করতে ভুলবেন না।

প্রশ্ন : সন্তানকে তার জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ কীভাবে দিতে পারি?

উত্তর : সন্তানকে যদি আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে আলাদা করে পরামর্শ দেয়ার কিছু নেই। জীবনের ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে ছোটবেলা থেকে গড়ে না তুলে শুধু বিয়ের ব্যাপারে বোঝালে হবে না। অন্যদিকে তাকে অনন্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুললে বিষয়টি সে এমনিই বুঝতে পারবে।

প্রশ্ন : আমার মেয়ে মাস্টার্স করেছে, কিন্তু বিয়ে করতে চায় না। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। তারপরও তার উচ্চতা এবং ওজন নিয়ে সে হীনম্মন্যতায় ভোগে। সাইকিয়াট্রিস্ট বলেছেন যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। তাছাড়া সে ছেলেদের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকে, অবশ্য এটা আমিই শিখিয়েছি।

উত্তর : আসলে আমরা সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতে পারি না। যেমন, যৌনতা বিষয়ে তারা যদি কোনো প্রশ্ন করে, বড়রা অধিকাংশ সময়ই তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। সে হয়তো তখন কুঁকড়ে যায়। একসময় সে বড় হয়। সব বুঝতেও পারে। কিন্তু ছোটবেলার ভীতিটা থেকেই যায়। যেমন, নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্ককে খুব খারাপ বলা হলো। কিন্তু একটা সময়ে সে বুঝতে পারল যে, এই সম্পর্কের প্রক্রিয়ায়ই তার জন্ম হয়েছে। ফলে সে বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলা উচিত, প্রতিটা কাজের একটা বয়স আছে। যখন বয়স হবে তখন এটা নিয়ে চিন্তা করবে। সন্তানকে বাস্তব বিষয়ে জ্ঞান দিতে হবে। বয়স অনুসারে তাকে বলতে হবে। অর্থাৎ সন্তান যে ভাষায় বোঝে তাকে সে ভাষায় বোঝাতে হবে এবং তার কৌতূহল মেটাতে আপনি আগ্রহী—এটা তাকে বোঝাতে হবে। নইলে সে এমন লোকের কাছে জানতে আগ্রহী হবে, যে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে ও বিকৃত তথ্য দিতে পারে।

এখন অভিভাবক হিসেবে আপনি মেয়ের জন্যে দোয়া করুন, যেন সে তার হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারে। আর কী কী কারণে বিয়ে করে তার নিজের একটা পরিবার গঠন করা প্রয়োজন, বিষয়গুলো তাকে বুঝিয়ে বলুন।

প্রশ্ন : আমার বিয়ের ব্যাপারে মা-বাবার কোনো প্রত্যাশা নেই। তারা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। একটা হলেই হলো। এটা কি অবিদ্যা?

উত্তর : এটিও একটি অবিদ্যা। নিজেদের খাওয়াদাওয়া তারা আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেন নি। আল্লাহ খাওয়ালে খাব, চাকরি-বাকরি করব না, রান্নাবান্না করব না—এটা তারা বলেন নি। বিয়ের ব্যাপারে মা-বাবাকে অবশ্যই উদ্যোগী হতে হবে। মেয়ের যেন ভালো বিয়ে হয়, সুপাত্রের সাথে যেন বিয়ে হয়, এজন্যে মা-বাবার দোয়া ও চেষ্টা দুটোই করা উচিত।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন বিয়ের ব্যাপারে সবসময় অপরপক্ষের কাছে সব তথ্য সরাসরি জানাতে। কিন্তু গুরুজী, প্রথমেই যদি মেয়ের কোনো শারীরিক

অসুস্থতা, ত্রুটি বা সমস্যার কথা বলা হয়, তবে কি অপরপক্ষ আর এগোবে? মনে তো হয় না। সে-ক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর : আমি সবসময়ই তথ্য গোপন করে বিয়ের বিপক্ষে। এটা একধরনের প্রতারণা। আর প্রতারণা করা অপরাধ। আমার পরামর্শ খুব সহজ। বিয়ে হচ্ছে একটা চুক্তি। এই চুক্তি করতে গিয়ে কোনো তথ্য গোপন করা উচিত নয়। কারণ বিয়ের পর সত্য বেরিয়ে আসবে। তখন অশান্তি হবে।

প্রশ্ন : আমরা চার বোন। আমি সবার ছোট। বড় বোনের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আমার পরিবার এত সময় নিয়েছে যে, পরবর্তী মেয়েদের বিয়ের বয়স যে পার হয়ে যাচ্ছে তা হয়তো অনুধাবন করতে পারেন নি মা-বাবা। আমার মেজো বোনের জন্যে গত পাঁচ বছর যাবৎ বিয়ের চেষ্টা চলছে। পাত্রের শিক্ষাগত যোগ্যতা, টাকা, বাড়ি, গাড়ি, উচ্চতা, দেখতে সুন্দর ও বয়স, কোনোটাই বাদ দেয়া যাবে না। এতগুলো চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কখনো পাত্রপক্ষ থেকে কখনো পাত্রীপক্ষ থেকে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান চলছেই। মেজো বোনের বর্তমান বয়স ৩৫ বছর। এদিকে সেজো বোনের বয়স ৩৩ বছর। আট বছর যাবৎ ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। পাত্রপক্ষ অনেক দিন ধরে বিয়ের জন্যে বলছে। বর্তমানে দুই মাসের মধ্যে যেন বিয়েটা হয়ে যায় এজন্যে খুব করে চাচ্ছে। আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে বহুদিন হলো। আমার বর্তমান বয়স ৩১ বছর। এখন সমস্যা হলো আমার মা-বাবা মেজো মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত অন্য মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন না। এ ব্যাপারে তারা কারো কাউন্সেলিং নেয়ার জন্যে প্রস্তুত না। এমনকি পরিবারে নিজেদের মধ্যেও তারা এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে আজ পর্যন্ত আসেন নি। মা-বাবাকে নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বললেই তারা বলেন, একে স্যাক্রিফাইস বলে না। স্যাক্রিফাইস করতে হলে ধৈর্য ধরতে হবে। আল্লাহ যখন ভাগ্যে রেখেছেন তখনই বিয়ে হবে। তারা মেজো মেয়ের জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমার বাবার বয়স হয়েছে। মায়েরও বয়স হয়েছে। অনেকটা সময় তারা ব্যস্ত থাকেন ব্যবসা ও সমাজকর্ম নিয়ে। প্রশ্ন হলো, মা-বাবার যে সিদ্ধান্ত, মেজো মেয়ের বিয়ে না দিয়ে উপযুক্ত পাত্র না পাওয়া পর্যন্ত অন্য মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন না—এই দৃষ্টিভঙ্গি কতটা যুক্তিসঙ্গত? এ-ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী? ৩১+ বয়সে নিজেদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলাটা স্বার্থপরতা বা জুলুম মনে করেন মা-বাবা। এখানে কে

কার ওপরে জুলুম বা স্বার্থপরতা করছে বলে আপনি মনে করেন? মা-বাবা যদি এখনো তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং আমরা বিয়ের সিদ্ধান্ত যদি নিজেরাই নিতে বাধ্য হই, তাহলে কি এটাকে সীমালঙ্ঘন বলবেন?

উত্তর : বিয়েটা আসলে একটা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন শারীরিক মানসিক সামাজিক এবং আত্মিক। কেউ যদি মনে করেন যে, না, বিয়ে আমার প্রয়োজন নেই, তার বয়স ৩০, ৩৫, না ৪০ হলো, এটা এ-ক্ষেত্রে অর্থহীন। তখন তার মা-বাবারও বিয়ের ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু কেউ শারীরিক কারণে, মানসিক কারণে বা সামাজিক কারণে যদি মনে করে যে, বিয়ের প্রয়োজন আছে, তাহলে মা-বাবার কর্তব্য হচ্ছে বিয়ের ব্যবস্থা করা।

এখানে যেটি ঘটেছে—যেহেতু চার বোন, অতএব বোঝাই যায় যে, প্রায় কাছাকাছি বয়সের সবাই। বড় বোনটিকে বাছবিচার করে বিয়ে দিতে গিয়ে অনেক সময় নিয়েছেন মা-বাবা। এদিকে বাকি মেয়েরাও ততদিনে আমাদের সমাজে বিয়ের স্বাভাবিক বয়সসীমায় পৌঁছেছে তো বটেই, কেউ কেউ সেটা পেরিয়েও গেছে। যাদের কারো কারো আবার বিয়ে ঠিকও হয়ে আছে কয়েক বছর ধরে। কিন্তু বড়কে রেখে ছোটকে বিয়ে দেবেন না—এ সিদ্ধান্তে অটল থেকে বড় মেয়ের জন্যে যেভাবে সময় নিয়েছেন, একইভাবে বাছবিচার করছেন মেজো মেয়ের জন্যে।

এখানেই এই মা-বাবার দৃষ্টিভঙ্গিগত ভ্রান্তি যে, তারা সবদিক বিবেচনা করতে পারছেন না, ভাবছেন একজন একজন করে। এ-ক্ষেত্রে যেটি করা উচিত তা হলো, বড়জনের বিয়ে যখন হবে তখন তো হবেই। কিন্তু যাদের বিয়ে এর মধ্যে ঠিক হয়ে আছে অর্থাৎ সেজো মেয়ে এবং ছোট মেয়ে—তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া।

তারপরও যদি মা-বাবা তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন এবং মেয়েরা নিজেদের বিয়ের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে বাধ্য হয়, এর দায়দায়িত্ব তখন মা-বাবার। কারণ যে মেয়েটির আট বছর ধরে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, অপেক্ষা করছে সে বিয়ের জন্যে, তার ওপরে তো এটা জুলুম হচ্ছে।

আর বরপক্ষের চাওয়াও খুব যুক্তিসঙ্গত। আট বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও যদি তাদের অপেক্ষা করতে বলা হয় তো সেটা যে-কারো জন্যেই মেনে নেয়া কষ্টকর। কারণ সামাজিক একটা ব্যাপার তো রয়েছে।

আরেকটা বিষয়ও মনে রাখতে হবে। সাধারণভাবে ডাক্তাররা বলেন, বয়স ৩০ হয়ে যাওয়ার পর সন্তান নিতে গেলে মেয়েদের শারীরিক জটিলতা হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এখন এই যে মেয়েদের বয়স ৩৫, ৩৩, ৩১

হয়ে গেছে, এর চেয়েও দেরি হয়ে গেলে তো এ-ক্ষেত্রেও অসুবিধা হতে পারে। সেটা তখন সৃষ্টি করবে আরেক জটিলতা। কারণ যে বিয়ে করবে সে-তো স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের পর সন্তান চাইবে। সন্তান দেয়া বা না দেয়া আল্লাহর হাতে, কিন্তু সে চাইবে—এটাই স্বাভাবিক।

অতএব আমরা সব ব্যাপারেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করব। আর বড়জনের আগে বিয়ে হবে, তারপর ছোটদের হবে—এটা সাধারণভাবে সমাজের একটা প্রথা। কিন্তু এটা যে অবশ্য পালনীয়, সেটা তো নয়। কারণ নিয়মের ব্যতিক্রম সবসময় হয়। অবস্থার প্রেক্ষিতে সবার জন্যে কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত এবং এটাই হচ্ছে মধ্যপন্থা।

সুতরাং আমরা প্রত্যাশা করব যে, মা-বাবা এমন কিছু করবেন না, যেন সন্তান নিজে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। বরং হাসিমুখে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবেন, যাতে তারা মা-বাবার দোয়া নিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে পারে। আর যদি তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়, তাহলে দায়টা কিন্তু অভিভাবকদের ওপরে বর্তাবে। কারণ তারা যথেষ্ট পরিমাণে ধৈর্যধারণ করেছে বলেই এ প্রশ্নটা এসেছে।

প্রশ্ন : পারিবারিকভাবেই আমার বিয়ে হয়। বর অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। বিয়ের পর আমার পরিবার জানতে পারেন, তিনি ওখানে ভালো জব করেন না। এখন আমার মা-বাবা চান, আমি তাকে তালাক দেই। তারা আমাকে এক আমেরিকাপ্রবাসী ডিভোর্সি ছেলের সাথে বিয়ে দেবেন। কিন্তু আমার বর ও তার পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো। আমি তালাক চাই না। আমার মা-বাবাকেও কষ্ট দিতে চাই না। আমার বর এখন ভালো জবের জন্যে চেষ্টা করছেন। আমার মা-বাবা তাকে ও তার পরিবারকে বিশ্বাস করেন না। তারা বলেন, মিথ্যা বলে যারা সম্পর্ক তৈরি করে, তাদের বিশ্বাস নেই। আমি আমার বরকে ভালবাসি, তিনিও। বাবা আমার শ্বশুরবাড়ি যাওয়াটা পছন্দ করেন না। শ্বশুর-শাশুড়ি আমাকে অনেক আদর করেন। আমি কী করব?

উত্তর : এখানে অনেকগুলো বিষয়। এক, বিয়েটা মা-বাবা দিয়েছেন। কিন্তু বিয়ের পর জানা গেল, ছেলেপক্ষ তথ্য গোপন করেছে। দুই, এখন আপনার মা-বাবা চাচ্ছেন এখানে ডিভোর্স করিয়ে আরেক প্রবাসী ডিভোর্সির সঙ্গে আপনাকে বিয়ে দিতে। তিন, আপনি আপনার স্বামীকে ভালবাসেন। আপনার ভাষ্য অনুযায়ী, তিনিও ভালবাসেন এবং আপনার শ্বশুর-শাশুড়িকে আপনি পছন্দ করেন। আপনার প্রতিও তাদের মমতা আছে। কিন্তু আপনার মা-বাবা

চান না, এদের সাথে আপনার আর যোগাযোগ থাকুক।

এখন আমরা একটা একটা করে পয়েন্ট বলি : প্রথমত, ছেলে এবং ছেলের পরিবার যে তথ্য গোপন করেছে, নিঃসন্দেহে অন্যায় করেছে। এজন্যে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত। বিয়েতে তথ্য গোপন করা একটি 'ক্রিমিনাল অফেন্স'। কিন্তু এখানে আপনার মা-বাবার দায়ও আছে। তাদের উচিত ছিল, বিয়ের আগেই খোঁজখবর নেয়া।

আমাদের অনেক মা-বাবা বিদেশি পাত্র শুনলেই হুঁশ হারিয়ে ফেলেন। ভাবখানা এমন যে, পারলে নিজেরা বিয়ে করে ফেলতেন! কাজেই এখানে দুদিক থেকেই অন্যায় হয়েছে। ছেলেদের তথ্য ভুল দেয়া যে-রকম অন্যায়, মা-বাবা আগে কেন ভালো করে খোঁজখবর নিলেন না, এটাও তাদের ভুল।

দ্বিতীয়ত, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর স্বামী বাইরে অড জব করে জানার পরও যখন তাকে ভালো মনের মানুষ মনে করলেন, আপনার প্রতি তার ভালবাসা অনুভব করলেন, শ্বশুর-শাশুড়িকে পছন্দ করলেন এবং আপনি তার স্ত্রী হয়ে থাকতে চাইলেন, তখন আপনার মা-বাবা আপনাকে জোর করছেন তালাক দেয়ার জন্যে। এটা মা-বাবার জন্যে অনুচিত একটি কাজ হচ্ছে। কারণ তালাকের সিদ্ধান্ত শুধু স্ত্রী বা স্বামীই নিতে পারে।

স্বামীর ভুলকে যদি স্ত্রী ক্ষমা করতে না পারে এবং সে যদি মনে করে যে, এ স্বামীর ঘর সে করবে না, তখন এ সিদ্ধান্ত সে নিতে পারে। মা-বাবা মেয়ের এ সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে পারেন। কিন্তু আপনি যেহেতু তালাক চান না আর জীবন যেহেতু আপনার, কাজেই সিদ্ধান্তটা আপনাকেই নিতে হবে।

তৃতীয়ত, মা-বাবা আপনাকে ছাড়িয়ে আরেক ডিভোর্সি ছেলের সাথে বিয়ে দেবেন। ওই ছেলে যে আমেরিকায় আরো তিনটা বিয়ে করে নি, সেই খবর কে জানে! এ-ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবেন, ডিভোর্সের ব্যাপারটি সবসময় স্বামী এবং স্ত্রী এই দুজনের সিদ্ধান্তে হওয়া উচিত। এটা পরিবারের পক্ষ থেকে চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। আপনি যদি মনে করেন, এই স্বামীর সাথে ঘর করবেন না—ঠিক আছে, আপনি আপনার জীবন নতুনভাবে গড়ে নিতে পারেন। কিন্তু কারো কথায় আপনার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : আমার আব্বা-আম্মা আমার বিয়ে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু তারা আমার মতামতের গুরুত্ব দিচ্ছেন না। অথচ ভাব করছেন এমন যে, তারা আমার মত নিয়েই সব করছেন। আমার চাওয়া তারা বুঝতেই চান না। তাদের মুখে এক আর অন্তরে আরেক। আমি এখন কী করব?

উত্তর : কারো অমতে কাউকে বিয়ে দেয়া যায় না। সে ছেলে হোক অথবা মেয়ে। আর আপনি যদি বিয়ে করতে না চান, এই জামানায় কোনো মা-বাবা জোর করে আপনাকে বিয়ে দিতে পারবে না। জীবন আপনার। আপনি যেহেতু মনে করছেন যে, এর সাথে বিয়ে হলে আপনি সুখী হবেন না, তাহলে নিজের মতকে বলিষ্ঠভাবে কিন্তু বিনয়ের সাথে প্রকাশ করুন।

প্রশ্ন : আমার বিয়ের জন্যে ছেলে দেখছে। ছেলে এবং ওদের পরিবারের সবাই খুব ভালো। বাসার সবাই রাজি। শুধু বাবা ও ভাইয়া রাজি না। তারা বলেন—ছেলের বংশপদবি চৌধুরী না। এই দৃষ্টিভঙ্গি কি সঠিক? আর আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে সেবামূলক কাজ করি কোয়ান্টিয়ার হিসেবে। বিয়ে হলে ইউএসএ যেতে হবে। তাতে কি আমি কোয়ান্টামের সাথে একাত্ম থাকতে পারব? আমি এখন কী করব?

উত্তর : প্রথমত, ছেলের বংশপদবি চৌধুরী না—এটা তো আর এই জামানায় কোনো সমস্যা হওয়া উচিত নয়। পরিবারের সবাই যদি ভালো হয়, ছেলে যদি ভালো হয়, তাহলে অসুবিধা কী? এই জামানায় ভালো পাত্র পাওয়া খুব কঠিন। কারণ আজকাল বেশিরভাগ ছেলে তো দায়িত্বই নিতে চায় না। দায়িত্ব ছাড়াই যদি ঘুরে বেড়ানো যায়, কে দায়িত্ব নিতে চায়? আর দোষ শুধু একা ছেলেদের নয়। ছেলেরা তো একা ঘুরে বেড়ায় না।

ছেলে বিয়ে করতে চাচ্ছে। আপনারাও মনে করছেন ছেলে ও তার পরিবারের সবাই ভালো। এ-ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিটা খুব পরিষ্কার যে, পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের সময় দেখতে হবে ভালো মানুষ কিনা, ভালো পরিবার কিনা। ভালো পরিবার, ভালো মানুষ হলে বংশপদবি যা-ই হোক, এটা বিষয় হওয়া উচিত নয়। এখন বাবা এবং ভাইকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান যে, 'আমার চৌধুরী দরকার নেই। আমার একজন ভালো মানুষ দরকার। আপনারা রাজি হয়ে যান।'

আমরা দোয়া করছি। আর ইউএসএ গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমরা সবসময় বলি, সারা পৃথিবী আমার। আমেরিকার মানুষ তো আমাদের চেয়ে দুঃখী। ওখানে অশান্তি আরো বেশি। তাদের টাকা আছে, সবরকম ভোগ্যপণ্য আছে। কিন্তু শান্তি নেই। সেখানে গিয়ে কোয়ান্টামের তরফ থেকে তাদেরকে শান্তির বাণী পৌঁছাবেন। আর ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট নিয়মিত ভিজিট করবেন, সাদাকায়ন এবং অনলাইন প্রোগ্রামগুলোতে অংশ নেবেন। ওখানে কোয়ান্টাম সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন।

প্রশ্ন : আমার বাবা প্রায়ই আমাকে বিয়ের জন্যে বকা দেয় ও আঘাত করে কথা বলে। আমার বয়স ২৩ বছর। আমি গ্রাজুয়েশন শেষ করে বিয়ে করতে চাই। বিয়ের জন্যে অনেক ছেলে দেখেছে। পাত্র দেখতে গেলে তাদের অনেকে আমাকে অপমান করেছে। বাবাকে কীভাবে বোঝাব?

উত্তর : বাবাকে বোঝানোর আগে তো নিজে বুঝতে হবে। অনেকে আপনাকে অপমান করেছে, তাদের জন্যে আপনার তো মায়া হওয়া দরকার যে, তারা ভদ্রতা বোঝে না। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের অভদ্রতাটা এখনই প্রকাশ পেয়ে গেছে। বিয়ের পরে যদি এই অভদ্রতা প্রকাশ পেত, তাহলে কী হতো! এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। আর তাদের জন্যে দোয়া করুন যেন আল্লাহ তাদেরকে সুন্দর ভাষায় কথা বলার শক্তি দান করেন।

তবে এই যে কথায় কথায় অপমানিত বোধ করা—আমাদের দেশের অধিকাংশ মেয়ের সমস্যা এটা। একটা বিষয় সবসময় মনে রাখবেন যে, আপনি অপমানিত বোধ না করলে কেউ আপনাকে অপমান করতে পারে না। আসলে যে কটুকথা বলে সে নিজেই নিজেকে অপমান করে।

প্রশ্ন : আমি শিক্ষাজীবনের শেষ প্রান্তে এবং সম্মানজনক চাকরি করছি। আমার বিয়ে করা প্রয়োজন। আমি যাকে বিয়ে করতে চাই সে আমার পূর্বপরিচিত এবং সে-ও আমাকে বিয়ে করতে আগ্রহী। কিন্তু আমরা কেউ-ই আমাদের পরিবারকে বিষয়টি বলতে পারছি না এবং আমরা দুজনেই মনে করছি যে, আমাদের পরিবার হয়তো আরো প্রায় সাত বছর পরে আমাদের বিয়ে করাতে রাজি হবেন। এমতাবস্থায় আমাদের পরিবারকে বিয়ের কথা বলা যাচ্ছে না এবং আমরা দুজনও পারছি না দূরত্ব বজায় রাখতে। দিনের পর দিন এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে আমরা এর পরিণতি নিয়ে শঙ্কিত।

উত্তর : মা-বাবাকে এবং পরিবারকে বিনয়ের সাথে বলুন, দেখ, আমার বিয়ের বয়স হয়েছে। আমি বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করছি। আমি বিয়ে করতে চাই। আর যদি বলতে না পারেন, মাকে চিঠি লিখুন, বাবাকেও লিখুন। কারণ এটা তো আপনার ধর্মীয় নৈতিক মানবিক এবং বৈধ জৈবিক অধিকার।

আর বিয়েটা সবসময় মা-বাবাকে রাজি করিয়ে পারিবারিকভাবে হওয়া উচিত। কারণ বিয়ের জন্যে মা-বাবার দোয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবার দোয়া ছাড়া যে বিয়ে, তাতে কোথাও না কোথাও একটা ফাঁক থেকে যায়। অতএব

সবসময় চেষ্টা করবেন মা-বাবার সম্মতি নিয়ে বিয়ে করতে। আর দেখবেন, যাকে আপনি বিয়ে করবেন সে মানুষটা ভালো কিনা।

প্রশ্ন : আমার পরিবার যখন আমার জন্যে ছেলে দেখে তখন শুধু টাকাপয়সার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু ছেলে শিক্ষিত নয় এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও আমার মিল হচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে আমি যদি বলি 'আমার পছন্দ না', তাহলে খুব খারাপ ব্যবহার করে। বলে, ওদের অনেক টাকা আছে, না করছ কেন? এ অবস্থায় আমি কী করব, তাদের মতামতকে কি প্রাধান্য দেবো?

উত্তর : আসলে বিয়ের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখবেন, মানুষটা গুরুত্বপূর্ণ। তার শিক্ষা, তার কালচার, তার পারিবারিক পরিবেশটা গুরুত্বপূর্ণ। টাকা দিয়ে হয়তো অনেক কিছু কেনা যায়। কিন্তু সুখ আর শান্তি কেনা যায় না। তাই আপনি যদি সুখ-শান্তি চান, তাহলে ছেলে কেমন এটা দেখবেন।

আর এজন্যে যদি কিছু শুনতে হয় তো এখন শুনে নেয়া ভালো, বিয়ের পরে শোনার চেয়ে। বিয়ের পরে যদি সমস্যা হয়, তখন তো কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না। তাই মা-বাবা যখন টাকার কথা বলে, তখন আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্পষ্ট করে তাদেরকে বলুন। কিন্তু অবশ্যই বিনয়ের সাথে বলবেন।

মা-বাবার অমতে বিয়ে

প্রশ্ন : আমি একটি ছেলেকে পছন্দ করি। ছেলেটি ভালো এবং শিক্ষিত পরিবারের। সে সবসময় আমার বিপদে পাশে থেকে সাহস জুগিয়েছে। এদিকে মা-বাবাই আমার সবকিছু। আমি তাদেরকে কষ্ট দিতে চাই না। মা-বাবাকে ওর কথা বলার পর তারা কিছু বলেন নি। তারা মত না দিলে আমি কী করব?

উত্তর : মা-বাবাকে কষ্ট দিতে না চাওয়ার ইচ্ছাটা প্রশংসনীয়। কারণ যে ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে বিয়ে করেছে—অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, তাদের অধিকাংশেরই দাম্পত্য জীবনে কোথাও ভীষণ একটা ফাঁক রয়ে গেছে। নিজের পছন্দে বিয়ে করা সত্ত্বেও দেখা গেছে, তাদের সংসারে কোনো না কোনো কারণে অস্থিরতা, ভুল বোঝাবুঝি, অশান্তি লেগে থাকে। তাই বিয়ে মা-বাবার দোয়া এবং আশীর্বাদ নিয়েই করা উচিত।

আর ছেলেটি শিক্ষিত, ভালো পরিবারের—সুপাত্র সম্পর্কে ঢালাওভাবে এ বৈশিষ্ট্যটির কথা বলা হয়। এ নিয়েও চিন্তার অবকাশ আছে। প্রথমত, সার্টিফিকেটধারী শিক্ষিত মানেই কি ভালো এবং সৎ? চারপাশে দুর্নীতি ও অসততার দায়ে অভিযুক্তদের আমরা দেখি, তাদের অনেকেই তো শিক্ষিত এবং খানদানি পরিবারের লোকজন হিসেবে পরিচিত।

দ্বিতীয়ত, কাউকে ভালো লাগলে তার গুণগুলোই শুধু চোখে পড়ে, দোষ নয়। দোষ থাকলেও সেটাকে খুব বড় মনে হয় না। দোষ ধরা পড়ে বিয়ের পর, যখন ভালোলাগার রঙিন চশমা খুলে বাস্তবের মানুষটিকে দেখা হয়। কাজেই ছেলেটি ভালো—এ রায় নিজে না দিয়ে পরিবার এবং নির্ভরযোগ্য তৃতীয় পক্ষকে দিয়ে যাচাই করা ও সবরকম খোঁজখবর নেয়া উচিত।

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে পছন্দ করি। কিন্তু আমার মা-বাবা তাকে পছন্দ করেন না। এখন আমার প্রত্যাশা কী হওয়া উচিত?

উত্তর : এর আগেও আমরা বলেছি, যে-কারো যে-কাউকে ভালো লাগতেই পারে। ভালোলাগার মধ্যে দোষের কিছু নেই। পছন্দ করলেই যে বিয়ে করতে হবে, এটা ভ্রান্ত ধারণা। পারিপার্শ্বিকতা বিয়ের পক্ষে কিনা, সে বিষয়টিও দেখা প্রয়োজন। একজন মহিলাকে দেখে হয়তো খুব পছন্দ করলেন, বিয়ে করার সিদ্ধান্তও নিলেন। অথচ তিনি বিবাহিতা। তখন আপনার চাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত হলো না।

আর বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের পছন্দের পাশাপাশি মা-বাবার পছন্দকেও গুরুত্ব দেয়া উচিত। মা-বাবার অমতে বিয়ে করতে যাবেন না। বিয়ের ক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কিন্তু তা হতে হবে মা-বাবার দোয়া নিয়ে। কারণ মা-বাবার দোয়া এবং আশীর্বাদ ছাড়া বিয়ে সুখের হয় না। কোনো না কোনো ভুল বোঝাবুঝি সেখানে লেগেই থাকে।

অবশ্য মা-বাবা অনেক সময় তুচ্ছ কারণে অমত করেন। কোয়ান্টাম পরিবারের এক ছেলে এক মেয়েকে পছন্দ করেছে। মেয়ের সবদিক ঠিক আছে, শুধু গায়ের রং শ্যামলা বলে মা বেঁকে বসলেন। শেষে বুদ্ধি দিলাম, মায়ের সামনে গিয়ে কান্নাকাটি করার জন্যে। মা মত না দেয়া পর্যন্ত যেন কান্না না থামায়। শেষ পর্যন্ত মা রাজি হলেন। এখন তারা সুখী, মা-ও সুখী।

আবার মা-বাবা অনেক বাস্তব কারণেও অমত করতে পারেন। তারা যে দূরদৃষ্টি নিয়ে দেখছেন, আপনি হয়তো সেভাবে দেখছেন না। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি কথা শুনে আপনি আবেগে গলে গেছেন। আজকাল বিয়ের আগে

ছেলেমেয়েরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। অনেক মেয়ে সহজসরল দেখে একজনকে হাতের পাঁচ হিসেবে রাখে। যদি তার চেয়ে ভালো কাউকে পেয়ে যায়, তাহলে তাকে বাদ দেয়। আর না পেলে তাকেই সঙ্গে রাখে। তরুণ বয়সে সব কথা কানে এত মধুর লাগে যে, অনেক বাস্তবতা চোখ এড়িয়ে যায়।

মনে রাখবেন, বিয়ে সারাজীবনের একটি ব্যাপার। কিছু সময়ের দেখা, কথা বলার ব্যাপার নয়। বিয়ে ওয়ানডে ক্রিকেট নয়; আজকে করলেন আর শেষ হয়ে গেল। তাই যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে বুদ্ধিমান লোকদের পরামর্শ নিয়ে বিয়ে করা উচিত। শুধু পছন্দ বিয়ের জন্যে যথেষ্ট নয়। বিয়ে অবশ্যই সবসময় সম-সামাজিক, সম-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে হওয়া উচিত। বিয়ে শুধু দুজনের নয়, দুটো পরিবারের ব্যাপার। পছন্দ দুজনের হতে পারে, কিন্তু ছেলে হোক বা মেয়ে—মা-বাবার দোয়া নিয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, ছেলে ও মেয়ের পছন্দে পারিবারিকভাবে বিয়ে হতে হবে। ব্যাপারটি কি এরকম—ছেলে বা মেয়ে নিজে আগে পছন্দ করেছে, তারপর পারিবারিকভাবে বিয়ে দেয়া হয়েছে? তবে এটি কোনো অ্যাফেয়ার নয়। এ-ক্ষেত্রে পরিবারের অসন্তোষ দেখা দেয়। মা-বাবা কষ্ট পান এই ভেবে যে, বিয়ের আয়োজন তারা করলেও পছন্দ তো ছেলে বা মেয়ে নিজেই করেছে। এ ব্যাপারে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : এরকম হতেই পারে। কোনো মেয়েকে দেখে যদি পছন্দ হয়, সব খোঁজখবর নিয়ে যদি মনে করেন তাকে আপনি বিয়ে করতে পারবেন, পরিবারের সবাই যদি রাজি হয়, তাহলে দোষের কিছু নেই। আবার এমনও হতে পারে—পরিবারের সদস্যরা খোঁজখবর আনল, আপনিও দেখে পছন্দ করলেন। তাতেও দোষের কিছু নেই।

আগের দিনের মতো 'মা-বাবা দেখে এসেছেন, আমি আর কী দেখব'—এরকম ধারণা এখন চলে না। জীবন যেহেতু আপনিই যাপন করবেন, তাই সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। মা-বাবার উচিত—পাত্র বা পাত্রী উপযুক্ত হলে শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলা। কারণ এতে করে পরিশ্রম কমে যায়।

প্রশ্ন : আমরা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক। পরস্পরকে উপযুক্ত ভেবে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মা-বাবার আশীর্বাদ নিয়েই বিয়ে করতে চাচ্ছি। কিন্তু তারা কষ্ট পাচ্ছেন। কারণ যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, সে ডিভোর্সি এবং এক মেয়ে আছে। কিন্তু তার মধ্যে আমার পছন্দের অনেক গুণ আছে। কী করা উচিত?

উত্তর : সবকিছু দেখে যদি মনে হয় তার সাথে আপনার মিল হবে, তাহলে মা-বাবাকে বোঝানোর জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যান। ডিভোর্সি হওয়া তার পরবর্তী বিয়ের জন্যে কোনো অযোগ্যতা নয়। এটা কোনো অপরাধও নয়। এমনকি বিধবা হওয়াও কোনো অপরাধ নয়।

কিন্তু তার আগের সংসারের মেয়েটির বাবার দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে। শুধু পাত্রীর গুণ দেখলে চলবে না। এই মেয়ের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যেন কোনো অবহেলা না হয়, ভবিষ্যতে নিজের সন্তান হলেও যেন তাকে নিজ সন্তানই ভাবতে পারেন সে-বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন। আর অবশ্যই মা-বাবাকে রাজি করিয়ে তাদের আশীর্বাদ নিয়ে বিয়ে করবেন। ইনশাআল্লাহ আপনি দাম্পত্য জীবনে সুখী হবেন।

প্রশ্ন : মেয়ের সম্মতি ছাড়া তাকে জোর করে বিয়ে দেয়া যাবে না। কিন্তু মেয়ে যদি তার বাবা-মায়ের অমতে কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে কী করণীয়?

উত্তর : মেয়েটির জন্যে পরামর্শ হলো, মা-বাবার সম্মতি ছাড়া বিয়ে করা উচিত নয়। এরকম অনেক বিয়ের কথা আমরা জানি, যা মা-বাবার অনিচ্ছাতে হওয়ার ফলে সম্পর্ক সুখের হয় নি।

তবে অনেক ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, পাত্র মেয়ের যোগ্য হওয়ার পরও সঠিক বোঝাপড়ার অভাবে অভিভাবকরা আপত্তি করতে পারেন। সে-ক্ষেত্রেও মা-বাবার সম্মতি আদায় করা সম্ভব। আর কৌশলটি হলো, তাদেরকে বিনয়ের সাথে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেয়া যে, বিয়ে করলে আমি এখানেই করব এবং তোমাদের দোয়া নিয়েই করব।

প্রশ্ন : বিয়ের উদ্দেশ্যে পূর্ব থেকেই কাউকে পছন্দ করাটা কি অবিদ্যা?

উত্তর : পছন্দ করতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু যাকে পছন্দ করছেন, তার পছন্দ আছে কিনা জেনে নিয়ে করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রশ্ন : মা-বাবার অমতে মেয়ে নিজের পছন্দমতো বিয়ে করলে কী করণীয়?

উত্তর : বিয়ে করে ফেললে তো আর করার কিছু নেই। ছেলে যদি মেয়ের যোগ্য হয়, তাহলে মেয়ের পরিবার তাদের গ্রহণ করবেন। তাদের জন্যে দোয়া করবেন। কারণ সন্তানকে সুখী দেখাটাই মা-বাবার কাম্য হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : আপনজনদের অনুপস্থিতিতে নিজের পছন্দে বিয়ে করি পাঁচ বছর আগে। আমার চাকরিতে স্বামীর ঘোর আপত্তি অর্থাৎ অশান্তি। মা-বাবার ইচ্ছা গ্রাজুয়েশন শেষ করি। কিন্তু বর্তমান আর্থিক অবস্থায় তা খুব কষ্টকর। বাচ্চা নাই। কাজপ্রিয়, তাই অলস সময় পার করতে পারছি না। আমার একটা চাকরি অনেক সমস্যার সমাধান দিতে পারে। স্বামীকে কীভাবে বোঝাব?

উত্তর : এজন্যে বিয়ের আগেই এই চাকরির ব্যাপারটা ফয়সালা হওয়া উচিত। আসলে টিভি সিরিয়াল দেখে দেখে আমরা এখন মনে করি যে, বিয়েটা আবেগের ব্যাপার। মূলত বিয়েটা হচ্ছে দুজনের মধ্যকার বোঝাপড়া, একটা প্রয়োজন, একটা চুক্তি। অতএব চুক্তিগুলো আগেই ঠিকঠাক হওয়া প্রয়োজন। আপনি আবেগবশত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন আর ডানা পুড়লে বলবেন, পুড়ছে কেন? এই ভোগান্তি তো হবেই।

তো আগুনে যখন ঝাঁপ দিয়েই ফেলেছেন, এখন করণীয় হলো, স্বামীকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে ধৈর্যের সাথে বোঝান—কেন আপনার কাজ করা প্রয়োজন। একসময় তার পরিবর্তন আসতে পারে। আর গ্রাজুয়েশন শেষ করার আগে চাকরি পাওয়া কঠিন। যে-রকম চাকরি চান সে-রকম চাকরির জন্যে তো প্রস্তুতি দরকার। আগে সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন।

প্রশ্ন : আমরা দুজন দুজনকে পছন্দ করে বিয়ে করেছি। আমরা ভালো আছি। এখন আমার শ্বশুর-শাশুড়ি আমাকে মেনে নিচ্ছেন না। আমি তাদের সাথে থাকতে চাচ্ছি। এ-ক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তর : আমরা সবসময় তাৎক্ষণিক ফলাফল চাই। যেহেতু তাদের অমতে বিয়ে করেছেন, কিছু কাঠখড় তো পোড়াতে হবেই।

আপনি তাদের সাথে থাকতে চাচ্ছেন এবং আপনার এই চাওয়াটা হচ্ছে একটি সৎনিয়ত। কিছুদিন পরে তাদের তো এখনকার মতো সামর্থ্য থাকবে না। শারীরিক সামর্থ্যও কমে যাবে। তখন একটি শিশুর মতোই তাদেরকে আপনার সেবাযত্ন করতে হবে। অতএব সবর করুন, ধৈর্য ধরুন। আর মনে মনে বলুন, আপনারা গ্রেটেস্ট হতে পারেন কিন্তু আমি লেটেস্ট। কতদিন আমাকে গ্রহণ না করে থাকবেন?

আসলে যে-কোনো কিছুর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। যেমন, কোয়ান্টাম মেথড নিয়ে কোনো তাৎক্ষণিক ফলাফল আমরা চাই নি। আমাদের প্রথম ১০ বছর গেছে শুধু এটা প্রমাণ করতে যে, আমরা পাগল নই! যারা তখন

আমাদের পাগল বলত, তাদের অনেকে এখন আমাদের অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী। কেন? কারণ আমরা সবর করেছি, নীরবে কাজ করে গেছি।

শাশুড়ির সাথে আপনার সম্পর্ক তো দুই মাস-ছয় মাসের না, এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি পারিবারিক সম্পর্ক। আর আপনি আলাদা হয়ে যেতে পারেন, যদি স্বামীকে বেশি চাপ দেন। কিন্তু তার মনে মায়ের প্রতি যে টান, সেটি মুছে ফেলতে পারবেন না। তার মায়ের দীর্ঘশ্বাস তো সবসময় আপনার ওপর পড়তে থাকবে যে, 'ছেলেটাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেল। ছেলে যদি সাথে থাকত, তাহলে আমাকে কোনো কষ্ট করতে হতো না।' তখন আপনার শান্তি বিঘ্নিত হবে। তাই আলাদা থাকতে চাচ্ছেন না এটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত।

এখন তারা না বোঝা পর্যন্ত আপনি সবর করুন। সম্মান, মমতা, ভালবাসা দিন। আর মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে তাদেরকে নিয়মিত বোঝান। মনে রাখবেন, শেষ পর্যন্ত সবরকারীই বিজয়ী হয়।

এনগেজমেন্ট

প্রশ্ন : ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে এনগেজমেন্ট করে রাখার গুরুত্ব কতটুকু? এটা করা প্রজ্ঞার পরিচয় কিনা? আর বিয়েতে কয়টা অনুষ্ঠান করা উচিত?

উত্তর : আমি প্রত্যেকের মতামতকেই শ্রদ্ধা করি। তবে এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মত হলো—এনগেজমেন্ট পুরোপুরি অর্থহীন একটি ব্যাপার। এটি বরং আরো টেনশন বাড়ায়। আপনি ছেলেমেয়েকে বললেন, তোমাদের বিয়ে হবে। এদিকে বিষয়টা ঝুলিয়ে রাখলেন এবং একটা সীমারেখা দিয়ে দিলেন—এতদূর মেলামেশা করা যাবে। এটা তো তাদের ওপর অত্যাচার।

আবার এই এনগেজমেন্টটা যে বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। বহু এনগেজমেন্ট ভেঙে গেছে এমন ঘটনা আমরা জানি। তাই পারতপক্ষে কেউ এনগেজমেন্টের মধ্যে যাবেন না। এই এনগেজমেন্টের কোনো ধর্মীয় বা আইনগত ভিত্তি নেই। আর যদি আক্দ হয়ে যায়, মেয়েকে ঘরে রাখবেন না। স্বামীর বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। এটাই যৌক্তিক।

বিয়ের ব্যাপারে কোয়ান্টামে আমরা বিশ্বাস করি, ছেলেপক্ষ-মেয়েপক্ষ মিলে বিয়ের অনুষ্ঠান হবে একটাই। মেহেদী রাত, হলুদ সন্ধ্যা, জামাই ভাত, বৌ-ভাত, এই ভাত, সেই ভাত—এগুলো হচ্ছে স্রেফ অপচয়। অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল ফুটানি ছাড়া কিছু নয়। কোথাও কোথাও বিয়ের অনুষ্ঠান নাকি ৭টা, ৯টা, এমনকি ১১টা পর্যন্ত হয়!

আসলে যে জাতি অপচয় যত বেশি করে, আল্লাহর গজব তার ওপরে তত বেশি। অতএব অপচয় করবেন না। যে টাকা এত রকম অনুষ্ঠানে খরচ করবেন, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে তাদেরকে দিয়ে দিন। তারা প্রয়োজনমতো কিছু একটা করুক।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে আরেকটা বিষয় বিশেষভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন, সেটা হচ্ছে গিফট দেবেন না, গিফট নেবেনও না। বিয়ের দাওয়াতে আনন্দিতচিত্তে যাবেন, তৃপ্তি নিয়ে খাবেন, প্রাণ ভরে দোয়া করে আসবেন। আমরা গিফট নেয়াও পছন্দ করি না, দেয়াও পছন্দ করি না। কারণ এই যে লোক দেখানো সামাজিক উপহার, এটাও মানুষের ওপর একধরনের অত্যাচার।

প্রশ্ন : দুই মাস আগে পারিবারিকভাবে একটি ছেলের সাথে আমার এনগেজমেন্ট হয়। প্রথমে সব ভালো মনে হলেও এখন সে আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করছে। আজেবাজে গালিগালাজও করে। এখনই যদি এই অবস্থা হয়, আমি বুঝতে পারছি না কী সিদ্ধান্ত নেব? আমি কি সাহস করে তাকে বিয়ে করে ফেলব, নাকি সরে আসব?

উত্তর : আসলে বিয়ের ক্ষেত্রে এই যে এনগেজমেন্ট, এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। এটা পয়সা খরচ করার একটা বড়লোকি বাহানা। যেমন, বিদেশে বিড়ালেরও বিয়ে দেয়া হয়। যার কোনো খরচ করার জায়গা নেই, সে বিড়ালের বিয়েতে খরচ করে।

আর এনগেজমেন্টের পরে এখনই যদি দুর্ব্যবহার শুরু হয়, তো বিয়ের পরে কী হবে? এ ব্যাপারে আগে থেকেই সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ বিয়ের আগে তো মানুষ সৌজন্য দেখাতে কার্পণ্য করে না। দুর্ব্যবহার করা মানে তো সে শুদ্ধাচার জানে না বা মানে না। এখন খারাপ জেনেও সেখানে ঝাঁপ দেয়াটা তো সাহসের বিষয় নয়, বরং এটি হঠকারিতা।

মনে রাখবেন, সাহস এবং হঠকারিতা দুটো কিন্তু এক নয়। সাহস মানুষকে বিজয়ী করে। আর হঠকারিতা মানুষকে ধ্বংস করে। হঠকারিতা কী? ধরুন, রাস্তায় ৬০ মাইল বেগে ট্রাক আসছে। আপনি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলেন, আমি বিশ্বাসী আমি সাহসী, ট্রাক আপনার কথা কি শুনবে? এটাই হঠকারিতা। আর সাহস হচ্ছে ঠান্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে নিজের এবং অন্যের কল্যাণের জন্যে দাঁড়ানো—ঝুঁকি নেয়া। প্রত্যেকটা কাজে একটা ঝুঁকি থাকে। হয় আপনি সফল হবেন, না হয় ব্যর্থ হবেন। দ্বিধা থাকলে আপনি

ব্যর্থ হবেন। আর ঠান্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারলে আপনি সফল হবেন।

এনগেজমেন্ট মানে তো আপনাদের বিয়ে হয়ে যায় নি। চাইলে এখনো সরে আসা যায়। অতএব আপনি আপনার পরিবারের সাথে কথা বলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন।

বিয়ের খরচ ॥ ভ্রান্ত বনাম সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন : আমার আত্মীয় পরিমণ্ডলে সম্প্রতি যে বিয়েগুলো হয়েছে, তা খুব হইচই ও ধুমধামের মধ্য দিয়ে হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, একটি বিয়ের জন্যে একাধিক ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান এবং খরচের প্রতিযোগিতা করাটা যেন বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমাদের এত আর্থিক সামর্থ্য নেই। তাহলে আমাদের কি হীনম্মন্যতায় ভোগা উচিত?

উত্তর : আপনাদের হীনম্মন্যতায় ভোগার কিছু নেই; বরং যারা এ ধরনের অপচয়ে লিপ্ত, এটা তাদের হীনম্মন্যতার প্রকাশ। কারণ বিয়ে জীবনের একটি সহজ, স্বাভাবিক ঘটনা। একটি স্বাভাবিক ঘটনাকে আকাশকুসুম মনে করা এবং এর জন্যে অপচয়ে মত্ত হওয়া অবিদ্যা ছাড়া আর কিছু নয়; বরং এই খরচ, ধুমধাড়াক্কা অপচয় শুধু অকল্যাণই বয়ে আনে। সাধারণত যে বিয়েতে ধুমধাড়াক্কা-অপচয় যত বেশি, সে বিয়েতে সুখের পরিমাণ তত কম।

আসলে ভোগবাদী পণ্য আগ্রাসকরা নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই ভোজন, বিনোদন এবং জৈবিক চাহিদা পূরণকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রচার করতে মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। এজন্যেই মিডিয়াতে বিয়েকে কাল্পনিক এক বিশাল ব্যাপার হিসেবে চিত্রিত করা হয়। বিয়ের জন্যে খরচের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠা তার মধ্যে প্রথম।

আপনি যাতে প্রচুর অপব্যয় করতে পারেন, সেজন্যে ওয়েডিং ম্যানেজমেন্ট ফার্ম গড়ে উঠেছে। একটা বিয়েতে কতভাবে অপচয় করা যায়, এই পরামর্শ দানে তাদের কোনো জুড়ি নেই। একটিমাত্র বিয়ের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়ে একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি পোশাক ও অলংকার কেনাকাটা করতে গিয়ে হয় টাকার শ্রাদ্ধ। ঋণ করে হলেও বিয়ের এই ফুটানি করতে গিয়ে অনেক পরিবার ঋণের চাপে দুর্দশায় নিপতিত হয়।

ইদানীং আমাদের দেশেও বিয়ের খরচে নতুন সংযোজন হলো হীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পাশ্চাত্যে মাত্র ১০% বিয়েতে হীরার আংটির দেখা

মিলত। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে *ডি বিয়ার্স* নামক হীরা কোম্পানি স্লোগান চালু করে ‘ডায়মন্ড ইজ ফরএভার’ বা ‘হীরা চিরদিনের’। ব্যস, সেই ৫০-এর দশক থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয় বিয়েতে হীরার আংটি দেয়ার চল।

২০১২ সালে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ে উপলক্ষে হীরার আংটি বিক্রি হয়েছে সাত বিলিয়ন ডলার বা ৫৯ হাজার পাঁচশ কোটি টাকা মূল্যমানের। সময় যত গড়িয়েছে, সারাবিশ্বে বহুজাতিক কোম্পানির বাহারি বিজ্ঞাপনগুলো মানুষের মনে এ ধারণাই পোক্ত করেছে—হীরা ছাড়া বিয়ে পরিপূর্ণ হয় না বা হীরা বিয়ের বন্ধনকে চিরস্থায়ী করে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, যে সম্পদশালী পাশ্চাত্য সমাজে বিয়েতে অপরিহার্য অনুষঙ্গ হীরা, খোদ সেখানেই বিয়ে বিচ্ছেদের হার সবচেয়ে বেশি।

এস্ট্রলজি গবেষণার একটি ফলাফল হচ্ছে, শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে বিয়েতে হীরকের প্রভাব অশুভ। এর ব্যাখ্যা হলো, প্রতিটি পাথরের একটি দ্রব্যগুণ আছে, যা ব্যক্তির মানসিকতা ও আচরণের ওপর প্রভাব ফেলে। হীরকের মনোদৈহিক প্রভাব হলো, তা অহম বৃদ্ধি করে এবং পারস্পরিক সমমর্মিতা ও সমঝোতার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। বিয়েতে হীরা দেয়া আর খাল কেটে কুমির আনা একই কথা।

আসলে বিয়ে একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা, যার মাধ্যমে নরনারীর জৈবিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারটিই সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। একে মহিমান্বিত করতে গিয়ে একাধিক ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান এবং লোক দেখানো খরচের প্রতিযোগিতায় মত্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতারই প্রকাশ।

প্রশ্ন : নিজ খরচে বিয়ে করা কি আবশ্যক? ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ে কীভাবে সম্পন্ন করা উচিত? বিয়েতে কী পরিমাণ খরচ করা যেতে পারে? চারপাশে যা দেখছি, তাতে বার বার প্রশ্নটা মাথায় ঘুরছে। উত্তর দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর : অন্যের খরচে কীভাবে বিয়ে করবেন? বিয়ে নিজের এবং নিজ পরিবারের খরচেই করতে হবে। কিন্তু একেবারে কপর্দকশূন্য হলে তার বিয়ে করার ক্ষেত্রে ধৈর্য তো ধরতেই হবে। অর্থাৎ বিয়ে করার সঙ্গতি অর্জন করাটা গুরুত্বপূর্ণ। ফাতিমার (রা) সাথে আলীর (রা) যখন বিয়ে ঠিক হলো, তখন তিনি খুবই দরিদ্র ছিলেন। বিয়ের খরচ জোগানোর জন্যে যে বর্মটি তিনি যুদ্ধে ব্যবহার করতেন, অগত্যা তা বিক্রি করে দেন। তাদের বিয়ের মোহরানা ছিল ৪০০ রৌপ্যমুদ্রা। আলী (রা) তা আদায় করেন এবং ফাতিমার (রা) সাথে বিয়ে হয়ে যায়। অর্থাৎ বিয়েতে বাহুল্য খরচ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা করতে গিয়ে এখন খরচের ক্ষেত্রে অযথাই এক জঘন্য অশ্লীল প্রতিযোগিতা চলে। সম্প্রতি ভারতের এক বিয়েতে ৫০০ কোটি রুপি খরচ হয়েছে। যে দেশে ৩০ কোটি মানুষ দরিদ্র, সে দেশে এক বিয়েতেই খরচ হয়েছে ৫০০ কোটি রুপি। আমাদের দেশেও বিয়েতে খরচের প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

অনেক বছর আগের ঘটনা। এক ভদ্রলোক তার মেয়েকে বিয়ে দেবেন। তিনি যাকে পাচ্ছেন তাকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। ধানমণ্ডির আবাহনী মাঠজুড়ে প্যান্ডেল করা হলো। পুরো মাঠের প্রত্যেকটি টেবিলে অর্কিড দেয়া হয়েছিল। সেসময় আমাদের দেশে অর্কিড খুব কম পাওয়া যেত। থাইল্যান্ড থেকে অর্কিড আনানো হয়েছিল টেবিল সাজানোর জন্যে। কী পরিমাণ অপচয়!

বিয়ের ক্ষেত্রে এ খরচ করাকে সামাজিক মর্যাদা হিসেবে গণ্য করা হয়। সামর্থ্য না থাকলে ঋণ করে হলেও খরচ করি। ফলে পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির সাথে সাথে বহু পরিবার দেউলিয়া হয়ে গেছে শুধু বিয়েতে খরচের ফুটানি করতে গিয়ে। এমনকি সংসারে পরবর্তীকালে যে সমস্যা হয়, তার অনেকগুলোর সূত্রপাত এই অতিরিক্ত খরচের মধ্য দিয়ে।

যেমন, একটি মধ্যবিত্ত পরিবার—সীমিত উপার্জন, সীমিত সঞ্চয়। কিন্তু এই পরিবারেরই একটি ছেলে যখন বিয়ে করছে, তখন ফুটানি দেখানোর জন্যে হোক, স্ত্রীর কাছে নিজেকে হিরো হিসেবে উপস্থাপনের জন্যেই হোক বা কনের পরিবারের কাছে নিজেদেরকে খুব জৌলুসওয়ালা পরিবার হিসেবে দেখানোর জন্যে হোক, এত বেশি খরচ করে ফেলে যে, সেটার জন্যে তাকে অনেক সময় ঋণও করতে হয়।

দেখা যায়, ৯৮% বিয়েতে অতিরিক্ত যে খরচ, এটা হচ্ছে ঋণ করা। এদিকে এত শাড়ি-গয়না, আয়োজনের বিলাসিতা দেখে আপনার স্ত্রী তো ভাবছে, আরে বাপরে বাপ! আমার স্বামীর কত উপার্জন! আমার শ্বশুরবাড়ি কত না পয়সাওয়ালা! কিন্তু একমাস পরে যখন বিয়ের দিনের সাথে তার সংসারের কোনো মিল থাকে না—সাধারণ খাওয়াদাওয়া ও কেনাকাটায় টানাপোড়েন, সমস্যাটা শুরু হয় তখন থেকে।

অতএব স্ত্রীকে প্রথমদিনই বলবেন—এই হচ্ছে আমার সামর্থ্য। যদি অ্যারেঞ্জড ম্যারেজও হয়, স্ত্রীর সাথে আগে দেখা করে বলবেন যে, দেখুন, আমার এই অবস্থা। আমাকে যদি বিয়ে করেন, আপনাকে এভাবে চলতে হবে। যদি মেয়েটি বুদ্ধিমতি হয়, আপনাকে বিয়ে করবে। আর যদি আহাম্মক হয়, তাহলে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করবে। আর আহাম্মক কাউকে বিয়ে করাটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

প্রশ্ন : আমার বিয়ে উপলক্ষে অনেক খরচ হয়েছে। এর কোনোটাই আমার পছন্দ নয়। যতই বলি এর প্রয়োজন নেই, আমার কথা কেউ শোনে না। পরিবারের ওপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ আমাকে কষ্ট দেয়। আমি এ-ক্ষেত্রে কী করতে পারি?

উত্তর : একটি বিষয় হলো, আপনি যদি পুরুষ হন, তাহলে আপনার কথা কেউ শোনে না—এটা বলা আপনার পক্ষে সমীচীন নয়। বিয়ে করবেন আপনি। আপনার বিয়েতে কত খরচ হবে, সেটা যদি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে তো হবে না।

তবে মেয়ে হলে হয়তো অনেক সময় কিছু করার না-ও থাকতে পারে। কারণ আমাদের দেশে দেখা যায়, পরিবারের যারা প্রধান বা পরিবারের যারা চালক তারা যদি অবিদ্যা থেকে মুক্ত না হয়, মেয়েটির পক্ষে তখন ভিন্ন কিছু করা সত্যিই খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। তাকে তা-ই করতে হয়, যা অভিভাবকরা বলেন।

যুগ যুগ ধরে বিয়ে ছিল পরিবারের আপনজনদের নিয়ে ঘরোয়া এক আয়োজন। এখন এটি পরিণত হয়েছে অপচয় ও জৌলুসের রমরমা প্রদর্শনীতে। আমাদের দেশেও বিয়ের সামাজিকতা এতটাই অনুষ্ঠানসর্বস্ব হয়ে উঠেছে যে, শুধু একটি বিয়েকে কেন্দ্র করে পান-চিনি/ এনগেজমেন্ট, আক্দ, মেহেদীসন্ধ্যা ও সংগীত, দুটো গায়ে হলুদ, বিয়ে, বৌ-ভাত ইত্যাদি নামে কমপক্ষে সাত-আট-নয়টি অনুষ্ঠানের আয়োজন যেন বাধ্যতামূলক। যার সামর্থ্য নেই, তাকেও ধারকর্জ করে জোগাতে হয় এসব অনুষ্ঠানের অর্থ।

পোশাক, অলংকার, কমিউনিটি সেন্টার, খাবার, প্রি-ওয়েডিং পোস্ট ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, অন্দরসজ্জা—সবকিছুরই মূল্য ঊর্ধ্বমুখী। কারণ মানুষের চাহিদা বাড়ছে, যুক্ত হচ্ছে নানারকম ফরমায়েশ। সমাজে মুখরক্ষার জন্যে বিয়ের খরচ মেটাতে ব্যাংক ঋণ নিতেও কারো আপত্তি নেই।

এগুলোর সাথে আবার যোগ হয়েছে নতুন ফুটানি—ডেস্টিনেশন ওয়েডিং। অতিথিদের নিয়ে কয়েকদিনের জন্যে মনোরম এবং ব্যয়বহুল কোনো স্থানে গিয়ে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা। এমনকি সেটি হতে পারে অন্য কোনো দেশে গিয়ে। এজন্যে কোটি টাকাও খরচ করতে পিছপা হচ্ছে না উৎসাহীরা। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে শুভ একটি কাজের সূচনা হচ্ছে অপচয় অথবা ঋণ ও কিস্তির মতো অভিশাপের মধ্য দিয়ে। অতএব বিয়ে উপলক্ষে করা খরচ নিয়ে শুধু মনে মনে কষ্ট পেলে হবে না। আপনার অবস্থানে আপনাকে দৃঢ় হতে হবে।

প্রশ্ন : আমার বিয়ের খরচ ব্যাংক লোনে করা, যা এখনো পরিশোধ করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় বিয়ের গহনার যাকাত কি দিতে হবে, নাকি লোন পরিশোধ আগে করতে হবে? এতদিনে অবশ্য গহনা পরিমাণ লোন পরিশোধ হয়েছে। এমতাবস্থায় করণীয় কী, জানতে চাই।

উত্তর : ঋণ পরিশোধ করাটা হচ্ছে প্রাথমিক কর্তব্য। বিয়ে-সংক্রান্ত যে ঋণ, এই ঋণ আগে শোধ করতে হবে। আপনার গহনা বিক্রি করে দিলে যদি ঋণ শোধ হয়ে যায় এবং তারপরও যদি গহনা থাকে, তাহলে অতিরিক্ত যে গহনা তার জন্যে আপনাকে যাকাত দিতে হবে। কারণ ঋণ এবং সম্পত্তি দুটোই আপনাকে দেখতে হবে। সম্পত্তি যদি ঋণের পরিমাণের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তার ওপর আপনাকে যাকাত দিতে হবে।

আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিয়ে-সংক্রান্ত ঋণ করা হয় অহেতুক ফুটানি বা জৌলুস করার জন্যে। এক ছেলে বলছিল তার বিয়ে উপলক্ষে মোট চারটি অনুষ্ঠান হয়েছে। এগুলোর পেছনে তার কষ্টার্জিত উপার্জনের প্রায় সবটাই ঢেলে দেয়া হয়েছে। এ-ছাড়াও আরো এত পরিমাণ ঋণ করা হয়েছে যে, আগামী সাত বছর ধরে তাকে এই ঋণ পরিশোধ করে যেতে হবে। ছেলেটি দুঃখ করে বলছিল যে, 'চারটি অনুষ্ঠানেই ঘুরে ফিরে প্রায় একই মানুষ এসেছে। ঋণ করে এতগুলো অনুষ্ঠানের খরচ বাহুল্য ছাড়া আর কিছু নয়।' আমরা সবসময় বলি, বিয়ের জন্যে ঋণ করা—এর চেয়ে অবিদ্যা আর কিছু হতে পারে না।

প্রশ্ন : এখনকার বিয়ের প্রোগ্রামগুলোতে যেভাবে খরচের প্রতিযোগিতা; একেকটা বিয়ের জন্যে অনেকগুলো প্রোগ্রাম হচ্ছে। প্রতিটা প্রোগ্রামে ডেকোরেশন, পোশাক, গহনা, পার্লারের সাজ, ফটোগ্রাফারের লাখ টাকার বিলসহ খরচের বাড়াবাড়িটা এখন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ঋণ করে হলেও খরচ করতে হবে। আবার প্রোগ্রামে ফটোগ্রাফারের নির্দেশে বিচিত্র ও অশ্লীল ভঙ্গিতে সবার সামনে বর-কনে যেভাবে ফটোসেশন করছে, তা আসলেই লজ্জার। সেইসাথে গায়ে হলুদের প্রোগ্রামগুলোতে বর-কনে শাশুড়ি-জামাইসহ হিন্দি ফিল্মি কায়দায় যে নাচানাচির সিলসিলা চালু হয়েছে, তাতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে অংশগ্রহণ করাটাই একটা বিব্রতকর বিষয়। আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এমনটা হচ্ছে, বিয়ের নির্মল আনন্দানুষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই অশ্লীল অপসংস্কৃতির ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে। এরকম পরিস্থিতিতে আমরা কী করব?

উত্তর : বর্তমানে মিডিয়ার কল্যাণে গায়ে হলুদের প্রোগ্রামগুলোতে বর-কনে শুধু নয়, শাশুড়িসহ নাচার যে অপসংস্কৃতি চালু হয়েছে, এটা জঘন্য অশ্লীলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এরকম প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা অবশ্যই বিব্রতকর। বিনয়ের সাথে এসব অপসংস্কৃতি থেকে দূরে থাকুন।

আসলে ভুঁইফোড় পরিবারগুলো ফুটানি করে জাতে ওঠার জন্যে এরকম অসুস্থ প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে। এখন এতে জড়িয়ে পড়ছে মধ্যবিত্তরাও। তেমনি এতে হচ্ছে অর্থের অপচয়। বিয়ের নামে এত অপচয় করার ফলে মানুষ ঋণের অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছে। বিয়েতে ফুটানির জন্যে ঋণজর্জরিত হয়ে বিবাহপরবর্তী জীবনটাকে অসুখী করা বোকামি।

আমরা সবসময় বলেছি, যে বিয়েতে খরচ যত বেশি সে বিয়েতে সুখের পরিমাণ তত কম। এখন বাস্তবতা হচ্ছে, যত ধুমধাম করে বিয়ে হচ্ছে তত যেন ডিভোর্সের হার বাড়ছে। পারিবারিক কলহের তো সঠিক হিসাব বলা-ই মুশকিল। তিন হাজার দম্পতির ওপর পরিচালিত একটি গবেষণার ফলাফল হলো, যে বিয়ের অনুষ্ঠানের বাজেট যত বড়, সেই দম্পতির সংসারজীবন তত সংক্ষিপ্ত। কল্পনাকে হার মানায় যেসব জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ের উৎসব, তার অধিকাংশেরই করুণ পরিণতি ঘটে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে।

গবেষণাটি করেন ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ স্কুল অব পাবলিক পলিসির অধ্যাপক অ্যান্ড্রু ফ্র্যান্সিস-ট্যান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক হুগো এম মিঅ্যালন। তাদের মতে, গত ৫০ বছরে বিশ্বজুড়ে বিয়ে-কেন্দ্রিক যে বাণিজ্য গড়ে উঠেছে তার মূল কথাই হলো 'ব্যয় করো আর ব্যয় করো'। আর বিয়েতে অতিরিক্ত খরচের ফলে সৃষ্ট টেনশন থেকেই অশান্তি এবং বিচ্ছেদের হার বাড়ছে।

১৯৫৯ সালে আমেরিকান ম্যাগাজিন *ব্রাইডস*-এর মতে, বিয়ের আগে দুমাসের প্রস্তুতিই যথেষ্ট ছিল। ৯০-এর দশকে এই বাস্তবতা বদলে গেল—১২ মাসের একটানা প্রস্তুতিও যেন মনের মতো বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্যে যথেষ্ট নয়। নায়ক-নায়িকা ও ধনকুবেরদের বিয়ের অনুষ্ঠান দেখে অন্যরা প্রলুব্ধ হচ্ছে। তারা অনেকে বুঝতে পারে না যে, সেলিব্রিটিদের এসব লোক দেখানো অনুষ্ঠান আসলে একধরনের ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ও স্পন্সর করা।

আর বিয়ের প্রোগ্রামগুলোতে এসব অতিরিক্ত খরচ করা হয় মূলত লোক দেখানোর জন্যে। এই লোক দেখানো কাজের ফলে অন্তর কখনো পরিতৃপ্ত হয় না, বরং ভেতরে অশান্তি বাড়ে। অতএব বিয়ের প্রোগ্রামে খরচ যত কম করা যায় তত ভালো। মনে রাখতে হবে, বিয়ের আরেক নাম দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পরিবারের প্রতি, পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি এবং সমাজের প্রতি। বিয়ের অনুষ্ঠান

হলো দায়িত্বপূর্ণ দীর্ঘ যাত্রার প্রথমদিন। তাই অহেতুক ঠাটবাট দেখিয়ে একে অপরের সম্পর্কে অযৌক্তিক প্রত্যাশা তৈরি করা কোনোভাবেই উচিত নয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সততা ও দায়িত্ব-সচেতনতার ছাপ থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন, যেন ঋণ ও অপচয়ের ফাঁদ থেকে প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি পরিবার মুক্ত থাকতে পারে।

প্রশ্ন : বর্তমানে একটি বিষয় আমাকে ব্যথিত করে। তা হলো বিয়ে বাড়ির অহেতুক খরচ। এই খরচটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করার আগে বিয়ে করতে পারছে না। তাছাড়া বিয়েতে যে পরিমাণ খাবার নষ্ট হয় তা দেখে সত্যিই খুব খারাপ লাগে। গুরুজী, আমি বিয়ের সময় কোনো লোক দেখানো অনুষ্ঠান না করে অনুষ্ঠানের টাকাটা কোয়ান্টামে দান করে দেবো ভাবছি। এই ইচ্ছাটা কি যৌক্তিক? আর বিয়ে উপলক্ষে লোকজনকে খাওয়ানোর নামে বর্তমানে যে অপচয় করা হচ্ছে সে ব্যাপারে কিছু বলবেন। এর শুদ্ধাচার কী হওয়া উচিত?

উত্তর : সবকিছুতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাটাই ভালো। বিয়েতে অপচয় না করে খরচের একটা অংশ আপনি দান করতে পারেন। এটা খুব ভালো সিদ্ধান্ত। দানের বরকতে আল্লাহ নিশ্চয়ই নতুন সম্পর্কটাকে আরো সুন্দর করে দেবেন। কিন্তু একেবারেই কোনো অনুষ্ঠান না করার চিন্তা করলে পরিবারে অনেকের মধ্যে অসন্তুষ্টি আসতে পারে।

পরিবার গঠন ও পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারের আনুষ্ঠানিক রূপই হলো বিয়ে। এজন্যে বিয়েতে আত্মীয়, বন্ধু ও প্রতিবেশীর উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার-পরিজনের উপস্থিতি, শুভ কামনা ও দোয়া এই বন্ধনকে দৃঢ় করবে। যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানী চার্লস কেসলার-এর একটা কথা আছে—সেই অঙ্গীকারই সুদৃঢ়, যা মানুষ জনসমক্ষে উচ্চারণ করতে পারে। আমরা যখন অনেকের মাঝে কোনো প্রতিজ্ঞা করি বা সিদ্ধান্তের কথা জানাই, তা আমাদের দায়িত্ববোধ বাড়ায়, সেই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকার সামর্থ্য জোগায়।

তবে প্রয়োজন ও প্রদর্শনীর মধ্যে পার্থক্য করতে জানতে হবে। সামাজিকতা ও ঐতিহ্যের নামে ভোগবাদী পণ্যদাসত্বের স্রোতে গা ভাসালে তা শুধু দুর্দশাই বয়ে আনবে। উজবেকিস্তানের অবস্থা দেখুন, রয়টার্স-এর মতে, সেখানে বিয়ের সময় মধ্যবিত্ত একটি পরিবার প্রায় ২০ হাজার ডলারের মতো খরচ করে, যেখানে দেশটির গড় আয় ১০০-৩০০ ডলার মাত্র। বিয়ের অতিরিক্ত খরচ সাধারণত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের থেকে ধার হিসেবে নেয়া

হয়। এই ঋণের টাকা পুরো পরিবার মিলে বছরজুড়ে পরিশোধ করে। দেশটির প্রেসিডেন্ট শাভাকত মিরজোয়েভ উচ্চাভিলাসী বিয়েকে তিরস্কার করে বলেন, 'বিয়ে-সংক্রান্ত ঋণের এ অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে পরিবারের পঞ্চাশোর্ধ অনেকেরই মৃত্যু হয় হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের কারণে।' তাই ২০১৮ সালে আইন করে বিয়েতে অতিরিক্ত খরচে নিষেধাজ্ঞা এনেছে উজবেকিস্তান সরকার। এ নিয়ম অনুযায়ী সেখানে ১৫০ জনের বেশি অতিথিকে দাওয়াত দেয়া যাবে না। বিয়ের বহরে তিনটির বেশি দামি গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না। (বিবিসি নিউজ, ১৬ মার্চ ২০১৮)

আমাদের বক্তব্য হলো, বিয়েতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করাটা কাঙ্ক্ষিত। বাসায় খাওয়ান বা সামর্থ্য অনুসারে বাইরে কোথাও দাওয়াত দেন। কিন্তু খাবারের আইটেম বা অন্যান্য খরচে অপচয় করবেন না। আইটেম হবে সীমিত, কিন্তু সুস্বাদু এবং পর্যাপ্ত। লোক দেখানো ও বাহুল্য খরচ বর্জন করবেন। উভয়পক্ষ মিলে বিয়েতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন। বিয়ের অনুষ্ঠানকে একদল ফটোগ্রাফারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখুন। একে ফটোগ্রাফি, ভিডিও এবং সেলফিসর্বস্ব অনুষ্ঠানে পরিণত করবেন না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, কারো কাছ থেকে ধার নিয়ে কিছু করবেন না। বিয়ের খরচের জন্যে কোনোভাবেই ঋণ নয়! আমাদের এই উপমহাদেশে বিয়ের ধুমধাম করতে গিয়ে নিম্নবর্ণের পরিবারগুলো শত শত বছর ধরে দাসে পরিণত হয়েছে। আগেকার মহাজনরাও এই কাজটা করতেন মানুষকে ঋণজর্জরিত করে দাস বানানোর জন্যে। অতীতে যেমন এ নিয়ম ছিল, এখনকার কর্পোরেট শোষকরাও একই কাজ করছেন।

অর্থাৎ বিয়ের জন্যে ঋণ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের চক্রান্ত। প্রথমে তারা খরচ করতে উৎসাহিত করে। পরে ঋণ দিয়ে আপনাকে দাস বানায়। বিয়ে, হানিমুন সবকিছুর জন্যেই ঋণ দেয়া হয় এখন। পরবর্তীকালে সেই ঋণ পরিশোধ করতে দাসের মতো কাজ করতে হয়। ঋণ পরিশোধের মাত্রাতিরিক্ত চাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে শুরু হয় দাম্পত্য অশান্তি; এমনকি তা বিবাহবিচ্ছেদ পর্যন্ত গড়ায়। অতএব বিয়ের খরচের জন্যে ঋণ এবং অপচয় যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। এটাই আদর্শ বিয়ে।

প্রশ্ন : গুরুজী, বিয়েতে বর ও কনে পক্ষ মিলে একটি প্রোগ্রাম করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গ্রামের বাড়ি হওয়ার কারণে আত্মীয়স্বজন সবাই বৌভাত প্রোগ্রাম করতে বলে, যা বাস্তবায়ন করতে গেলে আমাকে ঋণের ফাঁদে পা দিতে হতে পারে। বর হিসেবে আমার করণীয় জানালে খুবই উপকৃত হবো।

উত্তর : ঋণের ফাঁদে পা না দেয়াটাই উত্তম। কারণ এই বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না। আমরা সবসময় বর ও কনে পক্ষ মিলে একটি প্রোগ্রাম করার পক্ষে। সেখানেও বাহুল্য যত বর্জন করা যায় তত মঙ্গল। নবীজীর (স) একটি হাদীস হলো, 'আর্থিক চাপমুক্ত বিয়েই স্বর্গসুখসম্ভবা বিয়ে'। [উকবা ইবনে আমির (রা), *আবুদাউদ, বায়হাকি, ইবনে হিব্বান; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৮৯৪*]

অতএব বৌভাতের পরিবর্তে মসজিদে দোয়ার আয়োজন করে খেজুর বিতরণ করে দেন। সরাসরি বলবেন যে, বিয়ে তো হয়েছে, ভবিষ্যতে সুযোগ হলে আমরা একসাথে খাব। আপাতত খেজুর খেয়ে আমাদের জন্যে দোয়া করবেন। আশেপাশে ঘরে ঘরে আট-দশটা করে বিয়ের খেজুর পাঠিয়ে দিতে পারেন। ব্যস, হয়ে গেল। অর্থাৎ কখনো ঋণ করবেন না। কারণ এই অশান্তি আপনার বৈবাহিক জীবনকেও বিধ্বস্ত করে তুলবে। ঋণ করে হলেও বৌভাত করতে যারা বলছে, ঋণ পরিশোধের সময় কাউকে পাশে পাবেন না; বরং এ নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়বে না। ঋণের বোঝা আপনাকেই টানতে হবে।

প্রসঙ্গ যৌতুক

প্রশ্ন : বিয়ের সময় মেয়ের পরিবার থেকে বরকে নানারকম আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী দেয়া হয়। এগুলো কি যৌতুকের আওতায় পড়ে?

উত্তর : অবশ্যই। কারণ কনের মা-বাবা কৌতুক করে এগুলো দিচ্ছেন না! তারা যৌতুক হিসেবেই দিচ্ছেন। প্রচলিত সমাজের তথাকথিত নিয়মের চাপে বাধ্য হয়ে দিচ্ছেন, যেন বিয়ের পর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ির খোঁটা শুনতে না হয়। কিন্তু কোনো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছেলের উচিত নয় শ্বশুরবাড়ি থেকে তথাকথিত উপহার হিসেবে পাওয়া এ সমস্ত আসবাব-উপকরণ গ্রহণ করা, যা যৌতুকেরই নামান্তর।

বরং স্ত্রীকে বলা উচিত, দেখ, আমার খাট নেই, তুমি যদি আমার সঙ্গে মেঝেতে থাকতে পারো, তাহলে আসতে পারো। আর যদি মনে করো বাবার বাড়ি থেকে খাট আসবে, তাহলে সে খাটে তুমিই থাকবে, আমি মেঝেতেই ঘুমাব। এটাই হলো পৌরুষ। 'শ্বশুরবাড়ি থেকে না চাইতেই দিয়েছে, কী করব'—এ মানসিকতা আসলে মনের ভেতরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষারই আরেক নাম। এরা কাপুরুষ, লোভী এবং মেরুদণ্ডহীন ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্ন : মেয়ের বিয়েতে না-ই বা করলাম আয়োজন, না-ই বা হলো লোকে লোকারণ্য। শুধু খেজুর-খোরমা থাকবে। আর আমি মেয়ের সুখের জন্যে সংসারের যাবতীয় জিনিস দিয়ে দিলাম। সেটা কি যৌতুকের পর্যায়ে পড়বে? প্রতিটি ছেলেরই কিছু কিছু পাওয়ার মনোবাসনা লুকিয়ে থাকে। পিতৃহীন মেয়ের জন্যে এতটুকু করা কি অন্যায় হবে? আপনার অভিমত কী?

উত্তর : যে ছেলে শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়ার আশা করে, সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়। সে একটা কাপুরুষ। জিনিস দিয়ে এদের লোভ আরো বাড়িয়ে দেয়া হয়। আর মেয়েকে শুধু বিয়ের সময়ই কেন দিতে চাইবেন? তার মানে আপনি পাত্রকে যৌতুক হিসেবেই এগুলো দিতে চাচ্ছেন। কারণ মেয়েকে আপনি যে-কোনো সময়ই দিতে পারেন। বাবার বাড়িকে যদি সে শিকড় মনে করতে পারে, তাহলে সেটাই তার অধিকার।

কিন্তু ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেয়েরাও মনে করে যে, বিয়ের সময় বাবার বাড়ি থেকে তাকে এটা-সেটা নিতে হবে। না হলে শ্বশুরবাড়িতে গেলে লোকে কী বলবে? আবার কবে আসবে তারও তো কোনো ঠিক নেই। এখনো আমাদের দেশের অনেক মেয়েকে বিয়ের দিন বিদায় দেয়ার সময় বলে দেয়া হয় যে, লাশ না হয়ে যেন শ্বশুরবাড়ি থেকে না বেরোয়, যত অপমানিত বা অত্যাচারিত হোক না কেন! এগুলো অবিদ্যা এবং বিয়ে-সম্পর্কিত ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এসব ভাবনা থেকে আমাদের দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন : আমার মা-বাবা যৌতুকের জন্যে আমাকে বিয়ে করান এবং তাদের কথামতো আমি বিয়ে করি। বিয়ের পর থেকে স্ত্রীর সাথে আমার বনিবনা হচ্ছিল না। মেয়ের অভিভাবক খুব প্রভাবশালী হওয়ায় আমাকে ঘর-সংসার করতে হয়েছে। এদিকে আমার একটি ছেলেসন্তান হয়েছে। এখন আমি কী করব? দ্বিতীয় বিয়ে করব কিনা, সে বিষয়ে পরামর্শ চাই।

উত্তর : আপনাকে পরামর্শ দেবো কিনা সেটা আগে ভাবতে হবে। কারণ আপনি একজন পুরুষ হয়ে কীভাবে বলেন যে, মা-বাবা যৌতুকের জন্যে বিয়ে করিয়েছেন? মা-বাবা বলল আর আপনি বিয়ে করে ফেললেন! শ্বশুরবাড়ির ভয়ে স্ত্রীর সাথে বনিবনা না হলেও সংসার করছেন। আবার সন্তানের বাবাও হয়েছেন! আর এখন দ্বিতীয় বিয়ে করবেন কিনা ভাবছেন?

আজকের সমাজে মেয়েদেরই যেখানে জোর করে বিয়ে দেয়া যায় না, সেখানে আপনাকে বিয়ে করানো হয়েছে! আপনার পুরো বক্তব্যটাই একজন

মেরুদণ্ডহীন লোভী কাপুরুষের কথা। আপনাকে আগে আপনার স্বভাব বদলাতে হবে। তারপর পরামর্শ দিলে আপনি উপকৃত হবেন।

প্রশ্ন : যৌতুক থেকে নিজের এবং অন্যের পরিবারকে মুক্ত করার উপায় কী?

উত্তর : উপায় খুব সহজ। নিজে যৌতুক গ্রহণ না করা এবং বিয়েতে যৌতুক না দেয়া। এটা যদি আমরা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে করতে পারি, তবে সমাজ থেকে একদিন সত্যিই এ কুপ্রথা চিরতরে দূর হবে।

প্রশ্ন : যৌতুক নামক পারিবারিক অবিদ্যা সম্পর্কে গোঁড়া মা-বাবাকে কীভাবে বোঝাব? বিশেষত তারা শুনতে চাইছেন না, কিন্তু বোঝানো দরকার। এ-ক্ষেত্রে কী করব?

উত্তর : মমতা দিয়ে ও বিনয়ের সাথে বোঝাবেন। আপনি যদি যৌতুক না নেন, আপনার মা-বাবার কোনো সাধ্য নেই যৌতুক নেয়ার। সেজন্যে আপনি আপনার বিশ্বাস ও জীবনাচার দিয়ে তাদের বোঝাবেন। আমরা আমাদের জীবনাচার দিয়েই সত্যকে বোঝাতে চাই।

প্রশ্ন : মেয়ের মা-বাবা হওয়ায় ছেলের বাড়িতে বছরের পর বছর উপঢৌকন দিয়ে যাওয়া, ঘন ঘন দাওয়াত দেয়া, বড় বড় রুই-কাতলা খাওয়ানো—যেন মেয়ে সুখে থাকে। বেশিরভাগ মেয়ের মা-বাবা একতরফাভাবে ছেলেপক্ষকে খুশি করার চেষ্টা করেন। এর ফলে আসলেই কি মেয়ের সম্মান বৃদ্ধি পায়? মেয়ের মা-বাবা হয়েছেন বলে সারাক্ষণ মাথা নিচু করে থাকতে হবে। এটা কি যুক্তিসঙ্গত? অন্যদিকে ছেলের মা-বাবা মনে করেন, ছেলের মা-বাবা হওয়ায় তাদের মাথা অনেক উঁচু। মেয়ের বাড়ির লোকজনের সাথে সামান্য সামাজিকতারও কোনো প্রয়োজন নেই। আলোচনা করে বাধিত করবেন।

উত্তর : আসল সমস্যা হচ্ছে, মেয়েকে যদি উপযুক্ত করে গড়ে না তোলেন, তাহলে সে নিজেই নিজেরটা বুঝবে কী করে? তাই মেয়েকে শিক্ষিত স্বাবলম্বী উপযুক্ত দক্ষ ও সাহসী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাহলে ছেলের পরিবারকে ঘন ঘন দাওয়াত দিয়ে রুই-কাতলা খাওয়ানোর দরকার হবে না। শ্বশুরবাড়ি যদি বোঝে এ মেয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, গুণবতী, নিজে চলতে পারবে, সেই মেয়েকে তারা কখনো ঘাঁটায় না। তাকেই ঘাঁটায়, যে দুর্বল। পৃথিবী

হচ্ছে—শক্তের ভক্ত, নরমের যম। আর মেয়ের আসল শক্তি হচ্ছে তার নিজের জ্ঞান, নিজের যোগ্যতা।

প্রশ্ন : আমার মনে হয়, যে ছেলেরা যৌতুক চায় তারা আসলে ভিক্ষুক। এই ভিক্ষুকদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া উচিত নয়। সে রাস্তার পাশে থালা নিয়ে বসে না এই যা! আর যে মেয়েপক্ষ উপহার হিসেবে ছেলেকে যৌতুক দেয়, সে ভিক্ষুকের কাছে মেয়ে বিয়ে দিয়ে ছেলেকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে স্বাবলম্বী করতে চায়। ভিক্ষুক কি কখনো স্বাবলম্বী হয়?

উত্তর : বাস্তবতা হলো ভিক্ষুক কখনো স্বাবলম্বী হয় না; বরং তার লোভ দিন দিন আরো বাড়তে থাকে। যে হাত নিতে অভ্যস্ত হয় সে হাত কখনো দিতে জানে না। অতএব কোনো ভিক্ষুকের কাছে মেয়ে বিয়ে দেবেন না।

প্রত্যেক মা-বাবা যদি এরকম ভূমিকা নেন যে, পাত্ররূপী এই ভিক্ষুকের কাছে মেয়ে বিয়ে দেবো না, তাহলে সমাজের চেহারা পাল্টে যাবে। একদিনে যে পরিবর্তন হবে, তা নয়। কিন্তু পরিবর্তনের সূচনা তো করতে হবে।

প্রশ্ন : বিয়ের সময় জিনিসপত্র দেয়া যৌতুক। কিন্তু বিয়ের পর মেয়ে ও মেয়ে জামাইয়ের জন্যে কাপড়, আসবাবপত্র একতরফাভাবে দেয়া কি যৌতুক নয়?

উত্তর : বাবার বাড়িতে মেয়ের হক রয়েছে। এটা তার শিকড়। মা-বাবা ছেলেকে দিতে পারলে মেয়েকেও দেবেন। এটা মেয়ের অধিকার। কিন্তু বিয়ের শর্ত হিসেবে নয়। বিয়ের শর্ত হিসেবে দেয়া মানে এটা যৌতুক। প্রতিটি মেয়েকে এখন থেকে মনে করতে হবে, বাবার বাড়ি তার শিকড়। ভাই যদি পেতে পারে, তাহলে আমিও পেতে পারি। আর ভাইকে দেয়ার মতো অবস্থা যদি না থাকে, আমি নেব কেন? পারলে বরং মা-বাবাকে সহযোগিতা করব।

প্রশ্ন : আড়াই বছর হলো বিয়ে করেছি। স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাই। কারণ সে আমার তুলনায় অনেক কম সুন্দর, কম শিক্ষিত, নিচু পরিবারের। কোনোমতেই তাকে মন থেকে ভালবাসতে পারছি না। সে অবশ্য আমার সব নির্দেশ মেনে অর্থাৎ দীর্ঘ একবছর বাপের বাড়িতে থাকার পর রাজি হয়েছে আমার সাথে সংসার করার। বিয়ের সময় তার বাবা আমাকে ব্যারিস্টার বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেবে না বা তাদের সে

সামর্থ্যও নাই। এখন কী করি? ধরে নিলাম, আমি সব মাফ করে দিলাম কিন্তু তাকে ভালবাসতে পারছি না। মনে হয় ওকে ছেড়ে অন্যত্র শিক্ষিত, সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করলে ভালো হবে।

উত্তর : যে পুরুষ শ্বশুরের পয়সায় ব্যারিস্টারি পড়তে চায়, সে পুরুষ নামের অযোগ্য। এ-তো যৌতুক! আর যৌতুক তো অপরাধ। আপনার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মামলা হওয়া উচিত। আর এরকম পুরুষকে কোনো মেয়েরই বিয়ে করা উচিত নয়।

বিয়ের আগেই আপনার চিন্তা করা উচিত ছিল যে, মেয়ে 'কম শিক্ষিত, কম সুন্দর, নিচু পরিবারের'। তখন কেন লোভে পড়ে গেলেন? যে মেয়ে একবছর আপনার কথা অনুসারে বাবার বাড়িতে ছিল, তারপরে আবার আপনার কাছে এসেছে ঘর-সংসার করার জন্যে, সে-তো অনেক লক্ষ্মী মেয়ে, অনেক ধৈর্যশীল মেয়ে, অনেক সহনশীল মেয়ে। আপনি যদি এমন স্ত্রীকে ছেড়ে দেয়ার মতো ভুল করেন, সারাজীবন অনুতপ্ত হবেন।

এখন আপনি চাচ্ছেন তাকে ছেড়ে আবার একজনকে বিয়ে করবেন। আপনার ভাষায় যে হবে শিক্ষিত, সুন্দরী। মনে রাখবেন, মাকাল ফলও দেখতে সুন্দর, তাই সব শিক্ষাই শিক্ষা নয়। অতএব আপনি তওবা করুন। কারণ আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করতে ভালবাসেন। অনেক সময় শয়তান বিভ্রান্ত করে। তাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে দূরে থাকুন।

আর এখন থেকে স্ত্রীকে মনে করুন যে, স্বর্গের অপ্সরা। কারণ আসল মহিমা গুণে, রূপে নয়। তাকে স্ত্রী হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দেয়াটা এখন আপনার কর্তব্য। তাকে নিয়েই আপনি আপনার নতুন জীবন, সুন্দর জীবনের চিন্তা করুন। আমাদের সবার দোয়া থাকবে, যেন আপনি তাকে ভালবাসতে পারেন এবং সুখী হতে পারেন।

দেনমোহর/ কাবিন

প্রশ্ন : বিয়ের দেনমোহর অধিক পরিমাণে টাকা নির্ধারণ করা বর্তমানে ফ্যাশন হয়ে গেছে। এই ফ্যাশন আমার কাছে গলার ফাঁস মনে হয়।

উত্তর : ফ্যাশন এবং ফুটানি করতে গেলে অতিরিক্ত খরচ তো হবেই। দ্বিতীয়ত, দেনমোহরের ব্যাপারে স্বামীরা সতর্ক থাকবেন। দেনমোহর শোধ না করে যদি আপনি মারা যান, তাহলে ব্যভিচারী হিসেবে আপনার বিচার হবে।

বলবেন যে, স্ত্রী তো ক্ষমা করে দিয়েছে। বেকায়দায় পড়লে সবাই ক্ষমা করে। কিন্তু দেনমোহর ক্ষমার বিষয় নয়। এটা ফরজ হিসেবে আপনাকে শোধ করতে হবে।

সবচেয়ে ভালো হচ্ছে প্রথম সুযোগেই দেনমোহর শোধ করে ফেলা। তাহলে বিয়ের বন্ধনটা পবিত্র হবে, শুদ্ধ হবে। নবীজীর (স) হাদীস হলো, 'তুমি যত অঙ্গীকার করেছ, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অঙ্গীকার হচ্ছে দেনমোহর। স্ত্রীর দেনমোহর দ্রুত পরিশোধ করো। (দেনমোহর পরিশোধ করা ফরজ) দেনমোহরই স্ত্রীর সাথে তোমার দাম্পত্য সম্পর্ককে শুদ্ধতা দান করেছে।' [উকবা ইবনে আমির (রা); *বোখারী, মুসলিম; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৯০৪*]

এজন্যে আপনি যা দিতে পারবেন সেটাই দেনমোহর হিসেবে ধার্য করবেন। যদি ফ্যাশন করার জন্যে বেশি লিখতে হয়, তাহলে মেয়েপক্ষকে লিখে দিতে হবে যে, বর এত দিলেই হবে। বাকিটা পরিশোধ হয়ে গেছে। কীভাবে হয়েছে এটা আলাদা ব্যাপার। মানে এটা আইনের ফাঁক। তবে এটাও সততা হলো না। সততা হলো আপনি যা দিতে পারবেন, সেভাবে লিখবেন এবং সেটা আপনি শোধ করবেন। তাতে আপনার বন্ধনটা পবিত্র হবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা, ধর্মের শিক্ষা। যৌক্তিক সীমার অতিরিক্ত দেনমোহর ধার্য করা এবং শোধ না করা, এটা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ।

প্রশ্ন : কিছুদিন আগে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়েতে আড়াই লাখ টাকা দেনমোহর ধার্য করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন, অর্থ ছাড়া অন্য আর কোন জিনিস দিয়ে দেনমোহর পরিশোধ হতে পারে? আর এটি কতদিনে শোধ করা উচিত?

উত্তর : যদি পুরুষ হন, তাহলে দেনমোহর সাথে সাথে দিয়ে দেয়াটা হচ্ছে সর্বোত্তম। পরিশোধ নানানভাবে হতে পারে। মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে হতে পারে। অর্থ দিয়ে হতে পারে বা অপরপক্ষ যদি কোনো স্মৃতিস্মারককে মনে করেন যে, এটার দাম আড়াই লক্ষ টাকা—সেটা হতে পারে।

যেমন আমি একবার তাঁতিবাজারে তামা-কাসার দোকানে চার শ/ পাঁচ শ বছর আগের দুষ্প্রাপ্য একটা পুরনো বড় প্লেট পেলাম, যাতে ১২টা রাশি আঁকা ছিল। ১২টা রাশির ওপরে ২৭টা নক্ষত্রের জায়গায় ২৮ নক্ষত্র। সে সেটাকে ভাঁজ করে ফেলেছে অর্থাৎ গলিয়ে ফেলবে। আমি দাম জিজ্ঞেস করতেই বুঝল যে, আমার এটার প্রতি আকর্ষণ আছে। বলল, তিন শ টাকা। আমি শেষ পর্যন্ত ওটা ১৬০ টাকায় কিনলাম। এটা ৪৫ বছর আগের কথা।

এখন এটা যদি আমি তামাওয়ালার কাছে বিক্রি করি, তাহলে এর দাম একরকম। আর যদি মিউজিয়ামে দেই, তাহলে দাম আরেক রকম। আবার যদি বিদেশি সংগ্রাহকদের দেই, এর দাম আবার আরেক রকম। এটা আমি লাখ টাকায় বিক্রি করতে পারি। আবার বিক্রি না-ও করতে পারি।

তাই যদি অপরপক্ষ মনে করে যে, স্মৃতিস্মারকেই তার দেনমোহর পরিশোধ হতে পারে, আপনি দিতে পারেন। কিন্তু প্রতারিত করে নয়। আর অধিকাংশ স্বামী বলে, মাফ করে দাও। স্ত্রী তাকে ছেড়েও তো যেতে পারে না, তাই বলল—আচ্ছা, মাফ করে দিলাম। এভাবে উপায়ান্তর না থাকায় মাফ কিন্তু মাফ হবে না। এটা আপনার দেনা হিসেবে থেকে যাবে, যতদিন পর্যন্ত আপনি শোধ না করছেন। এই দেনা থেকে মুক্তি নাই।

অতএব সবচেয়ে ভালো হচ্ছে পরিশোধ করা। আর দেনমোহর ঠিক করবেন সবসময় সামর্থ্য অনুসারে। আপনি যদি মহিলা হন এবং স্বামীকে খুব ভালবাসেন; বলবেন, তুমি যা পারো দাও, এটাই আমার আপাতত পুরো দেনমোহর। আর স্ত্রী যদি দেখে যে স্বামীর সামর্থ্যই নাই। এটা তার আরেকটা চিন্তার কারণ হবে। তিনি বলবেন যে, ঠিক আছে যখন সামর্থ্য হবে, তখন তুমি আমাকে দেবে। কিন্তু দিতে হবে। কারণ এটা স্ত্রীর অধিকার।

এটা থেকে আপনি তাকে বঞ্চিত করবেন না এবং আপনার যতটুকু সামর্থ্য, সেভাবে করবেন। যে-রকম আমাদের এক সদস্য পাত্রীকে বলেছে যে, আমার ৪৫ হাজার টাকা দেনমোহর দেয়ার সামর্থ্য আছে। আর দেনমোহর শোধ না করা পর্যন্ত আমি বাসর ঘরে যাব না। বিয়ে হয়ে গেল। স্ত্রীও খুব খুশি। এই যে বোঝাপড়া—এটা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ দেনমোহরটা যেন জুলুম না হয়ে যায়। এটা সবসময় ঠিক হতে হবে সামর্থ্য অনুসারে।

প্রশ্ন : শরিয়ত অনুসারে দেনমোহর বা কাবিনের টাকা কত দিতে হবে?

উত্তর : বিয়েতে দেনমোহর বা কাবিন আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুসারে এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে হওয়া উচিত। তবে কাবিনের টাকা আপনারা পারিবারিকভাবে যত ঠিক করবেন তত দিতে হবে এবং বাসর ঘরে যাওয়ার আগে কাবিনের টাকা দিয়ে দেবেন। সেইভাবে কাবিন করবেন যেটা আপনি দিতে পারবেন এবং নগদ দিয়ে দেবেন।

প্রশ্ন : স্ত্রী যদি সমমর্মী হয়ে স্বেচ্ছায় দেনমোহর মাফ করে দেন, তাহলে সমমর্মিতার প্রকাশ পাবে। আপনার ছেলে হিসেবে এ ব্যাপারে জানতে চাই।

উত্তর : যেহেতু নিজেকে আমার ছেলে মনে করছেন—পিতা হিসেবে আপনার প্রতি উপদেশ হচ্ছে, সমমর্মিতার প্রকাশ প্রথমে আপনার দিক থেকে করুন। অর্থাৎ আপনি স্ত্রীর প্রতি সমমর্মী হয়ে স্বেচ্ছায় দেনমোহর দ্বিগুণ করে দিন। হয়তো বলবেন যে, এখন তো সামর্থ্য নেই। সামর্থ্য না থাকলে ঠিক আছে, একসাথে না দিয়ে ভাগ ভাগ করে দিন। কিন্তু কখনো ঋণী থাকবেন না।

ঋণের জন্যে মাফ চাওয়া নয়, বরং পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি হবে জয় করা। মনটাকে বড় করবেন সবসময়। আপনি তো আপনার স্ত্রীকেই দিচ্ছেন, আরেকজনের স্ত্রীকে তো নয়। তাহলে না দেয়ার বাহানা খুঁজবেন কেন? একজন বিশ্বাসী পুরুষ সবক্ষেত্রে দাতা হতে চায়। সুতরাং প্রার্থনা করুন—আল্লাহ! এত দাও যেন আমি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ দিতে পারি।

প্রশ্ন : একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে **১৩** বছর সংসার করেছে। সে তার স্ত্রীকে মারধর, অপবাদ ও যন্ত্রণা দিয়েছে। এরপর সে তিন মাসের খোরপোশ ও কাবিনের টাকা দেবে বলেও দেয় নি এবং স্ত্রীকে ফেলে রেখে চলে গেছে। এসব কারণে স্ত্রী নিজেই স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছে। পরে লোকটি বলে যে, স্ত্রীকে সে নিজে তালাক দেয় নি, তাই সে কোনো টাকা দিতে পারবে না। আমার প্রশ্ন, এই মহিলা কি কিছু টাকা মোহরানা পাওয়ার অধিকারী নয়?

উত্তর : বিয়ের সাথে সাথে পুরুষের দায়িত্ব হচ্ছে মোহরানা আদায় করা। মোহরানার সম্পর্ক ডিভোর্সের সাথে নয়, সম্পর্কটা বিয়ের সাথে। ডিভোর্স হোক বা না হোক, মোহরানা পাওয়াটা স্ত্রীর হক। এটা আদায় করা স্বামীর জন্যে ফরজ। বিবাহিত জীবনকে সত্যায়িত করার জন্যে মোহরানা হচ্ছে শর্ত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এ ঋণ শোধ না করাটা অন্যায়; বরং বিয়ের এত বছর পর বকেয়া মোহরানা বর্তমান বাজারমূল্যে আদায় করা উত্তম।

মোহরানা আদায় না করে যদি কোনো স্বামী মারা যান, তাহলে তিনি ব্যভিচারী হিসেবেই সাব্যস্ত হবেন। মোহরানা দেয়াটা এত গুরুত্বপূর্ণ! এটা আমার কথা নয়, নবীজীর (স) একটি হাদীস হলো, 'দেনমোহর না দেয়ার নিয়ত করে যদি কেউ কোনো নারীকে বিয়ে করে, তবে সে একজন ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে। [আবু হুরায়রা (রা); *ইবনে মাজাহ; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৯০৩*]। অতএব কোনো হাজবেন্ড এই ভুল করতে যাবেন না।

প্রশ্ন : একজন পুরুষ কেন তার স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান করবে? কারণ পুরুষের ওপর তো অনেক বেশি দায়িত্ব, বিশেষত আর্থিক।

উত্তর : একজন পুরুষ মানুষের কাছ থেকে এরকম কথা! যারা নিজেরা দায়িত্ব নিতে চায় না, আমি তাদেরকে পুরুষ মনে করি না। আপনি যেহেতু বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন, দায়িত্ব তো আপনাকেই নিতে হবে। তা না হলে মেয়েরা আপনাকে প্রস্তাব দেবে এবং ঘরজামাই করে নিয়ে যাবে। আপনি যদি দায়িত্ব না নেন, কেউ না কেউ তো দায়িত্ব নেবে। জামাই হতে না পারলে ঘরজামাই হবেন। শব্দটা কিন্তু নতুন নয়, আগেকার দিনেও ঘরজামাই ব্যবস্থা ছিল।

সব জামানায় কিছু লোক এরকম ছিল, যারা দায়িত্ব নিতে চায় না। দায়িত্ব না নিলে আপনার হাতে দায়িত্ব থাকবেও না। এটা খুব সহজ হিসাব। যে সমাজে পুরুষরা দায়িত্ব নেয় না, সে সমাজে মেয়েরা দায়িত্ব নেয়। সেটাকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলে, যা আমাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মধ্যেই আছে। তারা বিয়ে করে ছেলেকে নিয়ে যায়। আর আসলে তো দেনমোহর হচ্ছে একটা ধর্মীয় বিধান।

প্রশ্ন : সম্প্রতি আমাদের বড় ছেলের বিয়ের কাবিন হয় মসজিদে। মোহরানা চার লক্ষ টাকা। পুরো টাকা মসজিদে কনেপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছি।

উত্তর : মসজিদে কাবিন হয়েছে মানে বিয়ের অনুষ্ঠান করেছেন একটা। দেনমোহর চার লক্ষ টাকা কনেপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন সাথে সাথে। এটাই তো হওয়া উচিত। আল্লাহ সবদিক থেকে ভালো করুন।

আজকাল ফ্যাশন বেরিয়েছে, এক কোটি টাকা দেনমোহর, কিন্তু শোধ করার নাম নাই। এই ভণ্ডামি কেউ করবেন না। কাবিননামায় যা লিখবেন সেই টাকা দিয়ে দিতে হবে। যেটা দিতে পারবেন সেটাই লিখবেন। মোহরানা যথাযথভাবে আদায় করাাই আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের (স) নির্দেশ।

প্রশ্ন : পবিত্র কোরআন ও আপনার আদেশমতো মোহরানা পরিশোধ সাপেক্ষে এই বছর বিয়ে করব। আমাদের এলাকার কাজী সাহেব, সম্পর্কে আমার আত্মীয়। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একদিন বললেন, বিয়ের সময় মোহরানা পরিশোধ করে ফেললে মহিলাদের কেউ কেউ স্বামী ত্যাগের জন্যে নানানরকম বাহানা খুঁজতে থাকে। এমনকি পালিয়েও যেতে পারে, যা ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে হয়েছে। মেহেরবানি করে বলুন আমি কী করতে পারি?

উত্তর : নিজ স্ত্রী সম্পর্কে কখনো এই ধারণা করবেন না। কখনো না! একজন মানুষ এত নেতিচিন্তা কেন করবে যে, দেনমোহর দিয়ে দিলে আমার স্ত্রী

পালিয়ে যেতে পারে? অতএব মোহরানার টাকা তাকে দেবো না—এটা একদম ভুল চিন্তা। চিন্তারও তো একটা স্ট্যান্ডার্ড থাকা উচিত!

নবীজী (স) কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ‘কোনো স্বামী যদি দেনমোহর প্রদানে গড়িমসি করে, স্ত্রীকে ধোঁকা দেয় এবং দেনমোহর না দেয়ার ফন্দিফিকিরের চিন্তা করতে করতে তা শোধ করার আগেই মারা যায়, তাহলে মহাবিচার দিবসে একজন ব্যভিচারী হিসেবেই তাকে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হতে হবে।’ [শোয়াইব আল খাইর (রা); *তাবারানী; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৯০৫*]

দেনমোহর আদায়ের নির্দেশটা এত কঠোর! মোহরানা শোধ না করে মারা গেলে ব্যভিচারী হিসেবে রোজ হাশরের দিন আপনার উত্থান ঘটবে। আর মৃত্যু তো যে-কোনো সময় হতে পারে। এজন্যে বিয়ের সাথে সাথে দেনমোহর পরিশোধ করে দেয়া উচিত। এটা স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্কের শুদ্ধতা দান করে। এ কারণে শোধ করা সম্ভব এমন যৌক্তিক সীমার মধ্যে দেনমোহর নির্ধারণ করা উচিত। বেশি চাইলে দৃঢ়ভাবে বলুন—এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিছু কিছু ব্যাপারে মিনমিন কিনকিন করতে হয় না।

আর সত্যিই যদি কেউ দেনমোহর নিয়ে পালিয়ে যায়, আপনি শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলবেন যে, শুধু টাকা নিয়ে পালিয়েছে। জান নিয়ে তো যায় নি! আসলে এরকম বদ ভাবনা করলে দেখবেন যে, বিয়েতে বদ ঢুকে গেছে। আপনি না চাইলে স্ত্রী কেন পালাবে? আপনার সেই আত্মিক শক্তি থাকা উচিত যেন স্ত্রী পালিয়ে না যায়। সবসময় আল্লাহকে বলবেন যে, এমন স্ত্রী দাও, যে আমাকে পেয়ে শুকরিয়া আদায় করবে। তাহলে সে-রকম স্ত্রী পাবেন।

প্রশ্ন : বিয়ের কথা চলছে। বর কাবিন ৫০ লক্ষ এক টাকা ধার্য করেছে। কিন্তু বিয়ের পরবর্তী সময় দেবে বলেছে। বর্তমানে পারছে না। গুরুজী, বিয়ের তাৎপর্য এবং কাবিন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনার অভিমত জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : যে কাবিন দেয়া হয় না, সেই কাবিন ধার্য করাটা একধরনের প্রতারণা। লোক দেখানোর জন্যে এটা করা হয়। এটা অনেক বড় পাপ। কাবিনের শর্ত হচ্ছে যে, দেনমোহর যেটা ঠিক করবেন সেটা অবশ্যই দিতে হবে। যদি পরিশোধ করতে না পারেন, যত পরিশোধ করতে পারবেন তত দেনমোহর ধার্য করবেন।

দেনমোহর লিখবেন ৫০ লক্ষ টাকা, ৫০ হাজার টাকা হাতে নেই। এর চেয়ে ফালতু জিনিস আর হয় না। ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রথমে অন্তত ২৫

লক্ষ টাকা তো শোধ করতে পারতে হবে। বাসর রাতে যাওয়ার আগে পুরোটাই শোধ করা উচিত।

ব্যাপারটা কিন্তু খুব পরিষ্কার। প্রত্যেক পুরুষকে বলি, দেনমোহর হচ্ছে স্ত্রীর অধিকার। এটা শোধ করা অবশ্য কর্তব্য। এটা মাফ চাইলে হবে না। কারণ বাসর রাতে যদি বলেন মাফ করে দিও, এটা আসলে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করা। এটা স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা, যা অনেক বড় অন্যায়। কারণ স্ত্রী তখন কী করবে? মাফ করে দিয়েছি বলা ছাড়া তার কী করার আছে? কিন্তু কোনো স্ত্রী এটা মন থেকে মাফ করে না। আর আল্লাহ তো আপনার মনের অবস্থা ভালো করেই জানেন যে, আপনি কীভাবে স্ত্রীকে ঠকাচ্ছেন, তার সাথে প্রতারণা করছেন।

জীবনসঙ্গী ও কোয়ান্টাম

প্রশ্ন : একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসেবে আরেকজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটকে বেছে নেয়াই কি ভালো নয়? কারণ সে-ক্ষেত্রে তার চিন্তাচেতনা, চাওয়াপাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য থাকবে।

উত্তর : এটা হতে পারে। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে তা হচ্ছেও। এমনকি বিয়ের কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পর হয়তো কোনো একপক্ষ অনুরোধ করছে যে, তাদের পাত্র/ পাত্রী যেহেতু কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট তাই অপরপক্ষের পাত্রী/ পাত্রও কোর্স করে নিলে ভালো হয়। তখন জানা গেল যে, সেই পাত্র/ পাত্রীও কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট এবং তারাও এটাই চেয়েছেন।

আর একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটের এই প্রত্যয় এবং ব্যক্তিত্ব থাকা উচিত যে, বিয়ের পর তার স্বামী/ স্ত্রীকে সে যেন কোর্স করানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট যদি বাইরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, তাহলে তার স্বামী/ স্ত্রীকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারা উচিত।

প্রশ্ন : কোয়ান্টামের কাউকে জীবনসঙ্গী বানাতে হলে কী পদক্ষেপ নিতে হবে?

উত্তর : কোয়ান্টামের কাউকে জীবনসঙ্গী করতে হলে প্রথমত, তার উপযুক্ত হওয়ার মতো গুণাবলি অর্জন করতে হবে। তারপর যদি ছেলে হন, তাহলে মেয়ের অভিভাবকদের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে হবে। আর যদি মেয়ে হন, তাহলে মনছবি দেখতে থাকুন ও দোয়া করুন।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে দুজনই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য না হলে দাম্পত্য জীবনে কি কোনো অসুবিধা হতে পারে?

উত্তর : কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হলে সমচেতনার বিষয়টি থাকে, অবশ্য যদি তিনি আন্তরিক এবং সক্রিয় হয়ে থাকেন। তারপরও যদি সম-সামাজিক, সম-সাংস্কৃতিক না হয়, তাহলে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হয়েও কিন্তু দাম্পত্য জীবন অসুখী হতে পারে। আর কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট নন, কিন্তু একই পরিমণ্ডলের হলে তাকে নিয়েও পরিবারে সুখী হওয়া যায়।

বিয়ের পর জীবনসঙ্গীকে কোয়ান্টাম চেতনায় উদ্বুদ্ধ করুন। সেটাই বরং বেশি ভালো। সে-ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির সদস্যদেরকেও আপনি কোয়ান্টামে একাত্ম করতে পারছেন। তারাও একটি সৎসঙ্ঘের সংস্পর্শে এসে ভালো থাকতে পারবেন। এজন্যেই আমরা বলি, কোয়ান্টাম পরিবারের ভেতরে বিয়ে ভালো, বাইরে বিয়ে হলে আরো ভালো।

বিয়ে হচ্ছে না

প্রশ্ন : জীবনসঙ্গী পাওয়াটা কি আল্লাহ নির্ধারিত? বিয়ে কি সম্পূর্ণ আল্লাহর হুকুমে হয়, নাকি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে? দিন দিন পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশের পরিবারগুলো প্রধানত পুরুষপ্রধান হলেও বর্তমানে নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। কর্মজীবী ক্যারিয়ারিস্ট মহিলাদের হাউজ হাজবেন্ড ছাড়া কোনো উপায় কি নেই? মনে অনেক কষ্ট ও ক্ষোভ। উচ্চশিক্ষিত হয়েও নারীরা যোগ্যতা অনুযায়ী কেন তার সঙ্গী পাচ্ছে না? কেন বিয়ে হচ্ছে না?

উত্তর : শুধু বিয়ে কেন, সবকিছুই আল্লাহ নির্ধারিত। কিন্তু আপনাকে তো স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। খামোখা আল্লাহর হুকুমের ওপর চালিয়ে দেবেন না। আল্লাহ সবই হুকুম করে রেখেছেন, কিন্তু তামিল তো আপনাকে করতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়মে আপনাকে অগ্রসর হতে হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন তারাই করেন, যারা বাছবিচার করতে করতে দেরি করে ফেলেন। বাছবিচার করার ক্ষেত্রে নিজের অবস্থানটা দেখা জরুরি। সবার কল্পনায় থাকে রাজকুমার। নিজে রাজকুমারী কিনা, এটা দেখতে হবে তো! শুধু ভাবলাম যে, আমাকে এই এই পেতে হবে। আমার অমুক বান্ধবীর

স্বামী এরকম। আমার স্বামী তার চেয়ে বড় হতে হবে। এসব ভ্রান্তির কারণে অনেকের বিয়ে দেরি হয়ে যায়।

বিয়ের ব্যাপারে সবসময় পছন্দ করবেন একজন ভালো মানুষ। পুরুষ হোন অথবা নারী; তার ডিগ্রি, পরিবার সবকিছু দেখতে পারেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানুষটি ভালো মানুষ কিনা। যদি মানুষ ভালো হয়, তাহলে তার অনেক ঘাটতি বিবেচনা থেকে বাদ দিতে পারেন।

সময়মতো বিয়ে না করে যদি ভাবেন যে, আরো একটু দেখি, আরো একটু দেখি। অথবা আমি আগে ক্যারিয়ার গুছিয়ে নিই, এই হই সেই হই, তারপরে বিয়ে করব, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিয়েটা পিছিয়ে যায়। বিয়ের পর ক্যারিয়ার গোছালে অসুবিধা কী? মেয়েদের বয়স যখন বেড়ে যায়, তখন বিয়ের প্রস্তাব আসার সম্ভাবনাটা কমতে থাকে।

কোনো পিএইচডি করা মেয়ে যদি মনে করে যে, আমার পিএইচডিধারী স্বামী চাই; তা না-ও পেতে পারে। কারণ পিএইচডিধারী ছেলে ভাবে যে, এ মেয়ে আমাকে মানবে না। সে চাইবে তার কথাবার্তা শুনবে এরকম কাউকে, যদি না আগে থেকে কোনো সম্পর্ক থাকে। এটা বুঝতে হলে নারী ও পুরুষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হবে। পুরুষরা ডমিনেটিং। যদিও পুরুষদের মধ্যেও কেউ কেউ ডাকসাইটে স্ত্রী থাকাটা পছন্দ করে। এমনকি ঘরজামাই হতেও কোনো আপত্তি থাকে না, কিন্তু এটা ব্যতিক্রম। নাইনটি পার্সেন্ট পুরুষ এমন মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, যাকে সে ডমিনেট করতে পারবে।

অতএব যদি চান যে, স্বামী আপনার দায়িত্ব নিক, তাহলে বয়স থাকতেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন। তা না হলে কী করবেন? অনেক বেকার ছেলে আছে, তার দায়িত্ব নিয়ে নেবেন। নিজের আর্থিক সামর্থ্য থাকলে স্বামীর অর্থের দরকারটা কী? অর্থাৎ ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটতে গিয়ে বা অন্য কারণে কোনো মহিলার বিয়ে করতে দেরি হয়ে গেলে সাথে সাথে চাওয়ার তালিকা বা চাহিদা কমিয়ে ফেলবেন। তখন শুধু বিবেচনা করতে হবে যে, মানুষটি ভালো কিনা। তাহলে বিয়ে হয়ে যাবে। আপনার চেয়ে কম যোগ্য কাউকে বিয়ে করে ফেলবেন। এ নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই, হতাশারও কিছু নেই।

আসলে পারিবারিক জীবনে স্ট্যাটাসটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্ট্যাটাস বাইরের ব্যাপার। পারিবারিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পারস্পরিক যত্ন ও সম্মান দেয়া। এই সম্মান ও যত্নটুকুই মানুষ চায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, জীবনসঙ্গী মানুষ হিসেবে তেমন ভালো নয়। কিন্তু সে তার সঙ্গীর ব্যাপারে খুব কেয়ারিং। ফলে হাজারো মানুষের অভিযোগ থাকলেও সেই স্বামী বা স্ত্রীর কোনো অভিযোগ থাকে না। তারা স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট

থাকে। অন্যরা তাকে খারাপ বলল না ভালো বলল, তাতে তার কিছু আসে-যায় না। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ, কেয়ারিং থাকাটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বিয়ে না হওয়া শুধু আমাদের দেশে নয়, সারাবিশ্বে এটা একটা সমস্যা। ব্রিটিশ পত্রিকা *দ্য গার্ডিয়ান*-এর ২৫ জুন ২০১৮ তারিখের একটা রিপোর্ট হচ্ছে, Too smart, too successful : Mongolia's superwomen struggle to find husbands. এতে বলা হয়, অল্পবয়সী মেয়েদেরকে শেখানো হয় তোমার সফল হওয়া উচিত। তারা সফল হয় ঠিকই, কিন্তু তখন তাদের সমমানের জীবনসঙ্গী পাওয়া যায় না। মঙ্গোলিয়ান নারীদের এখন দুটি সমস্যা। প্রথমত, বয়স ২৯ হওয়ার আগেই ক্যারিয়ার গড়তে হবে এবং বিয়ে করতে হবে। যাদের বয়স ২৯-এর বেশি, বিয়ে নিয়ে তাদের নানা ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। তাই ওখানকার প্রতিষ্ঠিত মহিলারা এখন আর প্রতিষ্ঠিত স্বামী চায় না। কারণ তারা স্বামীর ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল নয়। তাদের চাওয়া শুধু একজন পুরুষ, যে তাকে কেয়ার করবে, তার যত্ন নেবে। তাদের প্রয়োজন শুধু একজন স্বামী, যে স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ দেবে।

রিপোর্টে একজন মঙ্গোলিয়ান নারী অর্থনীতিবিদ বলেন, তিনি দেশের বাইরে মাস্টার্স করতে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে কয়েক বছর ধরে যোগ্য পাত্র খুঁজছেন। এখনও সফল হন নি। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি যত যোগ্য পাত্র মনে মনে চাইছিলেন ততটা না হলেও চলবে। তার ভাষায়, 'এখন আমি এমন পাত্রের কথা ভাবছি, সে অনেক সফল না হলেও হবে। তার অনেক অর্থ বা উচ্চশিক্ষা না থাকলেও সে শুধু আমার প্রতি যত্নশীল হবে এবং আমাকে বুঝবে—এটুকুই যথেষ্ট।'

অতএব সময় থাকতে বিয়ে করবেন। আপনার দরকার একজন সঙ্গী। আপনি যদি বেশি যোগ্য হয়ে যান, এই মঙ্গোলিয়ান মহিলাদের ফিলোসফি অনুসরণ করবেন। বিয়ে করবেন এমন কাউকে, যে আপনাকে বুঝবে, যত্ন নেবে, আপনার পাশে থাকবে; তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কম হোক বা তার অর্থ কম থাকুক। কারণ যোগ্যতা বা বয়সে আপনার সমপর্যায়ের কেউ আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না, যদি আগে থেকে আপনার সাথে তার সম্পর্ক না থাকে। বিয়ের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল হবেন এবং কম্প্রোমাইজ করবেন।

আসলে বিয়ের ক্ষেত্রে হতাশায় ভোগেন তারাই, যারা সবদিক মিলাতে চান। সবদিক কখনো মেলে না। বিয়ে হচ্ছে একটা সমঝোতা, বোঝাপড়ার সম্পর্ক। এখানে কিছু পাবেন, কিছু ছাড় দিতে হবে। যত মানিয়ে নিতে পারবেন, তত আপনি সুখী হবেন।

প্রশ্ন : বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার পর আমার পরিবারের সবাই চায় আমার দ্বিতীয় বিয়ে হোক। ভালো সম্বন্ধও আসে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয় না। যার কারণে আমার পরিবার আমার ওপর রাগ করে আছে। বর্তমানে আমার মানসিক অবস্থা ভালো না। এ থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাব জানাবেন।

উত্তর : পরিবারের সদস্যরা সাধারণত এ-ক্ষেত্রে খুব জুলুম করেন। আপনার প্রথম বিয়ে ভেঙে গেছে এবং দ্বিতীয়বার বিয়ে হচ্ছে না। এতে আপনার দোষ কোথায়? কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না বলে পরিবারের অন্যেরা সাধারণত সব দোষ চাপিয়ে দেয় মেয়েটির ঘাড়ে। তার জীবনটাকে আরো অতিষ্ঠ করে তোলে। তার অশান্তির পরিমাণটা আরো বাড়িয়ে দেয়।

বোঝাই যাচ্ছে, চারপাশের কথা শুনতে শুনতে আপনি নেতিবাচক হয়ে উঠছেন। নেতিবাচক কথাকে প্রশ্রয় দেবেন না। আসলে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি তো আপনি বদলাতে পারবেন না। আপনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটাকে বদলে ফেলুন। নিজের মধ্যে হতাশার প্রশ্রয় দেবেন না। আপনি মনছবি দেখুন। দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে নিজেকে উপযুক্ত করুন, প্রস্তুত করুন। আপনাকে দেখলেই যদি মনে হয়—আপনি হতাশ বিবর্ণ একজন নারী, তাহলে কোন পুরুষ আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে?

আপনাকে দেখে যেন মনে হয়—আপনি ফুরিয়ে যান নি। আপনার মধ্যে জীবন রয়েছে। যে বিয়ে করতে আসবে, তাকে যখন এই অনুভূতিটা দিতে পারবেন, অবশ্যই বিয়ে হবে। অর্থাৎ যাকে বিয়ে করবেন বা যে আপনাকে বিয়ে করবে—প্রথম দেখায় তার যেন মনে হয় যে, 'হাঁ, এই তো। একেই তো আমি খুঁজছি!' সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

প্রশ্ন : গত দুই বছর ধরে আমি বিয়ের জন্যে যা যা করার সবকিছুই করেছি। কিন্তু এখনো বিয়ে হচ্ছে না দেখে বার বার মনে হচ্ছে, আমি নিশ্চয়ই এমন কোনো পাপ করেছি, যে কারণে স্রষ্টা আমার চাওয়া পূরণ করছেন না। গুরুজী, দয়া করে আপনি আমাকে এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় বলে দেবেন। নাকি ধরে নেব—স্রষ্টা আমার কপালে বিয়ে লেখেন নি!

উত্তর : আসলে বিয়ে না হওয়াটা কোনো পাপের ব্যাপার নয়। ঠিক যেমন একজনের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটা তার কোনো পাপের কারণে নয়। তাছাড়া যত কিছু করা দরকার আপনি করেছেন। তারপরও যখন চাওয়া পূরণ হচ্ছে না, মনে করতে হবে যে, এ সময়ে চাওয়া পূরণ না হওয়ার মধ্যেই আপনার

মঙ্গল। স্রষ্টা যখন মনে করবেন যে, আপনার চাওয়া পূরণ হওয়ার সময় এসেছে এবং এটা এখন কল্যাণকর, তখন নিশ্চয়ই তা পূরণ করবেন।

আবার মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যখন অনেক জায়গা থেকে প্রস্তাব আসতে থাকে, তখন মেয়ে বা তার পরিবার অনেক বাছবিচার করে। ছেলের খুঁত বের করতে থাকে। এভাবে বয়স পার হয়ে যায়। তখন আর পাত্র পাওয়া যায় না।

অতএব সময়মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যখন বয়স পেরিয়ে যায়, তখন আমরা অনেক ছাড় দিতে চাই। কিন্তু অনেক ছাড় দিয়েও তখন কাজ হয় না। আমরা আপনার প্রতি সমব্যথী এবং ভালো বিয়ের জন্যে দোয়া করি।

প্রশ্ন : কোয়ান্টামে দান ও হিলিংয়ে নাম দেয়ার পরেও কোনো চাওয়া পূরণ না হলে কোয়ান্টামের দায়িত্বশীলদের বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই সেটা পাওয়া আপনার জন্যে মঙ্গলজনক ছিল না, তাই স্রষ্টা আপনাকে দেন নি। চাকরি, দেশের বাইরে যাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেনে নেয়া যায়, সেটা মঙ্গলজনক নয় দেখে হয় নি। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এটা মঙ্গলজনক নয়, একথা কি বলা যায়? একজন মানুষের জীবনে বিয়ে না হওয়াটা কি মঙ্গলজনক হতে পারে?

উত্তর : বিয়ে না হওয়াটাও মঙ্গলজনক হতে পারে। আমাদের একজন সাংবাদিক সহকর্মী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। তার স্ত্রী মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমার কাছে এলেন। আমি তখন এস্ট্রলজার। তাকে বললাম, এখন বিয়ে দেবেন না। তিনি বললেন, পাত্র তো খুব ভালো। আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত ডাক্তার-দম্পতির ছেলে। বললাম, এখানে তো কল্যাণ দেখছি না। কিন্তু উনি তারপরও বলতে লাগলেন, এরকম প্রস্তাব তো আর পাওয়া যাবে না। আমার খুব মায়া লাগল। কিন্তু বুঝলাম যে, আমার এখন আর কিছু করার নেই।

বিয়ের পরে এই মেয়ে তার স্বামীর হাতে খুন হলো। তখন মা এসে কী কান্না! বললেন, আপনার কথা কেন তখন শুনলাম না! সান্ত্বনা দিলাম—আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, আমাদের কারোরই কিছু করার নেই। কারণ ঘটনা ঘটে গেলে আর কিছু বলাটা হচ্ছে বোকামি। অতএব বিয়ের মধ্যেও যে অকল্যাণ নেই, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। সন্তান না হওয়ার মধ্যেও যে কল্যাণ নেই, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই।

আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি চেষ্টার কিছু বাদ রাখেন নি। তারপরও যখন বিয়ে হচ্ছে না তখন মনে রাখতে হবে যে, এটার মধ্যে

নিশ্চয়ই কোনো কল্যাণ আছে। কীসে কল্যাণ আর কীসে অকল্যাণ তা ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারে না। সবসময় মনে রাখতে হবে, আপনি চেষ্টার মালিক, পরিশ্রমের মালিক; কিন্তু ফলাফলের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই ফলাফল নিয়ে কখনো ভাববেন না।

প্রশ্ন : আমি মা-বাবার একমাত্র কন্যা। বাবা শিল্পপতি, মা শিক্ষিকা। আমি লন্ডন থেকে উচ্চশিক্ষার পর এখন একটি বিদেশি ফার্মে বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি। সবাই বলে আমি যথেষ্ট শালীন মার্জিত ভদ্র সুশ্রী। তবুও বয়স ২৭ হয়ে গেল, এখনো বিয়ে হচ্ছে না। এটাকে তকদির আর ভাগ্যের লিখন ছাড়া কী বলব?

উত্তর : আসলে একজন পুরুষ একজন মহিলাকে বিয়ে করে তার ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে। আপনি উচ্চশিক্ষার পর বিদেশি ফার্মে বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। আপনাকে যিনি বিয়ে করবেন তাকে তো সাহসী হতে হবে। আপনার যেহেতু ভরণপোষণের প্রয়োজন নেই, অতএব আপনি একজন পুরুষের দায়িত্ব নিন। তাহলে দেখবেন যে, বিয়ে হয়ে গেছে। আসলে আপনাকে বাস্তব চিন্তা করতে হবে।

বিয়ে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় না—আমরা মনে করি ভাগ্যে থাকলে তো হতো। এটার কারণ এখনকার অধিকাংশ মেয়ে সিনেমার নায়ক খোঁজে। ওরকম সুশ্রী, ওরকম ম্যানলি হতে হবে। কিন্তু বিয়েটা তো সিনেমা নয়। যখন বিয়ের প্রস্তাব আসে তখন অনেকেই বলে যে, এখন না, পরে। কিন্তু যখন আপনি দেরি করবেন, মাস্টার্স করে আপনার একটা ভালো অবস্থান হলো, একটা চাকরি হলো—তখন আপনার চেয়ে উঁচু ছাড়া নিচের বা সমপর্যায়ের কেউ তো আপনাকে বিয়ে করতে চাইবে না। বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ পুরুষই চায়, সে যেন কর্তৃত্ব করতে পারে।

অতএব আপনাকে সেটা বুঝতে হবে। যখন বিয়ের প্রস্তাব আসে, তখন অনেকেই ম্যাচিং হচ্ছে না করতে করতে সময় পার করে দেয়। তারপরে বয়স যদি ৩০ হয়ে যায়, তখন পছন্দমতো বিয়ে করতে পারা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ ৪০ বছরের ছেলে হলেও সে ঠিকই ২০-২২ বছর বয়সের মেয়ে বিয়ে করার চিন্তা করবে। এজন্যে সময়মতো সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রশ্ন : আমি সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, ব্যক্তিগত অর্জনে অনেক বড় পদাধিকারী। কিন্তু আমার বিয়ে হচ্ছে না। এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর : আমরা দোয়া করছি এবং আপনাকে উদ্যোগ নিতে হবে। আসলে আমরা অনেক সময় ভুল করি। কারণ আমরা ছাড় দিতে পারি না। মনে করি যে, আমার স্বামী এইরকম হবে, আমার স্ত্রী এইরকম হবে। আপনি অনেক বড় পদাধিকারী হতে পারেন বা অনেক বড় পেশাজীবীও হতে পারেন। কিন্তু কাউকে আকৃষ্ট করার জন্যে যেটা দরকার সেটা তো থাকতে হবে।

খুব ছোট্ট উদাহরণ দেই। দেশের নামী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। তিনি কনে দেখতে গিয়েছেন। যাওয়ার সময় তিনি প্লাস্টিকের একটা আংটি পরে গিয়েছেন। কনে এটা দেখেই এই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে। এখানে পাত্র-পাত্রী দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গির বিষয় আছে। যেমন, পাত্র যদি মাথায় রাখতেন, তার বেশভূষা দিয়েও তাকে যাচাই করা হতে পারে, তাহলে তিনি আরো সচেতন হতে পারতেন।

আবার কনেপক্ষ হয়তো বড় বিষয়গুলোর বাইরেও এ ধরনের বিষয়গুলো দেখে বাছাই করার প্রবণতায় অভ্যস্ত। অর্থাৎ অনেক কারণে বিয়ে হয়, আবার অনেক কারণে বিয়ে ভেঙেও যায়। বাস্তবতার আলোকে বিষয়গুলো যাচাই করাই উত্তম।

প্রশ্ন : পরিবার বেশ কিছুদিন ধরে আমার বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না বলে সবাই আমাকে নিয়ে খুব চিন্তা করছে এবং হতাশ হয়ে পড়েছে। আমার পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের এই চিন্তা এবং হতাশার ফলে আমি খুব বিরক্ত। খুবই হীনম্মন্যতায় ভুগছি। এখন আমার কী করণীয়?

উত্তর : আমরা দোয়া করি যেন আপনার ভালো বিয়ে হয়। আর বিয়ে না হওয়া নিয়ে কখনো হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না। আপনি আপনার পরিচয় সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। বিয়ে যখন হবে—শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আপনি চাচ্ছেন কিন্তু হচ্ছে না, এটা যেন আপনার হীনম্মন্যতার কারণ না হয়।

পৃথিবীতে অনেক পুরুষ এবং অনেক মহিলার বিয়ে হয় নি। অনেকে জীবনে বিয়ে করেন নি। ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট এ পি জে আবদুল কালামও তাদের মধ্যে অন্যতম। সেটা তার সাফল্যের পথে বাধা হয় নি। বিখ্যাত সংগীতশিল্পী লতা মুঙ্গেশকর বিয়ে করেন নি। সেটা কি তার শিল্পী হিসেবে পরিচয় সৃষ্টিতে কোনো সমস্যা হয়েছে? তা তো হয় নি।

মনে রাখবেন, সময়মতো বিয়ে হওয়াটা আনন্দের এবং সেটাই কর্তব্য। কিন্তু যদি না হয়, আপনি তো আর জোর করে বিয়ে করতে পারবেন না। যেহেতু সেটা করতে পারছেন না, অতএব সবর করুন আর নিজের পরিচয়

সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন এবং মানুষের কল্যাণে কাজ করতে থাকুন। তাহলে আপনি সবরকম হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

প্রশ্ন : অনেক বছর যাবৎ পরিবার গঠনের জন্যে প্রচেষ্টা ও সামর্থ্য থাকলেও আমার বিয়ে হচ্ছে না। এখনো আমি বিয়ে করতে আগ্রহী। মনছবিও করছি। বিয়ের বাধা হিসেবে জ্বীনমুক্তির জন্যে করণীয় কী? পরামর্শ ও দোয়া চাই।

উত্তর : বিয়ে আটকে রেখেছে জ্বীন—এটি একটি ভুল ধারণা। আপনাকে নিয়ে জ্বীন করবেটা কী? জ্বীনের এই প্রসঙ্গটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একশ্রেণির মানুষের তাবিজ-কবচ বিক্রি করার একটা ফন্দি। তারা বলে, তাবিজের জন্যে তিন মোহনার পানি, সাত মোহনার বালু, অমুক জায়গার এই এই লাগবে। আর আপনিও এগুলোর পেছনে কাড়ি কাড়ি টাকা শেষ করতে থাকেন। কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল শূন্য।

আসলে সমস্যাটা আপনার ভেতরের নেতিবাচকতা এবং অস্থিরতা। ভেতরে যদি অস্থিরতা থাকে, আপনার প্রতি কারো আকর্ষণ সৃষ্টি হবে না। প্রস্তাব এলেও ফিরে চলে যাবে। কারণ মানুষের দৃষ্টি আটকায় স্থির জিনিসের প্রতি। অনেক সময় কাউকে বাইরে থেকে দেখে অস্থির মনে হলেও তার ভেতরটা স্থির। ফলে সে আকর্ষণ করে।

এজন্যে প্রথমত আপনি নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হোন। শোকরগোজার হোন। মন থেকে অনুভব করে দিনে হাজার বার 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ' জিকির করুন। ভাবুন, 'আল্লাহ যে অবস্থায় রেখেছেন, ভালো রেখেছেন। এতদিন বিয়ে হয় নি, হয়তো এর মধ্যেই আমার কোনো মঙ্গল ছিল। এখন আমি যেহেতু চাচ্ছি, প্রভু অবশ্যই দেবেন।' এ ভাবনায় বিশ্বাস রাখুন এবং দোয়া করতে থাকুন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ সবই পারেন।

অতএব আপনি নিজেকে গ্রহণ করুন ইতিবাচকভাবে এবং মনটাকে স্থির করুন। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন এবং আল কোরআন ও হাদীসের বাংলা মর্মবাণী পড়ুন। তাহলে আপনার অন্যান্য প্রচেষ্টাও কাজ করবে। প্রয়োজনে কাউন্সিলরের সাথে আলাপ করুন।

প্রশ্ন : আমি মা-বাবা হারা একজন অবিবাহিত মেয়ে। বর্তমানে একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করছি। সম্পদ বা টাকাপয়সা তেমন কিছু নেই। সেজন্যে পাত্রপক্ষরা তেমন আগ্রহ দেখায় না। আমি বিয়ের মনছবি দেখি নিয়মিত। আমার আরো কী করা উচিত?

উত্তর : আসলে সম্পদ এবং টাকাপয়সা দেখে যদি পাত্রপক্ষ আসে, সে-রকম পাত্রকে বিয়ে না করাই উচিত। এখানে আপনার বাধাটা কিন্তু আপনি নিজে। আপনার মা-বাবা নেই, সম্পদ নেই—এই নেতিবাচকতায় আপনি ভুগছেন। অর্থাৎ আপনার একটা অন্তর্গত হীনম্মন্যতা রয়েছে, যে কারণে কেউ আগ্রহ দেখায় না।

আমরা কোর্সেও বলে থাকি, তেল দেয়া হয় তেলে মাথায়। আপনাকে দেখে যদি কেউ মনে করে যে, আপনি নেতিবাচকতায় ভুগছেন, আপনি হীনম্মন্যতায় ভুগছেন, আপনার নিজের ব্যাপারে কোনো কনফিডেন্স নেই, তাহলে আরেকজন কেন আগ্রহী হবে? আরেকজন তাকেই বিশ্বাস করে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে।

মা-বাবা অনেকেরই নেই। নবীজীর (স) মা-বাবা ছিলেন না। তিনি কি হীনম্মন্যতায় ভুগেছেন কখনো? অনেক নারীর মা-বাবা ছিলেন না। তারা তো পৃথিবীতে সফল হয়েছেন। অতএব আপনি এই না-থাকার বেদনা বয়ে বেড়াবেন না। কারণ এখানে তো আপনার করার কিছু নেই। যেখানে করার কিছু নেই, সেটা নিয়ে কখনো চিন্তা করবেন না।

আপনার যোগ্যতা আছে বলেই তো আপনি চাকরি করছেন। আপনি একজন কর্মজীবী মহিলা। অতএব সেই আত্মবিশ্বাস ভেতরে নিয়ে আসুন। আর যেহেতু আপনি উপার্জন করছেন, আপনার তো আরেকজনের করুণার কোনো প্রয়োজন নেই।

অর্থাৎ আত্মবিশ্বাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তাকেই পছন্দ করে, যে আত্মপ্রত্যয়ী। দোদুল্যমনা, হীনম্মন্যতায় ভোগা, নেতিবাচক মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। তাই হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না। নিয়মিত মেডিটেশন করুন। বিয়ের মনছবি দেখুন বিশ্বাস নিয়ে। বিশ্বাসটাকে যত প্রবল করবেন ভেতরে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে। এই প্রত্যয় চুম্বকের মতো আকর্ষণী ক্ষমতা সৃষ্টি করবে। কারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে বিশ্বাস; হীনম্মন্যতা বা সংশয় নয়।

প্রশ্ন : আমার কোনো অভিভাবক নেই। বয়স ২৭ বছর। আমার বিয়ে করা প্রয়োজন। কিন্তু হচ্ছে না। কী করণীয়? মেহেরবানি করে জানাবেন।

উত্তর : আপনি যেহেতু বিয়ে করার প্রয়োজন মনে করছেন মেডিটেশন ও বিয়ের মনছবি করবেন এবং এ নিয়তে দান করবেন। এরপর বিশ্বাসের সাথে প্রার্থনা করবেন যে, আমার যেহেতু কোনো অভিভাবক নেই, প্রভু! তুমিই আমার অভিভাবক। তুমিই সমস্ত প্রয়োজন পূরণকারী। অতএব তুমি আমার

বিয়ের প্রয়োজন পূরণ করার ব্যবস্থা করো। দোয়াতে আন্তরিক হবেন, মনে কোনো বাধা বা দ্বিধা রাখবেন না।

আর বিয়ের ক্ষেত্রে বেশি বেশি মানদণ্ড ঠিক করবেন না। আমরা অনেক সময় ভুল করি সিনেমা দেখে। পাত্র বা পাত্রী দেখতে কেমন, উচ্চতা কত, গায়ের রং কেমন, এগুলোর মধ্যে যাবেন না। সবার আগে নিজের মানদণ্ড দেখে নেবেন যে, আমাকে কে কে পছন্দ করতে পারে? আপনার প্রয়োজন একজন ভালো মানুষ, একজন জীবনসঙ্গী পাওয়া, যার সাথে আপনি সম্মান নিয়ে বাঁচবেন। অতএব সেভাবে মনছবি করেন—একজন ভালো মানুষ, যে আমাকে বুঝবে, তার সাথে আল্লাহ আমাকে জোড়া মিলিয়ে দিচ্ছেন।

মনছবি, দোয়া ও নিয়মিত দান করার পাশাপাশি দাওয়াও লাগবে। অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে কিছু যোগাযোগ তো করতে হবে। যোগাযোগ করতে করতে একটা হিট করবেই। আপনি তো যোগাযোগ করছেন বিয়ের জন্যে, প্রেম করার জন্যে তো নয়। অতএব সংকোচের কিছু নেই। আসলে মনছবি যদি আপনার ভেতরে কর্মতাড়না সৃষ্টি না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, আপনার মনছবি হয় নি। মনছবি দেখেছেন কিনা এটার প্রমাণ হচ্ছে আপনি যোগাযোগ করছেন কিনা।

প্রশ্ন : আমরা পাঁচ বোন, এক ভাই। সবার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার ২৫ বছর বয়স, কিন্তু আমার বিয়ে নিয়ে পরিবারের তেমন কোনো চিন্তা দেখি না। আমার বান্ধবীরা সব দুই বাচ্চার মা। আমার বাবা নেই। মানুষকে মা বলেন, আমার মেয়ের জন্যে ছেলে দেখেন। কিন্তু তেমন তোড়জোড় দেখছি না। এদিকে আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। ছেলেরা বিয়ের জন্যে অল্প বয়সের মেয়ে খোঁজে। মনছবিতে দেখার চেষ্টা করি যে, ভালো ভালো ঘর থেকে প্রস্তাব আসছে। এখন কোনোকিছুই ভালো লাগে না। মেডিটেশন করার আগ্রহও হারিয়ে ফেলছি। আগে চাকরি করতাম। এখন করি না। যেখানেই যাই না কেন মানুষ শুধু জিজ্ঞেস করে বিয়ে হয়েছে কিনা? আল্লাহ যখন হুকুম করবে হবে, এটা বলে আমি পাশ কেটে যাই। এই প্রশ্ন বার বার শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত। চারপাশে আমার থেকে ছোট মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আমার হচ্ছে না। বিয়ে নিয়ে খুব হতাশায় ভুগছি। আমার কী করণীয়?

উত্তর : আপনার বয়স তো মাত্র ২৫। এটা তো হতাশায় ভোগার বয়স নয়। বরং বিয়ের জন্যে এটা খুব সুন্দর বয়স। আপনার চেয়ে ছোটদের বিয়ে হয়েছে এটা সত্য, আপনার চেয়ে বেশি বয়সের অনেকের বিয়ে হয় নি এটাও

সত্য। আজকাল তো শহরাঞ্চলে ২৮/৩০ বছর বয়সে মেয়েরা বিয়ে করে। মুশকিলটা হলো, নেতিবাচকতা আপনার লাইফস্টাইল হয়ে গেছে। ইতিবাচকতা যেমন একটা লাইফস্টাইল, তেমনি নেতিবাচকতাও একটা লাইফস্টাইল। এটা জীবনের সাথে জড়িয়ে যায়। আপনাকে ইতিবাচক লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত হতে হবে। নিজের ওপরে বিশ্বাস আনতে হবে।

আর আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। এর মানে কী? চাকরি বা উপার্জন তো একটা যোগ্যতা। সেই যোগ্যতাকে আপনি মাইনাস করে ফেলছেন। আবার নতুন কোনো কাজে যোগ দিন, আত্মপরিচয় সৃষ্টি করুন। কোয়ান্টামে আমাদের যে ফিলোসফি—'আমি অপেক্ষা করতে পারি'—এর মানে কী? অপেক্ষা করার জন্যে যা যা করা দরকার, সবই করবেন।

নিয়মিত মেডিটেশন ও ইয়োগা করবেন। প্রাণায়াম যেন বাদ না যায়। এতে দেহ-মনে আপনি ফিট থাকবেন। আর সবসময় ইতিবাচক থাকবেন। বলবেন শোকর আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালো আছি। কারণ ভেতরে যদি হতাশা থাকে বাইরে এটার ছাপ পড়বেই। আরেকজন আপনাকে দেখার সাথে সাথে হতাশার ভাইব্রেশন পেয়ে আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। ভেতর থেকে আশাবাদী হলে অন্যরাও আপনার ব্যাপারে আশাবাদী হবে। তখন বিয়ের প্রস্তাব এমনি আসবে।

আর কেউ যদি জিজ্ঞেস করে বিয়ে হয়েছে কিনা, বলবেন যে, বিয়ের জন্যে পাত্র খুঁজছি। আপনার কাছে কোনো ভালো পাত্র থাকলে বলবেন। তাহলে সে দ্বিতীয় বার আর জিজ্ঞেস করবে না।

অর্থাৎ রি-একটিভ নেতিবাচক জীবনদৃষ্টি থেকে আপনাকে বেরোতে হবে। মেডিটেশন শুরু করুন এবং আগে ইতিবাচক হোন। বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহর পক্ষে সব সম্ভব।

অটোসাজেশন দিন—আমি বিশ্বাসী, আমি সাহসী, আমি পারি, আমি করব, আমি আকর্ষণীয়, ভালো প্রস্তাব আসবে এবং খুব ভালো বিয়ে হবে। বিশ্বাস তো প্রবল রাখতে হবে। এই বিশ্বাসই হচ্ছে সমস্ত অর্জনের ভিত্তি।

তবে বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা চলাকালে কখনো তাড়াহুড়া করবেন না। কেউ যদি বলে যে, সাত দিনের মধ্যে বা ১৫ দিনের মধ্যে বিয়ে করতে হবে, সতর্ক হয়ে যাবেন। প্রথম প্রশ্ন করবেন যে, কেন এত তাড়াহুড়া?

অমুকে দেশে আসবে আর অমুকে চলে যাবে সেজন্যে তাড়াহুড়া করে বিয়ে করতে হবে, এসব ক্ষেত্রে ভালোমতো খোঁজখবর নেবেন। অপরপক্ষের সামাজিক সাংস্কৃতিক আর্থিক অবস্থান জেনে নিয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রশ্ন : আমি দেশের একটি সরকারি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। আজকের অবস্থানে আসতে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। মেয়ে হওয়ার কারণে আমার বাবা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমাকে কোনো সাপোর্ট দেন নি। পরিবার থেকে আর্থিক বা মানসিক সাপোর্ট ছিল না। এখন মেধা যোগ্যতা গুণ থাকা সত্ত্বেও গায়ের রং শ্যামলা হওয়ার কারণে আমার বিয়ে হচ্ছে না। শুধু গায়ের রঙের জন্যে ভালো মেয়েদের কেন বিয়ে হবে না?

উত্তর : বিয়ে না হওয়ার কারণ কিন্তু আপনার গায়ের রং নয়; বিয়ে না হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনার হীনম্মন্যতা। আপনার চিঠিই বলে দেয় যে, গায়ের রঙের জন্যে আপনি হীনম্মন্যতায় ভুগছেন। আমি এমন প্রচুর শ্যামলা মেয়েকে দেখেছি, যাদের স্বামী সবদিক থেকে একদম প্রিন্সের মতো। এই মেয়েরা কীভাবে এমন পুরুষকে আকৃষ্ট করে? এটা মূলত তাদের কনফিডেন্স, তাদের আত্মপ্রত্যয়ের গুণে।

আপনার পরিবারে কোনো সাপোর্ট ছিল না মানে তো আপনাকে ফাইট করতে হয়েছে। নিজের যোগ্যতায় এ পর্যন্ত এসেছেন। তারপরও আপনি কেন হীনম্মন্যতায় ভুগবেন? নিজে ফাইট করার ফলে আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হওয়া উচিত। সেভাবে মনছবি করেন।

দ্বিতীয়ত, যদি সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই ৪০ বছর পার করে ফেলেন, তখন পছন্দমতো মানানসই বিয়ে করাটা মুশকিল। তখন যদি মনে করেন যে আমি ৩৫ বছরের স্বামী চাই, পাবেন না। সময় থাকতেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রশ্ন : আমার বয়স ৩৫ বছরের শেষ প্রান্তে। আমার পরিবার আমার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে পাত্রী খুঁজছে। কিন্তু পাত্রী মিলছে না। প্রথমদিকে আমি বিয়েতে অমত করলেও এখন মনমতো পাত্রী পাচ্ছি না। এটা নিয়ে পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন আমাকে খুব মানসিক চাপের মধ্যে রেখেছেন। এখন মনে হচ্ছে কেউ বানটোনা কালাজাদু করে আমার বিয়ে আটকে রেখেছে।

উত্তর : সময়ের একফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। সঠিক সময়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলে আপনাকে এসব চিন্তা করতে হতো না। তখন অমত করেছেন আর এখন এসব ভাবছেন! আপনাকে কেউ জাদু-টোনা করে নি। জ্বীন-ভূতও চালান হয় নি। বান-জাদু ভেবে হুজুর বাড়ি, ফকির বাড়ি, ঠাকুর বাড়ি দৌড়ে পয়সা নষ্ট না করে বরং চেষ্টা করুন। শতভাগ নিখুঁত একেবারে মনমতো পাত্রী চাইলে তো হবে না। বাহ্যিক কিছুটা ছাড় দিয়ে ভালো মানুষ খুঁজবেন।

প্রশ্ন : অনেক চেষ্টা করেও আমার বিয়ে হচ্ছে না। বয়স ৪০ বছর পার হয়ে গেছে। আমার কী করা উচিত? পরামর্শ দেবেন দয়া করে।

উত্তর : ৪০ বছর পার হয়ে গেলেও আশা হারানোর কিছু নেই। আপনি আপনার ভেতরের শক্তিটাকে জাগ্রত করুন। আত্মিক শক্তি বাড়িয়ে নিজের মধ্যে আকর্ষণ ক্ষমতা সৃষ্টি করুন। নিজের কাজে মন দিন। শুধু বিয়ে বিয়ে করতে হবে কেন? বিয়ে তো জীবনের একটা দিক। নেতিবাচকতায় ভুগবেন না কখনো। যে-কোনো সময় বিয়ে হতে পারে।

তবে স্পেশালি মহিলাদের বিয়ের বয়স ২০ থেকে ২৮; এটা প্রাইম টাইম। সাধারণত এসময় আপনার প্রতি একজন পুরুষ যেভাবে আকৃষ্ট হবে, যত দিন যাবে এই আকর্ষণটা কমে যাবে। আবার সামাজিক ও পেশাগত দিক থেকে একটা ভালো অবস্থানে চলে যাওয়ার পরে আপনার সমমানের কাউকে পাওয়া বা আপনার চেয়ে ভালো পজিশনের কাউকে পাওয়া খুব কঠিন। তাই সময় থাকতেই বিয়ে করে ফেলা উত্তম।

তারপরও কোনো কারণে দেরি হয়ে গেলে বেশি চুজি বা খুঁতখুঁতে না হয়ে একজন ভালো মানুষ খুঁজবেন। পছন্দের মাপকাঠি কমাবেন। কারণ সব একেবারে খাপে খাপে মিলবে না। আরেকটি বিষয় হলো, আমাদের দেশে ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা বেশি। চীনে যেমন ছেলের সংখ্যা বেশি, মেয়ের সংখ্যা কম। আমাদের দেশে মেয়েরা সংখ্যায় বেশি হওয়ায় কারো কারো বিয়ে না-ও হতে পারে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা।

মেয়েদের জন্যে আরেকটি পরামর্শ হলো, যেচে কোনো ছেলের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। বাস্তবে আপনার এই অপেক্ষার কোনো মূল্য পাবেন না। মনে রাখা উচিত, একই বয়সের ছেলেকে পছন্দ করলে কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ ছেলের যখন বিয়ের বয়স শুরু হবে, আপনার তখন বয়স শেষ।

সহপাঠী ছেলেটা চাকরিবাকরি করে যখন স্থির হবে, তখন সে হয়তো চিন্তা করবে যে, একে বিয়ে করার দরকারটা কী? তার হয়তো আরো ভালো কারো সাথে সম্পর্ক হয়ে গেল। যোগ্যতা অর্জন করার পর ছেলেটা আপনাকে আর তার যোগ্য মনে না-ও করতে পারে। তখন আপনার হায় আফসোস করা ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। তাই মেয়েরা কোনো ছেলের ব্যাপারে কখনো উপযাচক হবেন না।

সবসময় প্র্যাকটিক্যাল হবেন। বিয়ে মানে শুধু প্রেম নয়, শুধু রোমান্স নয়। বিয়ে মানে হচ্ছে কম্প্রোমাইজ। এটা বুঝতে হবে। অতএব বিয়ের ক্ষেত্রে সবসময় মনটাকে উদার রাখবেন এবং সময়মতো সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিয়ে না করলে

প্রশ্ন : আমি বিয়ে করি নি। এটা আমার প্রাচুর্যের পথে অন্তরায় হবে না তো? বিয়ের সাথে প্রাচুর্যের বা সাফল্যের কোনো সম্পর্ক আছে কি?

উত্তর : বিয়ের সাথে প্রাচুর্যের বা সাফল্যের কোনো সম্পর্ক নেই। বিয়ে করেও মানুষ যে-রকম সফল হয়েছে, বিয়ে ছাড়াও মানুষ সফল হয়েছে। মাইকেল এইচ হার্ট সর্বকালের সেরা ১০০ জনকে নিয়ে একটি বই লিখেছেন। এদের মধ্যে ১৯ জনই বিয়ে করেন নি। অর্থাৎ প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। অথচ তারা পৃথিবীকে ঋণী করেছেন। বিয়ে তাদের সাফল্যের পথে, প্রাচুর্যের পথে, খ্যাতির পথে, অবদানের পথে, জ্ঞানের পথে, গবেষণার পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে নি।

আবার যারা বিয়ে করেছেন, তারাও সফল হয়েছেন। সমস্যাটা হয় যখন আফসোস থাকে যে, বিয়ে করলে না জানি কত কিছু হতো! আবার বিয়ে করার পর আফসোস—'আহা! বিয়ে না করলেই ভালো হতো। কত স্বাধীন ছিলাম! এখন আবার আরেকজনের কথা শুনতে হয়। বেরোতে গেলে বলে, কোথায় যাচ্ছ?' যদি এ আফসোস থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

বিয়ে করেও একজন মানুষ আফসোস করতে পারে, আবার বিয়ে না করেও আফসোস থাকতে পারে। এটা যার যার দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। সাফল্যের জন্যে বিয়ে করা বা না করাটা কোনো শর্ত নয়। তবে যদি বিয়ে না করার জন্যে আফসোস থাকে, তাহলে আফসোস নিয়ে জীবন পার করার চেয়ে বিয়ে করে ফেলাটাই ভালো।

প্রশ্ন : জৈবিকতা যদি কারো কাছে মুখ্য না হয়, নিজেকে আলোকিত মানুষ করার জন্যে বিলিয়ে দিতে চায় এবং বিয়ের ব্যাপারে মানসিক ইচ্ছা বা আগ্রহ না থাকে, সে-ক্ষেত্রে শুধু সুন্নত পালনের জন্যে বিয়ে করা কি যুক্তিযুক্ত?

উত্তর : বিয়ের পরে জৈবিক প্রয়োজন আপনার কাছে মুখ্য না হলেও যাকে বিয়ে করবেন তার তো জৈবিক প্রয়োজন রয়েছে। সে-ক্ষেত্রে বিয়ে করা আপনার জন্যে অন্যায়। আবার শুধু জৈবিক প্রয়োজন পূরণ হলেই হবে না। আপনি সন্তানের জনক বা জননী হতে পারবেন কিনা, তা-ও দেখার বিষয়। যদি তা না পারেন বিয়ের আগেই অন্যপক্ষকে তা জানিয়ে দিতে হবে।

তারপরও যদি অন্যপক্ষ রাজি হয় খুব ভালো। কিন্তু কখনো মা বা বাবা হতে পারবেন না জানার পরও যদি তা গোপন করে বিয়ে করেন, এটা অপরাধ হবে। আপনি শুধু নিজের নয়, আরেকটি মানুষের জীবন নষ্ট করলেন। আগ্রহ যদি না থাকে, বিয়ে করা মানে আরেকজনকে কষ্ট দেয়া। কারণ বিয়ে কারো একার ব্যাপার নয়, আরেকটি জীবনও এর সাথে জড়িত। নিজেকে আলোকিত মানুষ করার ক্ষেত্রে আগ্রহহীন বিয়ে অযৌক্তিক।

প্রশ্ন : আমার বড় ভাই আমাদের নয় ভাইবোনকে মানুষ করতে গিয়ে নিজে আর বিয়ে করেন নি। বর্তমানে তার বয়স ৫০। আমরা নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু ভাই রাজি হন নি। আমরা যৌথ পরিবারে আছি। আর ভাইয়ের সময় কাটে আমাদের বাচ্চাদের সাথে। বিয়ে না করার জন্যে ভাইয়ের কি কোনো গুনাহ হবে? আমাদের কী করণীয়?

উত্তর : অনেক অলি-বুজুর্গ, মুনি-ঋষি ছিলেন, আছেন যারা বিয়ে করেন নি। অনেক সাহাবীও বিয়ে করেন নি। তাতে কি তাদের গুনাহ হয়েছে? গুনাহ হওয়ার সাথে বিয়ের সম্পর্ক নেই। বিয়েটা হচ্ছে প্রয়োজন। যিনি বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করবেন, তিনি বিয়ে করবেন। অপরপক্ষে বিয়ের প্রয়োজন যিনি অনুভব করবেন না, তিনি করবেন না।

আপনাদের করণীয় হচ্ছে, তাকে বিয়ে করানোর ব্যাপারে জোরাজুরি না করা। আপনাদের ভাই যেন সবসময় মনে করেন যে, এই পরিবারই আমার পরিবার, আমি বিয়ে করি নি ভালোই হয়েছে! অর্থাৎ বড় ভাইয়ের প্রতি আপনাদের যে কর্তব্য, সেটা আপনারা সবসময় পালন করবেন।

প্রশ্ন : আমার প্রশ্ন হলো, বিবাহ বাধ্যতামূলক কিনা? আর ব্যক্তিজীবনে শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি বিবাহ করতে না চায়, তাহলে তার জীবনে কি কোনোরূপ শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আছে? আমার জন্যে দোয়া রাখবেন।

উত্তর : আপনার প্রথম প্রশ্ন, বিয়ে বাধ্যতামূলক কিনা? বিয়ের খুতবাতে কী বলা হয়? বিয়ে সুন্নত, বাধ্যতামূলক নয়। বিয়ে আপনার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। শারীরিকভাবে, আর্থিকভাবে সমর্থ হলে বিয়ে করা উচিত। কারণ আপনি যদি বিয়ে না করেন, এই সামর্থ্যটা বিকৃতভাবে ব্যবহৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কেউ যদি বিয়ে করতে না চায়, তাহলে তার

জীবনে কোনোরূপ শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। বিবাহিত হলেও যে-রকম শারীরিক, মানসিক সমস্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা আছে, অবিবাহিত থাকলেও এটা হতে পারে। ভালো থাকাটা মূলত নির্ভর করে সঠিক খাদ্যাভ্যাস, মেডিটেশন, ব্যায়াম, প্রার্থনা, পারস্পরিক যোগাযোগ, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জীবনাচারের ওপর।

প্রশ্ন : বিয়ে করব না—এই সিদ্ধান্ত নিয়ে কেউ যদি শারীরিক চাহিদাকে উপেক্ষা করতে চায়, জৈবিক শক্তিকে আত্মিক শক্তিতে রূপান্তরে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে চায়, স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রেক্ষিতে তা কি যথার্থ হবে?

উত্তর : একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, সাধনার পথ জনে জনে আলাদা। বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে শারীরিক চাহিদাকে উপেক্ষা করা কঠিন ব্যাপার। এ পথ খুব কঠিন পথ।

বিয়ে না করার ব্যাপারে যদি শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনো কারণ থাকে, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু শুধু জৈবিক শক্তিকে আত্মিক শক্তিতে উন্নীত করার জন্যে শারীরিক চাহিদাকে উপেক্ষা করা—এটা খুব কঠিন। খুব কঠিন। বলাটা খুব সহজ কিন্তু করাটা আসলেই কঠিন।

সহজ পথ যেখানে আছে, সহজ পথ রেখে কঠিন পথে না যাওয়াটা ভালো। আবার কেউ যদি কঠিন পথে যেতে চান এবং আন্তরিকভাবে যথার্থ অর্থে নিজের শারীরিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু শারীরিক চাহিদাকে বিকৃত উপায়ে যদি কেউ পূরণ করতে চান, সেটা পাপ হবে।

প্রশ্ন : আজকাল ছেলেমেয়েরা ৩৫-৪০ বছর বয়সেও বিয়ে করতে চায় না। তাদের সময় নেই, আর্থিক অবস্থা খারাপ বা সময় হলে করব ইত্যাদি অজুহাত দেয়। এটা কি ফ্যাশন, নাকি বৃদ্ধ মা-বাবাকে কষ্ট দেয়া? আপনি এসব ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন।

উত্তর : অনেক ছেলেমেয়ে যেমন বিয়ে করতে চায় না, আবার অনেকে অল্প বয়সেই বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে যায়। ব্যাপারটা তো অনেকটা নির্ভর করে মা-বাবা তাকে কীভাবে গড়ে তুলেছেন, কীভাবে লালন করেছেন তার ওপর। এখন দোয়া করা ছাড়া আর কী করবেন? তাকে বোঝানো যেতে পারে—যে কাজের যে সময় সেটা সেসময় করা উচিত।

প্রশ্ন : আমার ছেলেকে বিয়ে দিতে চাই। সে বলে, এখনকার মেয়েদের অতিরিক্ত চাহিদা মিটিয়ে চলা খুব কঠিন। চারপাশের ডিভোর্স দেখেও তার বিয়ের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। কী করব?

উত্তর : বিয়ে করবে ছেলে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ছেলে দায়িত্ব নিতে আগ্রহী হচ্ছে, তার জন্যে দোয়া করবেন। তাকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাবেন যে, এই এই কারণে তোমার বিয়ে করা উচিত।

প্রসঙ্গ বহুবিবাহ

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে পুরুষদেরকে যখন বলতে শুনি, 'আরে আমাদের নবীজী (স) ১০টি বিয়ে করেছিল। কাজেই আমরা তিন-চারটি বিয়ে করলে সমস্যা কী? ছেলেরা বিয়ে করতেই পারে'—তখন খুব কষ্ট লাগে। জানি, নবীজী (স) কারণ ছাড়া কোনোকিছু করেন নি। তা-ও সবকিছু পরিষ্কার জানি না। আপনি একটু পরিষ্কার করে বলবেন? প্রশ্নটা করার জন্যে অপরাধ নেবেন না। ভুল হলে আল্লাহ যেন মাফ করেন।

উত্তর : যে পুরুষদের একথা বলতে শুনেছেন তাদেরকে বলুন যে, ঠিক আছে, তিন-চার জন বিধবাকে বিয়ে করো। ছেলেমেয়ে আছে এমন বিধবাকে ছেলেমেয়েসহ বিয়ে করো। দেখবেন, মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে। এসব কথা যারা বলে, তাদেরকে এক অর্থে বদমাইশ বলা যায়। বদমাইশি করার জন্যে তারা এ ধরনের কথা বলে। আর এ ব্যাপারে নবীজীর (স) রেফারেন্স দেয়াটা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।

দুই নম্বর হচ্ছে, কেউ যদি স্ত্রীর লিখিত পূর্বানুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিয়ে করে, কেয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নাই, স্ত্রী তাকে এমনিই জেলখানায় পাঠিয়ে দিতে পারে। কারণ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করা আমাদের দেশে আইনত দণ্ডনীয়। অতএব কিছু বিষয় হচ্ছে—পরিবেশ, পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থানির্ভর। আর কিছু হচ্ছে সার্বজনীন।

একাধিক বিয়ের ব্যাপারে কোরআনে অনুমতি দেয়া আছে। যখন এই অনুমতি দেয়া হয়, তখন ওহুদের সংঘর্ষে ৭০ জন সাহাবী শহিদ হন। তাদের স্ত্রীরা বিধবা হয়ে যান। তখনকার দিনে একজন নারীকে মর্যাদা দেয়ার একটাই উপায় ছিল, তাকে বিয়ে করা। কোরআনে সূরা নিসায় প্রসঙ্গক্রমে

বলা হয়েছে—এক, দুই, তিন, চার জন পর্যন্ত। তারপর বলা হচ্ছে, যদি তুমি তাদের সাথে সম-আচরণ করতে পারো। আর যদি না পারো তাহলে এক বিয়েই উত্তম। আমরা শুধু প্রথম অংশ পড়েই মন্তব্য করি, পুরোটা পড়ি না।

তো একাধিক বিয়ের অনুমতি রয়েছে। সেটা কখন? যখন প্রয়োজন। যেমন, বংশধারা রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হতে পারে। কারো স্ত্রী যদি সন্তান জন্মদানে শারীরিকভাবে অক্ষম হন, তিনি তখন যুক্তিসঙ্গতভাবেই বিয়ে করতে চাইতে পারেন। কিন্তু অনুমতি থাকা এবং করে ফেলা এক নয়। একটা হচ্ছে অনুমোদন এবং আরেকটা প্র্যাকটিস। দুটো বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা।

আর নবীজী (স) বিয়ে ১০টি করেন নি, করেছিলেন ১২টি। আমরা যদি দেখি, তিনি কাদেরকে বিয়ে করেছেন? আয়েশা (রা) এবং মারিয়া (রা)—এ দুজন ছাড়া আর কেউ কুমারী ছিলেন না। যদি জৈবিকতার প্রয়োজনে বিয়েগুলো হতো, তাহলে তো তাঁর জন্যে কুমারী বিয়ে করাটাই স্বাভাবিক ছিল। আর সেটা তাঁর জন্যে মোটেই কঠিন ছিল না। কারণ তিনি একে তো ধর্মীয় প্রধান, তারপর রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ রাজা। তাঁর জন্যে তো সুন্দরী কুমারী মেয়ের কোনো অভাব হওয়ার কথা না। স্পষ্টতই বোঝা যায়, তিনি জৈবিকতার বিবেচনায় এসব বিয়ে করেন নি।

তাঁর প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজার (রা) বয়স ছিল ৪০ বছর। তাঁর চেয়ে ১৫ বছর বেশি। নবীজীর (স) সাথে বিয়ের আগে তিনি দুবার বা তিন বার বিধবা হয়েছিলেন। মা ফাতেমাসহ (রা) নবীজীর (স) চার কন্যা ও দুটি পুত্র সন্তানের জননী ছিলেন তিনি। নবীজীর (স) সাথে তার সম্পর্ক যতটা না জৈবিক, তার চেয়ে অনেক বেশি মানসিক ও আত্মিক। তিনি তাকে এত ভালবাসতেন যে, মৃত্যুর পরেও তাকে তিনি ভুলতে পারেন নি।

একবার আয়েশা (রা) এ প্রসঙ্গে কটাক্ষ করলে তিনি বলেছিলেন, ‘হাঁ, আমি এখনো তাকে ভালবাসি। কারণ সে আমার প্রতি অতি বিশ্বস্ত ছিল। যখন মানুষ আমাকে অবিশ্বাস করেছে, সে তখন আমাকে বিশ্বাস করেছে। যখন মানুষ আমাকে সাহায্য করতে ভয় পেত, তখন সে অটল পাহাড়ের মতো পাশে দাঁড়িয়েছে। সে আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা ও আমার সন্তানের জননী ছিল।’

দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি সওদা (রা)—তিনিও বিধবা ছিলেন। তিনি ও তার স্বামী নবীজীর (স) পরামর্শে নির্যাতন এড়ানোর জন্যে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। মক্কায় ফিরে আসার পর তার স্বামী এক পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। নবীজী (স) যখন তাকে বিয়ে করেন, তখন তার বয়সও ছিল ৪০ বছর। নাবালক মেয়েদের দেখাশোনাই ছিল এ বিয়ের মূল লক্ষ্য।

তৃতীয় স্ত্রী আবু বকরের (রা) কন্যা বিবি আয়েশা (রা)। নবীজীর (স) কুমারী দুই স্ত্রীর একজন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী আয়েশা (রা) রসুলুল্লাহর (স) ওফাতের পরও ৫০ বছর বেঁচে ছিলেন। হাদীসের এক বিশাল সংগ্রহ আমরা পাই তার কাছ থেকে। শীর্ষ পাঁচ জন মুহাদ্দিসের (হাদীস বর্ণনাকারী বিশেষজ্ঞ) নাম যদি নিতে হয়, তো তিনি তাদের একজন। বড় বড় মুহাদ্দিসরা তার কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন।

অর্থাৎ অল্পবয়সী মা আয়েশাকে বিয়ে করলেও এর ফলাফল খুবই স্পষ্ট। তিনি স্ত্রী হওয়ার সুবাদে নবীজীকে (স) কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শিখতে পেরেছেন এবং তা ছড়িয়ে দিয়েছেন মানুষের কাছে—সাহাবী, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন পর্যন্ত।

চতুর্থ স্ত্রী বিবি হাফসা (রা)—তিনি ওমরের (রা) কন্যা ছিলেন এবং বাবার মতো তার মেজাজও বেশ চড়া ছিল। তার স্বামী যখন শহিদ হলেন, তখন আবু বকর (রা) এবং উসমানকে (রা) তার বাবা প্রস্তাব করলেন হাফসাকে বিয়ে করার জন্যে। কিন্তু তার মেজাজের জন্যে কেউ রাজি হলেন না। তখন নবীজী (স) তাকে বিয়ে করলেন।

অর্থাৎ একজন নারীকে সেই জামানায় সম্মানিত করার এর চেয়ে উত্তম কোনো পন্থা ছিল না। তাছাড়া তখনকার দিনে কারো সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার উপায় ছিল তার মেয়েকে বিয়ে করা অথবা নিজের মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দেয়া। আমাদের এখনকার সমাজে, এখনকার পরিবেশে এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু এটা ছিল এক স্বাভাবিক সামাজিক প্রথা। যে কারণে আবু বকর (রা) এবং ওমরের (রা) মেয়েকে নবীজী (স) বিয়ে করেছেন এবং নিজের দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন উসমান (রা) এবং আলীর (রা) সাথে।

পঞ্চম স্ত্রী বিবি জয়নব (রা)—তার স্বামীও যুদ্ধে শহিদ হন। তখন একজন শহিদের বিধবাকে সামাজিক মর্যাদা দেয়ার একটাই উপায় ছিল—তাকে বিয়ে করা। তিনি খুব দয়াবতী নারী ছিলেন। বঞ্চিতের কল্যাণে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। তিনি পরিচিত ছিলেন উম্মুল মাসাকিন নামে। নবীজীর (স) সাথে বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই তিনি মারা যান। তখন তার বয়স হয়েছিল ৩০ বছর।

ষষ্ঠ স্ত্রী বিবি সালমা (রা)—তার স্বামীও ওহুদের সংঘর্ষে শহিদ হন এবং তিনি যথেষ্ট নির্যাতিত হন। তিনি স্বামীর সাথে মদিনায় হিজরত করতে পারেন নি। যখন হিজরত করে এলেন, তার তিন দিন পরেই স্বামী শহিদ হন। তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তার মন ভেঙে যায়। নবীজী (স) তখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু মা সালমা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তার সন্তানকে

নবীজী (স) নিজের সন্তানের মতো দেখার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তিনি বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন মদীনায় হিজরতকারী প্রথম মহিলা।

সপ্তম স্ত্রী বিবি জয়নব বিনতে জাহ্শ (রা)—তিনি নবীজীর (স) চাচা আবু তালেবের নাতনি ছিলেন। বিধবা হিসেবে মদিনায় হিজরতের পরে নবীজী (স) তাঁর পালকপুত্র জায়েদের (রা) সাথে তার বিয়ে দেন। নবীজী পালকপুত্র হিসেবে ঘোষণা দেয়ার আগে জায়েদ ক্রীতদাস ছিলেন। আবু তালেবের নাতনি হওয়ায় বিবি জয়নবের আভিজাত্যবোধটা প্রবল ছিল। জয়নব দৃঢ়ভাবে মনে করতেন ক্রীতদাসের সাথে বিয়ে হওয়ায় তার সম্মান নষ্ট হয়েছে। তাই তাদের মধ্যে সবসময় কলহ লেগে থাকত। কারণ কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীকে সম্মান করতে না পারে, সেই সম্পর্কে সমস্যা থাকবেই। নবীজী (স) জায়েদকে ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতেন সবসময়।

একদিন রাগের মাথায় জায়েদ তাকে তালাক দেন। এতে জয়নব (রা) আরো অপমানিত বোধ করলেন। প্রথমত, বিয়েটাকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি অসম-সামাজিক অবস্থানের কারণে। তালাকের পরে অবস্থা আরো খারাপ। জয়নবের আত্মীয়স্বজন নবীজীকে (স) ঘিরে ধরলেন—এখন আপনাকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। কী করতে হবে? জয়নবের মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্যে তাকে বিয়ে করতে হবে।

কিন্তু তখনকার দিনে পালকপুত্রকে নিজ পুত্র হিসেবেই গণ্য করা হতো। তাই নবীজী (স) বিয়ের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর 'পালকপুত্র রক্তীয় পুত্র নয়' এই আয়াত নাজিল হলো। তখন তিনি জয়নবকে (রা) বিয়ে করেন। বিবি জয়নবের আত্মসম্মানবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। জীবনে কারো সাহায্য নেন নি। এমনকি দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা) তার জন্যে রাষ্ট্রীয় ভাতার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তা গ্রহণে তিনি অস্বীকৃতি জানান। নিজে কাপড় সেলাই করে জীবিকানির্বাহ করতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি স্বাবলম্বী ছিলেন, কারো সাহায্য গ্রহণ করেন নি।

অষ্টম স্ত্রী বিবি জোয়াইরিয়া (রা)। তার পিতা হারিস ছিলেন বনু মুস্তালিক গোত্রের অধিপতি। তিনি ছিলেন একই গোত্রের নেতৃস্থানীয় যোদ্ধার স্ত্রী। তার পিতা ও স্বামী দুজনই ছিলেন নবীজীর (স) ঘোর শত্রু। এক সংঘর্ষে জোয়াইরিয়া বন্দি হন এবং তার বাবা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দিমুক্তির জন্যে নবীজীর (স) কাছে আবেদন করেন।

নবীজী (স) জোয়াইরিয়ার মতামত জানতে চাইলেন যে, তুমি মুক্তি চাও, না এখানে থাকতে চাও? তখন তিনি বললেন, আমি একটা গোত্রপতির

মেয়ে। যুদ্ধবন্দি হওয়ার কারণে আমার যে সম্মান নষ্ট হয়েছে, তা পুনরুদ্ধারের একমাত্র পথ হচ্ছে আপনি যদি আমাকে বিয়ে করেন। এ বিয়ের পরে পুরো বনু মুস্তালিক গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে এবং এই গোত্রের সাথে নবীজী (স) ও সাহাবীদের একটা স্থায়ী সুন্দর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

নবম স্ত্রী বিবি উম্মে হাবিবা (রা) আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। ইসলামের প্রথম যুগে স্বামীর সাথে ইসলাম গ্রহণ করে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। কিন্তু স্বামী আবিসিনিয়ায় গিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যান। উম্মে হাবিবা মুসলমানই ছিলেন।

ভোগবিলাস ও অতিরিক্ত মদ্যপানে স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি মক্কায় ফিরে এলে নবীজী (স) তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং বিয়ের প্রস্তাব দেন। তখন তার বয়স ছিল ৩৮ বছর। নবীজীর (স) প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধের কারণে তিনি তার বিছানায় পিতা আবু সুফিয়ানকে কখনো বসতে দেন নি। উম্মে হাবিবা নবীজীর (স) ওফাতের পরেও ২০ বছর জীবিত ছিলেন এবং প্রচুর হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি অমর হয়ে আছেন।

দশম স্ত্রী বিবি সাফিয়া (রা) ইহুদি দলপতির কন্যা ছিলেন। তার দুবার বিয়ে হয় এবং প্রথম বিয়ে বিচ্ছেদ হয়। খাইবার-এর যুদ্ধে তার দ্বিতীয় স্বামী নিহত হন এবং সাফিয়া বন্দি হন। যুদ্ধবন্দি হিসেবে তাকে নবীজীর (স) সামনে আনা হলে তিনি বললেন, তোমার এই যে সম্মানহানি এটা উদ্ধারের একমাত্র পথ হচ্ছে বিয়ে। সাফিয়াও মুসলমান হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে মুসলিম প্রধানকে বিয়ে করাটাকে খুব সম্মানজনক মনে করলেন। এই বিয়ে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে খুব বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে।

একাদশ স্ত্রী বিবি মায়মুনা (রা)। তিনি ছিলেন নবীজীর (স) চাচা আব্বাসের শ্যালিকা এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের (রা) চাচি। প্রথম স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ হয় এবং তার দ্বিতীয় স্বামী মারা যান। তখন তার ৫১ বছর বয়স। নবীজীর (স) কাছে বিয়ের প্রস্তাব আনেন চাচা আব্বাস। এই বিয়ে কোরাইশদের দুটো নেতৃস্থানীয় গোত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বাদশ স্ত্রী বিবি মারিয়া (রা)। খ্রিষ্টান দলপতি সায়মনের কন্যা মারিয়া এবং শিরিনকে আলেকজান্দ্রিয়ার আর্চবিশপ উপহার হিসেবে প্রেরণ করেন নবীজীর (স) কাছে। তখনকার দিনে আপস বা বন্ধুত্ব করার জন্যে এই উপহার প্রেরণের রেওয়াজ ছিল। নবীজী (স) যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে মারিয়াকে বিয়ে করেন এবং শিরিনকে হাসান ইবনে সাবিতের (রা) সাথে

বিয়ে দেন। মা খাদিজার (রা) পরে এই বিবি মারিয়ার গর্ভেই নবীজীর (স) একটি মাত্র ছেলে ইব্রাহিম জন্মগ্রহণ করেন। জন্মগ্রহণের ১৮ মাস পরে ইব্রাহিম মারা যান। মারিয়াও এই শোকে কয়েক বছর পরে মারা যান।

এই হচ্ছে নবীজীর (স) বিয়ে। বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, নবীজীর প্রতিটি বিয়েই ছিল সেই সময়কার সামাজিক, সাংগঠনিক, রাজনৈতিক, পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থ সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। যেমন, যখন কোনো গোত্রপতির কন্যাকে বিয়ে করা হয়, স্বাভাবিকভাবেই সেই গোত্রের সাথে একটা সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক গোত্র প্রস্তাবই দিত যে, আমাদের গোত্রের মেয়েকে বিয়ে করলে আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্কটাকে আরো উন্নত করব।

আমরা নবীজীর (স) যতগুলো বিয়ে দেখি, কোনোটাই জৈবিক প্রয়োজনে নয়। যারা ফ্রয়েড পড়েছেন, তারা জানেন—সাধারণত যদি জৈবিক প্রয়োজনে কেউ বিয়ে করে, তাহলে মানুষের বয়স যত বাড়তে থাকে তত সে কমবয়সীকে বিয়ে করতে চায়, বিধবা বা বেশিবয়সী কাউকে না।

কিন্তু নবীজীর (স) জীবনে এটা সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। মা খাদিজা (রা) ছাড়া বাকি সবগুলো বিয়েই তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রয়োজনে। এককথায় আমরা বলতে পারি, বিয়ের মধ্য দিয়ে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নারীদেরকে সম্মানিত করেছেন, তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং চেতনার বিস্তারকে সুসংহত করেছেন।

প্রশ্ন : আমার স্বামী মারা গেছে চার বছর আগে। গত একবছর যাবৎ একজনের সাথে আমার সম্পর্ক। আমি খুব বিশ্বাস করি তাকে, কিন্তু গত একমাস যাবৎ সে আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাচ্ছে না। অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করবে সে। আমি এখন একা। সে আমাকে যোগাযোগ করতে নিষেধ করে দিয়েছে। আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। ভালো সমাধান চাই।

উত্তর : আপনার কষ্ট পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর কোনো সমাধান নেই। স্বামী মারা গেছে, আরেকজনকে আপনি অবশ্যই বিয়ে করতে পারেন, সে অধিকার আপনার আছে। কিন্তু এ ধরনের সম্পর্ক যার সাথে করবেন, ৯০% ক্ষেত্রেই সে আপনাকে ব্যবহার করবে, তারপর ছেড়ে চলে যাবে। বিয়ে ছাড়া সম্পর্ক করতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকম হয়। অতএব বিয়ের প্রয়োজন মনে করলে বিয়ে করবেন এবং সেজন্যে খোঁজখবর করতে থাকুন।

প্রশ্ন : সংসারধর্ম পালন করে মানুষের সেবা করা বেশি পুণ্যের কাজ, নাকি নিজেকে সচ্চরিত্রবান রেখে শুধু লাখো কোটি মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজে নিয়োজিত থাকা বেশি পুণ্যের কাজ হবে? পরামর্শ দিলে কৃতার্থ হবো।

উত্তর : এ সিদ্ধান্তটা নিজেকে নিতে হয় যে, আপনি সংসারধর্ম পালন করে ভালো কাজ করবেন, না সংসার ছেড়ে শুধু মানুষের কল্যাণে কাজ করবেন। এ সিদ্ধান্ত কেউ আপনাকে দিয়ে দিতে পারবে না। তবে জীবনে ব্যালেন্সড হওয়াটা সবসময় ভালো। এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, যেটার জন্যে পরে আফসোস করতে হয়।

এখন ভাবলেন যে, মানুষের জন্যে কাজ করব। তারপর বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলে আফসোস করলেন, আহারে! যদি বিয়ে করতাম, কত না ভালো থাকতাম! অতএব পরে অনুশোচনা করতে হয়, এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। আর প্রতিটি ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পন্থা। ধর্ম ও মহামানবদের জীবনও আমাদের এই মধ্যপন্থার শিক্ষাই দেয়।

প্রশ্ন : আমার স্বামী আমাকে রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করে ওই মহিলার কাছে চলে গেছে। আমি মানসিকভাবে দিন দিন অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছি। আপনি কি আমাকে এমন কোনো উপায় বলে দেবেন, যেটা শোনার পর পৃথিবীতে নতুনভাবে বেঁচে থাকতে পারব?

উত্তর : স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে আপনাকে রেখে চলে গেছে, আপনি কেন এটাকে সহজভাবে নিতে পারবেন না? আপনি যখন এ পৃথিবীতে এসেছিলেন, তখন কি স্বামীকে নিয়ে এসেছিলেন, না মৃত্যুর সময় স্বামী আপনার সঙ্গে যাবে? তাহলে এত আহাজারি কেন? যে পুরুষ আরেকজন মহিলাকে বিয়ে করে চলে যেতে পারে, তার জন্যে কেন এত মরিয়া হবেন?

হ্যাঁ, কষ্ট পেতে পারেন, তার জন্যে ফিল করতে পারেন বা আর্থিকভাবে তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে এখন সাময়িক অসুবিধাও ভোগ করতে পারেন। কিন্তু স্বামী আরেকটা বিয়ে করে চলে গেছে বলে দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হবে, এরকম কথা কোনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন নারীর ভাবা উচিত নয়।

যে স্বামী তার স্ত্রীকে ফেলে অন্য নারীর হাত ধরে চলে যায়, তার জন্যে কোনো আক্ষেপ করা উচিত নয়। একইভাবে কোনো স্বামীরও উচিত নয় তাকে ফেলে চলে যাওয়া স্ত্রীর কথা মনে করে কষ্ট পাওয়া। কারণ স্বামী-স্ত্রীর

সম্পর্কটা দ্বিপাক্ষিক। শুধু একপক্ষের আগ্রহে সম্পর্ক টেকে না। টিকলেও সেটা কখনো সুস্থ দাম্পত্য জীবন হয় না। যত ধরে রাখতে চাইবেন, তত সে বিরক্ত হবে।

এখন আপনি যা করতে পারেন তা হলো, যোগ্যতা অর্জন করে আত্মপরিচয়ে পরিচিত হওয়া। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া এবং সৎকর্মে সময় দেয়া। আর যদি প্রয়োজন মনে করেন, জীবনসঙ্গী হিসেবে উপযুক্ত কাউকে পান, তাহলে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারেন। তবে যদি সন্তান থাকে তাহলে যা-ই করবেন, সন্তানের সার্বিক কল্যাণের বিষয়টি মাথায় রাখবেন।

প্রশ্ন : একজন পুরুষের প্রথম স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত? কোনো মহিলা নিজের অশান্তির দোহাই দিয়ে আরেকজন বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করা কি ঠিক হবে?

উত্তর : যে মহিলা আরেকজনের স্বামীর সাথে পরকীয়ায় লিপ্ত হয় এবং আরেকজনের স্বামীকে ফুসলিয়ে বিয়ে করে, আসলে সে একটি জঘন্য অপরাধ করে। এই অপরাধের শাস্তি হওয়া উচিত। আর আমাদের দেশের পারিবারিক আইন অনুসারে প্রথম স্ত্রীর বর্তমানে তার অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করা তো দণ্ডনীয় অপরাধ।

পরকীয়া

প্রশ্ন : আমার বন্ধুর স্ত্রী স্বামীর অনুপস্থিতিতে পুরনো প্রেমিকের সাথে, আবার সুযোগ পেলে স্বামীর বন্ধুর সাথে রোমান্টিক আলাপে লিপ্ত হয়। এই পরকীয়ার ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?

উত্তর : আসলে পরকীয়া একটি রোগ। ডিজিটাল টক্সিন ও পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির প্রভাবে এ সামাজিক ব্যাধি এখন সমাজে বিস্তার লাভ করছে। পরকীয়া সবসময় পরগাছার মতো। পরগাছা আসল গাছকে নষ্ট করে দেয়। যিনি পরকীয়ায় জড়াবেন তিনি তার আসল বৃক্ষকে নষ্ট করবেন। বৃক্ষ নষ্ট হওয়ার পরে তিনি বুঝতে পারবেন, তিনি কী হারিয়েছেন।

স্বামীর বন্ধুর সাথে রোমান্টিক আলাপ নিঃসন্দেহে পারিবারিক শান্তির জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। যে-কারো সাথে আলাপ করা যাবে, কিন্তু তার একটা

মাত্রা থাকতে হবে। তবে এ-ক্ষেত্রে আপনার দোয়া করা ছাড়া কিছু করার নেই। অন্যের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক ব্যাপারে কখনো নাক গলাতে যাবেন না। এতে বিষয়টিতে আরো জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি টিভি সিরিয়ালের পরকীয়ার কথা বলেছেন। যেগুলো দেখলে মানুষের মনে টেনশন সৃষ্টি হয়। যদি বাস্তবে এরকম ঘটনা ঘটে তো মানুষের জীবনে কীরকম প্রভাব ফেলতে পারে? সম্প্রতি জানতে পারি, পরিচিত এক বয়স্ক লোক, যার ছেলে একটি বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি করে এবং মেয়ে ভার্সিটিতে পড়ে, সে এত বছরের সংসারের বউকে ঠকিয়ে, না জানিয়ে পরকীয়া করে আরেকটি বিয়ে করে ফেলেছে। স্ত্রী এখনো জানে না। জানলে কী হবে বলা মুশকিল। এসব শুনে আমি কি আমার স্বামীর ওপর আস্থা রাখতে পারি? সে-ও যদি... । এর উত্তর পরিষ্কার করে বলবেন কি?

উত্তর : একটি সত্য ঘটনা বলি। আমাদের এক গ্রাজুয়েট তার অসুস্থ স্ত্রীকে টানা ১০ বছর অক্লান্তভাবে সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে তার বাসাটাকে হাসপাতাল বানিয়ে ফেলতে হয়েছিল। সারাক্ষণ তার দেখাশোনা করতে হতো। এজন্যে তার ব্যবসাও লাটে উঠল। সবকিছু হারাতে হলো। কিন্তু তার কথা ছিল, স্ত্রী-ই যদি না থাকে, তাহলে ব্যবসা দিয়ে কী করব?

তার স্ত্রীর যে অসুখ ছিল, তাতে যে-কোনো সময় তিনি মারা যেতে পারতেন। স্বামীর সেবায় বেঁচে ছিলেন এতগুলো বছর। মৃত্যুর পরও ১৫ বছর কেটে গেছে। ভদ্রলোক আর বিয়ে করেন নি। দুটি মেয়ে আছে তার। স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এ মেয়েদেরকে মানুষ করেছেন। এক মেয়ে ডাক্তার। আরেক মেয়ে ফার্মাসিস্ট। দুজনই এখন প্রতিষ্ঠিত।

আপনি যেটি বলেছেন এবং এই ঘটনা—দুটোই সত্য। তাই একজনকে দেখে অন্যজনকে বিচার করা যাবে না। আবার একে দেখে যদি মনে করেন, সব পুরুষই এরকম হবে, সেটাও ভুল হবে। ভালো-মন্দ মিলিয়ে মানুষ। আপনার স্বামী আপনারই। আরেকজনের স্বামীর সাথে তার তুলনা করতে যাবেন না। আরেকজনের স্বামী বা স্ত্রী খারাপ কাজ করেছে বলেই আপনার স্ত্রী বা স্বামীও খারাপ কাজ করবে, এটা মনে করা পাপ।

প্রত্যেকটি মানুষ আলাদা। আপনার স্বামীকে বিচার করবেন আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে। আরেকজন পুরুষের আলোকে নয়। যদি সব পুরুষই একরকম হতো, তাহলে সংসার থাকত? আবার সব নারীই যদি একরকম হতো, থাকত সংসার? অতএব অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন না। পুরুষের মধ্যে

মন্দ আছে, নারীর মধ্যেও মন্দ আছে। মন্দ অংশগুলোকে আমরা বাদ দেবো, ভালো অংশগুলোকে আমরা গ্রহণ করব।

প্রশ্ন : হঠাৎ একদিন প্রমাণিত হয়, আমার স্বামী অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে শুধু মন ভালো রাখার জন্যে। আমি রাতে ঘুমিয়ে গেলে দীর্ঘসময় মোবাইলে গল্প করে। এরপর আমার ভেতর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়। মেডিটেশন করেও মন থেকে স্বামীকে ক্ষমা করতে পারি না। মনে হয়, এত জঘন্য ঘটনা আমি বেঁচে থাকতে কেন দেখলাম! আমি কী করলে তাকে ক্ষমা করতে পারব, শান্তি পাব, বেঁচে থাকার আনন্দ পাব?

উত্তর : বিষয়টি নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। এটা একধরনের মনোবিকার। এটা অন্যায়। তবে ঘটনার অন্যদিক হচ্ছে আপনি তাকে ক্ষমা করতে চাচ্ছেন। অর্থাৎ আপনি এখনো তাকে ভালবাসেন। এজন্যে আপনি ক্ষমা করতে চান। আর ক্ষমা করার জন্যে কোনোকিছুর প্রয়োজন হয় না। ক্ষমা করার জন্যে ক্ষমা করাই যথেষ্ট। আপনি ভাবুন—আপনার ছেলে বড় হয়েছে, ছেলের বউ এসে একই অভিযোগ করল আপনার কাছে। তাকে কী বলতেন? অধিকাংশ মা-ই বলতেন ক্ষমা করে দিতে।

আমাদের সমস্যাটা হয় এখানেই। আমরা ছেলের অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করতে পারি না। মেয়ের অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু ছেলের বউয়ের অপরাধ ক্ষমা করতে পারি না। মেয়ের যে অপরাধ অনায়াসে ক্ষমা করতে পারি, স্ত্রীর সে অপরাধ ক্ষমা করতে পারি না।

আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, আপনি আপনার স্বামীকে খুব ভালবাসেন। অতএব ক্ষমা করে দিন। আপনি শান্তি পাবেন। আর তার জন্যে দোয়া করতে থাকুন, যেন তিনি তার ভুল বুঝতে পারেন এবং এরকম ক্ষতিকর সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।

প্রশ্ন : আমি বিদেশি এক মেয়েবন্ধুকে কোয়ান্টাম মেথডের ইংরেজি মেডিটেশন সিডি ও অটোসাজেশন বই দিয়েছিলাম। সেই মেয়ে আমার প্রতি এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, সে আমার দ্বিতীয় স্ত্রী হওয়ার তীব্র ইচ্ছা পোষণ করেছে। পুরো ব্যাপারটি আমার স্ত্রী জানে। এই সম্পর্কের কারণে আমার দাম্পত্য জীবনে অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। আমি মেয়েটির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছি, কিন্তু সে আমাকে মাঝে মাঝে মেসেজ পাঠায়। সে আমাকে ভুলতে পারছে না এবং খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমি চাই না, সে আমার তরফ

থেকে মনে কোনো কষ্ট পাক। আমি চাই তার সাথে সুন্দর একটা সম্পর্ক থাকুক, যেহেতু মেয়েটি আমার ওপর ভরসা করে স্বস্তি পাচ্ছে। সে তার শিক্ষাজীবন ও ক্যারিয়ারে বেশ সফল, তবে ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত দুঃখী। আমি তার সুখী সুন্দর সফল জীবন কামনা করে দোয়া চাইছি।

উত্তর : আমরাও তার সুখী সুন্দর সফল জীবন কামনা করে দোয়া করছি। তার দুঃখে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি। কিন্তু তার এই দুঃখকে সুখে রূপান্তরিত করার কোনো শক্তি আপনার নেই, সামর্থ্য এবং সুযোগও নেই। তার দুঃখের সাথে আপনি নিজেকে যত জড়াবেন, আপনার দুঃখ আর আপনার পরিবারের দুঃখ তত বাড়বে।

আপনি মনে করছেন যে, আপনি তার ভরসাস্থল। আসলে এটা হচ্ছে একজাতীয় নারী আর একজাতীয় পুরুষের রোগ। এই ধরনের মহিলা এবং পুরুষ, দুই-ই আছে। পরকীয়া করার জন্যে তারা নিজেদেরকে খুব দুঃখী হিসেবে অন্যের সামনে উপস্থাপন করে—আমার সংসারে সুখ নেই, শান্তি নেই ইত্যাদি। এটা একটা রোগ। এ ধরনের রোগ থেকে, রোগী থেকে একজন সুস্থ মানুষ যত দূরে থাকবেন, তত তিনি ভালো থাকবেন। বলতে পারেন, করুণা আদায় করার জন্যে এটা হচ্ছে একধরনের ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল। এই ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলের শিকার হবেন না।

আপনি অন্যের দুঃখে সমবেদনা জানাবেন। কিন্তু সে দুঃখ যদি আপনাকে গ্রাস করে ফেলে এবং আপনার পরিবারের দুঃখের কারণ হয়, তখন বুঝতে হবে যে, আপনি ভুল করছেন, সীমালঙ্ঘন করে যাচ্ছেন। আসলে সমস্যা হয় তখনই, যখন আমরা সীমাটা ভুলে যাই এবং সীমালঙ্ঘন করে বসি। অন্যকে সমবেদনা জানানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সমবেদনাকে কখনো আবেগের পর্যায়ে নিয়ে যাবেন না।

প্রশ্ন : আমি দুই বছরের বেশি সময় ধরে একটি বিবাহিত মেয়েকে ভালবাসি। তার সাথে কোনোরকম অনৈতিক সম্পর্ক নেই। জানি এ সম্পর্ক রাখাটা ঠিক হচ্ছে না। প্রথম থেকেই তাকে ভুলতে চাই। তাকে ভালবাসতে চাই না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। কী করব? এরকম অনৈতিক সম্পর্ক আমি চাই না। বিয়ে করে সুস্থ সুন্দর একটা জীবন চাই। কী করব?

উত্তর : আপনার এই উপলব্ধিকে আমরা শ্রদ্ধা করি। কারণ আপনি আপনার ভুল বুঝতে পেরেছেন। তবে আজকাল কিছু কিছু বিবাহিত পুরুষ এবং

বিবাহিতা নারীর মধ্যে এই প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে যে, অবিবাহিত তরুণ-তরুণীদের সাথে সম্পর্ক করা এবং ঘুরে বেড়ানো। আপনি হয়তো এরকম কারো পাল্লায় পড়েছেন। এখান থেকে যত দ্রুত বেরিয়ে আসেন তত ভালো। আর নিজের বিয়ের মনছবি দেখুন, চেষ্টা করুন, বিয়ে করুন। তাহলে আপনি এই গজব থেকে সহজেই বাঁচতে পারবেন।

প্রশ্ন : ও ছিল আমার শৈশবের সাথী। একসময় তা অন্যরকম ভালোলাগায় রূপ নিল। সুখেই কাটছিল সময়। সুখের স্মৃতির কথা বললে এখনো আমি আমার শৈশব আর ওকে ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাই না। কিন্তু পরিবারের দিকে তাকিয়ে অন্য একটি ছেলেকে বিয়ে করলাম। ঘোর কাটল তারপর। স্বামী, শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে যা যা শুনেছিলাম, দেখি সবই ভুল। আমাদের আর্থিক অবস্থা আর তাদের আর্থিক অবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য। কালচারও মেলে না। আমরা দুটো ভিন্ন জেলার মানুষ। ভাসুর-দেবর-জা মিলিয়ে বিশাল পরিবার। শ্বশুরবাড়ির ব্যবহারে আমি খুব কষ্ট পাই। এর মধ্যেই আবার ওর সাথে যোগাযোগ হলো, নিয়মিত দেখা ও কথা হতে লাগল। কারণ সে ছিল আমার সব দুঃখের সঙ্গী। সে আমার স্বামীকে ছেড়ে দিতে বলে। আমিও দোটানায় ভুগি। মনে করি বাচ্চা হলে ঠিক হবে। তাই বাচ্চা নিই। এরপর পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়। সব সম্পর্ক পরিহার করি। স্বামী ও সন্তান নিয়ে সুখে থাকতে চাই। কিন্তু স্বামীর দিক থেকে কোনো সহযোগিতা নেই। এখন আমার কী করণীয়?

উত্তর : এখানে আপনার সমস্যা হলো মানসিক টানাপোড়েন। মনটা দুই ভাগ হয়ে গেছে। একভাগ পুরনো প্রেমিকের দিকে। আরেকভাগ স্বামীর দিকে। দুদিকেই আপনার আকর্ষণ। স্বামীর সাথে থাকলে প্রেমিকের চিন্তা করেন। প্রেমিকের সাথে গেলে স্বামীর চিন্তা করেন।

কেউ যখন দুই নৌকায় পা দেন, দুদিকে যখন মন ভাগ হয়ে যায়, তার জীবনে কখনো শান্তি আসে না। একপক্ষকে পুরোপুরি ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত আপনার জীবনে শান্তি আসবে না। অনেক সময় আমরা ভাবি, বাচ্চা হলে বোধহয় দাম্পত্য জীবনে শান্তি হবে। কিন্তু সেটা খুব ভুল ধারণা।

অধিকাংশ সময় দেখা গেছে, বাচ্চা এসে গেলে দূরত্ব আরো বাড়ে, অশান্তি আরো বাড়ে। অতএব আপনার মনটাকে আগে ঠিক করুন। মনকে জিজ্ঞেস করুন, সবকিছু বিচার করে কোনদিকে যাওয়া আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। তারপর সেভাবে চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন : আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী পরকীয়ায় লিপ্ত। তাছাড়া আমার স্বামীও এই অবৈধ কাজে লিপ্ত। এ অবস্থায় আমি কী করব? আমার স্বামীকে মেডিটেশন কোর্স করানোর জন্যে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছি। আমার স্বামীর আচার-আচরণে আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমার কী করণীয়?

উত্তর : আপনি যেহেতু মেডিটেশন করতে জানেন, তাই স্বামীর জন্যে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে দোয়া করুন, মমতা দিয়ে বোঝান। কিন্তু এটা নিয়ে ঝগড়া করবেন না, ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করতে যাবেন না। স্ত্রীরা অনেক সময় এই ভুলটা করেন। প্রমাণ করতে গিয়ে স্বামীর যেটুকু লজ্জা অবশিষ্ট আছে সেটাও ভেঙে দেন। আর লজ্জা যদি একবার ভেঙে যায়, সে তখন বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। সে বলতে পারে, তোমার সাথে জেদ করে আমি এটা করেছি। এখন এটাই করব। তাই এই ভুলটা করবেন না।

আপনার স্বামীকে যে আপনি কত ভালবাসেন এবং সে যে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে বোঝে না—এই অনুভূতিটা তাকে বার বার বোঝানোর চেষ্টা করবেন। এ-ক্ষেত্রে একটু অভিনয় করলেও দোষ নেই। আপনার স্বামীর সাথেই তো অভিনয় করছেন, আরেকজনের স্বামীর সাথে তো করছেন না।

প্রশ্ন : কেউ যদি কোনো অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং কিছুদিন পরে তার ভুল বুঝতে পেরে তা থেকে মুক্ত হতে চায়, তখন কী করণীয়? সমস্যা হলো, অপরপক্ষ এই সম্পর্ক ভাঙতে চাচ্ছে না এবং সেই ব্যক্তির সঙ্গে একই কর্মস্থলে কাজ করার কারণে ডাইরেক্ট কোনো অ্যাকশনেও যাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তর : এটা বেশ কঠিন। এজন্যে সম্পর্কে জড়ানোর আগেই চিন্তা করতে হবে যে, সম্পর্কটা বৈধ না অবৈধ এবং সম্পর্কের সীমারেখাটা কোথায়? প্রত্যেকটা সম্পর্কের একটা সীমা আছে। মা-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধবী, ভাই-ভাই, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যেও একটা সীমা আছে। এই সীমাটা যখন বুঝবেন তখন দেখবেন যে, আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

আপনি প্রথম ভুল করেছেন অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে। এখন সম্পর্ক যেহেতু অবৈধ, এই অবৈধকে চাপা দিতে গেলে অবৈধ আরো অনেক কিছুর মধ্যে আপনাকে জড়িয়ে পড়তে হবে। একটা মিথ্যাকে চাপা দিতে গেলে অনেকগুলো মিথ্যার প্রয়োজন হয়। অতএব যত দ্রুত এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন তত ভালো। প্রথমত, সম্ভব হলে দ্রুত কর্মস্থল বদলে ফেলুন। নিজের ভুলের জন্যে আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চান।

দুই হচ্ছে, এ সম্পর্ককে যতদিন বজায় রাখবেন, আপনার কষ্ট ও অনুশোচনার পরিমাণ বাড়তে থাকবে। আপনার মেধার বিকাশ এবং অগ্রগতি ব্যাহত হবে। অতএব দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিন। ভুলের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এজন্যে সাহসের প্রয়োজন। আপনাকে সাহসী হতে হবে।

প্রশ্ন : পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে আমার স্ত্রী চলে গেছে, যা আমি এখনো বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু তার বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে। কী করে নিজেকে চিন্তামুক্ত করব?

উত্তর : শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলুন যে, পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে আপনার স্ত্রী চলে গেছে। কারণ পত্রিকার একটি রিপোর্ট হলো, এক মা আর তার মেয়ে মিলে নিজেদের স্বামীদেরকে মেরে ফেলেছে। কারণ দুজনেই পরকীয়ায় আসক্ত ছিল। তো এজন্যে আপনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন যে, স্ত্রী পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে চলে গেছে। আপনাকে খুন করে যায় নি।

আর যদি বয়স থাকে, নতুনভাবে আবার জীবন শুরু করুন। সবসময় আনন্দিত থাকতে হবে, শোকরগোজার থাকতে হবে। আপনার আনন্দের ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দেবেন না। আপনি তো অন্যায় কিছু করেন নি। অন্যায় করল আরেকজন আর আপনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন কেন? আপনি যেহেতু কোনো অন্যায় করেন নি, অতএব নতুনভাবে জীবন শুরু করুন।

প্রশ্ন : একটি ওয়ার্কশপে আপনি বলেছিলেন, কারো বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ থাকলে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করতে। প্রশ্ন হলো, কেউ কি এসব প্রমাণ রেখে করে? বিভিন্ন ধর্মে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও এ যুগে অনেকেই অনেক কিছু করে। আমরা যারা আলোর পথের যাত্রী, তারা নিজের দোষ বেশি করে দেখি। উল্টোভাবে অপরের গুণগুলো বেশি করে দেখার চেষ্টা করি। এই চেষ্টা সঠিক কিনা?

উত্তর : কারো বিরুদ্ধে পরকীয়ার অভিযোগ থাকলে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা কখনোই ঠিক নয়। তাই গুজব ছড়িয়ে কাউকে কালিমালিপ্ত করবেন না। আসলে অপরাধ যখন কেউ করতে থাকে, তখন কোনো অপরাধীই প্রমাণ রেখে করে না। কিন্তু প্রমাণ থেকে যায়। অতএব কেউ যদি অপরাধ করে, এটা আজ হোক কাল হোক প্রকাশিত হবেই।

দ্বিতীয়ত, আপনি অপরের গুণগুলো দেখবেন এবং যে দোষ নিজের মধ্যেও রয়েছে অন্যের সেই দোষ গোপন রাখবেন অর্থাৎ যে দোষ আপনারও আছে, তা নিয়ে যত আলোচনা না করবেন, আপনি তত এগিয়ে যাবেন। আর অন্যের দোষের দিকে না তাকিয়ে, অন্যের সীমাবদ্ধতার দিকে না তাকিয়ে নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোকে দেখার চেষ্টা করুন। তাহলেই আপনি আলোকিত হবেন, আপনি এগিয়ে যাবেন।

অন্যের দোষ নিয়ে যদি তার পেছন পেছন ঘুরতে থাকেন, তাহলে আপনি পিছিয়ে পড়বেন। এজন্যে অন্যের দোষগুলো দেখার চেয়ে নিজের দোষগুলো দেখুন এবং নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন : অনেক বিবাহিত মানুষকে দেখা যায় ইন্টারনেটে বায়বীয় পরকীয়া করে আসছেন। অনেকে এই নিয়ে তাদের সংসার পর্যন্ত ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই বিষয়ে আপনার মতামত প্রত্যাশা করছি।

উত্তর : আমরা দোয়া করি, তারা যেন এই ভুল পথ থেকে, বিভ্রান্তি থেকে, বিকৃতি থেকে ফিরে আসে। কারণ এটা আসলে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার চেয়েও ক্ষতিকর। নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারলে তো একসময় ব্যথা টের পেয়ে কুড়াল মারা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই বায়বীয় পরকীয়া একজন মানুষকে ঘুনপোকার মতো ভেতর থেকে শেষ করে দেয়, সে টেরও পায় না। সব হারানোর পর হয়তো অনুভব করে। এজন্যে পরকীয়া যে-রূপেই হোক, তা খুবই জঘন্য অপরাধ!

প্রশ্ন : পরকীয়ার এই যে বিস্তার—এর পেছনে টিভি সিরিয়ালের কি কোনো ভূমিকা আছে? টিভি সিরিয়াল তো অধিকাংশের কাছে নেশার মতো।

উত্তর : টিভি সিরিয়াল নেশার মতো শুধু না, বরং এটা নেশাই। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির দুজন অধ্যাপক জন রবিনসন এবং স্টিভেন মার্টিন ৩১ বছর ধরে ৩০ হাজার লোকের ওপর এক গবেষণা চালান। এতে দেখা যায়, যে মানুষগুলো অন্যদের চেয়ে গড়ে ৩০ ভাগ সময় বেশি টেলিভিশন দেখে কাটায়, নিজেদের জীবন নিয়ে তারা কেউ সুখী নয়।

গবেষক রবিনসনের মন্তব্য হলো, মাদক গ্রহণকারী একজন মানুষ সাময়িক উত্তেজনা আর ভালোলাগা অনুভব করলেও পরমুহূর্তেই যেমন ডুবে যায় হতাশা বিষণ্নতায়, টিভি সিরিয়াল আসক্তিও তেমনি। কিছু সময় আপনি

এটা উপভোগ করেন। কিন্তু আখেরে হতাশা ও অনুশোচনাতেই ডুবে যান।

আসলে এই টিভি সিরিয়ালগুলো কীভাবে এলো? প্রথমে ৮০-র দশকে ইংলিশ সিরিয়াল এলো—*ডালাস*, তারপরে *ডাইনেস্টি*। এগুলোর অনুকরণে তৈরি হলো হিন্দি সিরিয়াল, পরবর্তীকালে বাংলা সিরিয়াল। এগুলোর মূল উপজীব্য হলো, পরকীয়া এবং ভায়োলেন্স—হিংসা সন্ত্রাস মারামারি কূটনামি চক্রান্ত ষড়যন্ত্র। এখনকার ওয়েব সিরিজগুলোও তা-ই।

এই সিরিয়ালগুলো আপনার মধ্যে তৈরি করছে আসক্তি। পরের পর্ব না দেখা পর্যন্ত আপনি শান্তি পাচ্ছেন না। ধৈর্যসহকারে কাজকর্ম গুছিয়ে অপেক্ষা করছেন—পরের পর্ব দেখার জন্যে, যেন আরেকটু নেশা বাড়ে। যে-রকম মদ যারা খায় তারা প্রতিদিন কিন্তু ওই সময়ের জন্যে অপেক্ষা করে। আপনিও কিন্তু সিরিয়ালের নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওই সময়ে যদি মেহমান আসে, আপনজন আসে তার চেয়ে শত্রু আর কাউকে মনে হয় না। এমনকি নিজের মা এলেও মনে হয়, আসার আর সময় পেল না!

আর এসব সিরিয়ালে যখন পরকীয়া দেখানো হয়, আপনি তখন এটাকে আর খারাপ মনে করেন না। কারণ ততদিনে এগুলোতে আসক্ত হয়ে গেছেন। দেখতে দেখতে এটাকেই তখন স্বাভাবিক আর সাধারণ মনে হয়। একপর্যায়ে মনে হয়, আমিও একটু-আধটু করলে দোষ কোথায়? কারণ মদ যে খায় সে কি মদকে খারাপ কিছু ভাবে? ভাবে না। কোল্ড ড্রিংকস যে খায় সে কোল্ড ড্রিংকসকে খারাপ ভাবে না বলেই খেতে পারে। এখন যে সমাজে পরকীয়ার এত বিস্তৃতি, এটা তো এসব দেখতে দেখতেই হয়েছে।

আবার কখনো কখনো হয়তো সে বোঝে যে, জিনিসটা খারাপ। কিন্তু ততক্ষণে তার নেশা হয়ে গেছে। পরকীয়াকে আপনি ভেতর থেকে ভালো মনে করছেন না। আপনি কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছেন। ধরুন, আপনার স্ত্রী বা স্বামী থাকার পরও আপনি যখন অন্য নারী বা পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছেন, আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না।

আবার যেহেতু দেখছেন যে, এখন টিভি সিরিয়াল মানেই পরকীয়া, তখন এটাকে খারাপও মনে করতে পারছেন না আবার ভালোও মনে করতে পারছেন না। ফলে আপনার ভেতরে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এ অন্তর্দ্বন্দ্ব আপনার দেহে টক্সিন সৃষ্টি করছে, যার ফলে আপনি একটা কষ্টে ভুগছেন।

পছন্দের সিরিয়াল দেখার আরেকটা কারণ হতে পারে, আপনার হয়তো সেই সিরিয়ালের কোনো চরিত্রকে ভালো লাগছে। হয় নায়ককে ভালো লাগছে, না হয় নায়িকাকে ভালো লাগছে। অথবা যে ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করছে তাকে ভালো লাগছে। কোনো চরিত্র আপনাকে আকৃষ্ট না করলে

আপনি এটা দেখতেন না। আর যে চরিত্রটা আপনার ভালো লাগবে সে চরিত্রটা আপনাকে প্রভাবিত করবে।

যে নায়ক বা নায়িকাকে আপনার ভালো লাগে, একটা পর্যায়ে দেখলেন সে-ও পরকীয়ায় জড়িয়ে গেছে। যেহেতু আপনার অবচেতন মন ওই নায়ক বা নায়িকার প্রতি দুর্বল, তার অভিনীত চরিত্রের প্রভাবও তখন অবচেতনভাবেই আপনার ওপর পড়ে। আপনি একসময় নিজেকে ওই চরিত্রের মতোই ভাবতে শুরু করেন। আর বিষয়টাকে তখন আর আপনার তেমন একটা খারাপও লাগে না। এভাবে শুধু পরকীয়া নয়, সিরিয়ালের আরো নানা মন্দ দিক দ্বারা আপনি প্রভাবিত হতে পারেন।

অতএব টেলিভিশন কতক্ষণ দেখবেন, কী দেখবেন—এটা ঠিক করে নিন। আর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার দেড় থেকে দুই ঘণ্টা আগে টিভি বন্ধ করে দিন। তাহলে আপনার ঘুম ভালো হবে এবং পরকীয়ায় আসক্তি সৃষ্টি হওয়া থেকেও আপনি রক্ষা পাবেন।

প্রশ্ন : যখন স্বামী পরকীয়ায় মত্ত হয় এবং টাকাপয়সা নষ্ট করে, বউ-বাচ্চাকে অভাবে রাখে, তখন স্ত্রী হিসেবে করণীয় কী?

উত্তর : পরকীয়া যারা করে তাদের জীবনে কখনো সুখ থাকে না এবং অন্যের জীবনের সুখকেও তারা নষ্ট করে। এরা সমাজের অভিশাপ। কাজেই পরকীয়া পুরুষ করুক অথবা নারী—এদের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।

আর স্ত্রী হিসেবে সেই হতভাগা স্বামীর জন্যে দোয়া করতে পারেন, মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে তাকে এনে বোঝাতে পারেন। অথবা নিজের পরিবারের সাথে বসে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন স্বামীর ব্যাপারে। আসলে মেয়েদের এরকম নানান সমস্যা মোকাবেলার জন্যেই আমরা সবসময় বলি, প্রত্যেকটা মেয়ের উচিত আত্মপরিচয় সৃষ্টি করা। স্বাবলম্বী হলে যে-কোনো দুর্দশায় অন্তত ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হবে না।

প্রশ্ন : বিবাহিত পুরুষ বা মহিলাদের অবিবাহিত তরুণী বা তরুণদের প্রতি অপ্রত্যাশিত আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদের আচার-আচরণ সম্পর্কে কিছু বলুন। বিবাহিত পুরুষ বা মহিলার বিপরীত লিঙ্গের সাথে কেমন আচরণ ও চালচলন হওয়া উচিত? আজকাল শুধু যে তরুণ-তরুণীরাই এসব তথাকথিত প্রেম বা বিয়ের ফাঁদে পড়ছে তা কিন্তু নয়। বরং বিবাহিত পুরুষরাও আজকাল তরুণী মেয়েদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করছে।

উত্তর : এটা একদম সত্য কথা। এই তরুণীদেরকেই তো আমরা সতর্ক থাকতে বলছি। সেইসাথে তরুণদেরকেও সতর্ক থাকতে বলছি। কারণ এই সম্পর্ক কখনোই কল্যাণকর নয়; বরং কোনো কোনো বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা যখন অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে যায়, এর চেয়ে গর্হিত কাজ তো আর কিছু হতে পারে না।

এ ধরনের কাজ যারা করে তারা মানুষ নামের অযোগ্য। যে নিজের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করে, তাদের পরিণতি কখনো ভালো হয় নি। এর পরিণতি অত্যন্ত মর্মান্তিক ও করুণ। কারণ যে নিজের স্বামী বা স্ত্রীর সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করবে, সে পরের জনের সাথেও বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে।

যখন কেউ বলে যে, আমার স্ত্রী তো আমাকে দেখতে পারে না, এজন্যে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি—এ ধরনের পুরুষ বা মহিলাকে বিশ্বাস করবেন না। যিনি বিশ্বাস করবেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হবেন।

প্রশ্ন : কেউ যখন একটার পর একটা পরকীয়া করতে থাকে, তার ব্যাপারে কী করা যায়?

উত্তর : একটা ঘটনা বলি—এক ভদ্রলোক খুব সুদর্শন, সুপুরুষ। তিনি খুব সুন্দরী এক নারীকে বিয়ে করেছিলেন—প্রেম করে। কিন্তু বিয়ে টিকল না। কারণ উনি প্রেমে পড়েছিলেন আরেক মহিলার, যিনি বিবাহিতা এবং এক সন্তানের মা। তিনি তাকে বিয়ে করলেন।

দুই/ তিন বছর পর তিনি বলতে থাকলেন, জীবন অতিষ্ঠ। এর সাথে থাকলে আর বাঁচব না। এরপর দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি এবং আবার আরেক বিবাহিতার সাথে সম্পর্ক। দুই-তিন বছর পর সেটাও শেষ। এবং চতুর্থ বারও একই ঘটনা।

অর্থাৎ এটা একটা রোগ। আর এই রোগ যাদের আছে তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োজন। তো সাধারণত এই প্রেমরোগ এবং পরকীয়া যখন কাউকে পেয়ে বসে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাকে সাহায্য করতে পারে না। আর কেউ যদি আল্লাহর সাহায্য না চায়, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন না।

প্রশ্ন : স্বামী পরকীয়া করেছিল, কিন্তু এখন আর সেই সম্পর্কটা নেই। যখন সম্পর্ক ছিল তখন ওই মহিলার কাছে আমার অনেক বদনাম করেছিল এবং অনেক টাকাও খরচ করেছে তার পেছনে। প্রিয়জনের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে সারাক্ষণ কুরে কুরে খাচ্ছে। কীভাবে মুক্তি পাব গুরুজী?

উত্তর : পরকীয়া যার সাথে করেছিল সে-তো পর হয়ে গেছে। আপনিই শেষ পর্যন্ত আপন হিসেবে থেকে গেছেন। আপনি যেহেতু তার থেকে বিচ্ছিন্ন হন নি, তিনি এখনো আপনার স্বামী। অতএব মনে করবেন যে, যা হয়েছে হয়ে গেছে। আপনার ছেলে বা মেয়ে যদি এরকম করত, আপনি কী করতেন? আপনি কিন্তু ঠিক বলতেন, ছেলে মানুষ, একটু না হয় করেছে, কী হবে। তাকে তো আপনি বাদ দিতে পারতেন না।

আসলে স্বামী হোক স্ত্রী হোক, অতীতের একটি ঘটনা যা এখন নেই, সেটি নিয়ে খামোখা কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই। এটি হচ্ছে রি-একটিভিটি, যা আপনার কষ্টই বাড়াবে। কষ্ট দূর করার খুব সহজ উপায় হচ্ছে মাফ করে দিন তাকে। তাহলে আল্লাহও আপনাকে মাফ করে দেবেন। কারণ যে ক্ষমা করে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীলকে পছন্দ করেন। এমনকি আগে থেকে ক্ষমা করে দেয়া ভালো। কারণ ক্ষমা না করলে পরকালে এগুলো সাথে নিয়ে যেতে হবে।

প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ-র একটা গল্প আছে, জহুর ধোপার গল্প। ইংরেজ আমলের কথা। এখন যেমন নানারকম পদক দেয়া হয়, তখন সমাজে ধনীদের নানারকম খেতাব দেয়া হতো। এসব খেতাব ছিল প্রভাবশালী হওয়ার মাপকাঠি। আর খেতাবের বিনিময়ে এই সমাজপতিরা হয়ে যেতেন ইংরেজদের হুকুমের গোলাম। তো এরকম এক খানসাহেব ভূষিত হয়েছেন খানবাহাদুর উপাধিতে। টাইটেল নেয়ার জন্যে অনুষ্ঠানে যাবেন। তার কাপড়চোপড় পাঠিয়েছেন ধোপার কাছে। ধোপা তার বাড়ির পাশেই থাকে, অনেকদিনের পুরনো জহুর ধোপা।

অনুষ্ঠানের দিন খানসাহেব বাড়ির চাকরকে পাঠালেন ধোপার কাছ থেকে তার কাপড় নিয়ে আসার জন্যে। কাপড় দেখে তো তিনি ভয়ংকর ক্ষেপে গেলেন জহুর ধোপার ওপর। কাপড়ের নানান জায়গায় টুটাফাটা, রংচটা। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখেন জহুর ধোপা তার বাড়ির দিকেই আসছে। খানসাহেবের মাথায় আগুন ধরে গেল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিরাট এক লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন তাকে। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, তুই আমার কাপড়ের বারোটা বাজিয়েছিস, আজকে আমি তোর বারোটা বাজাব।

খানসাহেবের উগ্রমূর্তি দেখে জহুর ধোপা তো হতভম্ব। তারপর সে-ও জান বাঁচানোর জন্যে প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল। খানসাহেব শেষমেশ তাকে আর ধরতে পারলেন না। হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়লেন। পুরনো যা কাপড় ছিল সেগুলো পরে অনুষ্ঠানে গেলেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে খানবাহাদুর হওয়ার পর যখন বাড়ি ফিরলেন, স্ত্রী তাকে

বললেন, খামোখা তুমি এত চিৎকার-চেঁচামেচি করলে। জহুর ধোপা তো তোমার কাপড় নিয়েই এসেছিল। খানবাহাদুর সাহেব বললেন, তাহলে ওই রং-ওঠা কাপড়? স্ত্রী বললেন, ওটা ধোপাখানার টেবিলের ওপরে ছিল। তোমার চাকর ভুলে সেই প্যাকেট নিয়ে এসেছে।

তো স্বাভাবিকভাবে খানবাহাদুরের মনটা দুর্বল হলো। জহুর ধোপাকে ডেকে বললেন, আমি খুব দুঃখিত, আমি তোমাকে অহেতুক কালকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছি, তুমি আমাকে মাফ করে দিও। শুনে জহুর ধোপা খানবাহাদুরের পায়ে পড়ে বলল, হুজুর, আমাকে লজ্জা দেবেন না। মাফ তো আমি অনেক আগেই করে দিয়েছি।

আগেই করে দিয়েছ মানে? সে বলল, আমার গুরু বলেন, জহুর, তুমি যদি কাউকে মাফ না করো, তো যখন মারা যাবে তখন স্বাভাবিকভাবে এগুলো নিয়ে আল্লাহর সাথে দেন-দরবার করতে হবে যে, অমুককে শাস্তি দিতে হবে, অমুকে আমার এই করেছে, সেই করেছে। এই অভিযোগ শুনতে শুনতে তো দেরি হয়ে যাবে। তুমি যা ভালো কাজ করেছ এটার পুরস্কার আল্লাহ তায়ালা কখন দেবেন তোমাকে? তাই এসব বোঝামুক্ত হয়ে তারপরে আল্লাহর কাছে গিয়ে বলবে, আল্লাহ! আমার কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। তুমি আমাকে এবার সরাসরি পুরস্কার দিয়ে দাও।

ক্ষমা যে আমাদের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা এই গল্প পড়ে নতুন করে উপলব্ধি করেছিলাম। আমরা কষ্ট পেলে, অপমানিত হলে বা ক্ষুব্ধ হলে সাথে সাথে বা ক্ষমা চাওয়ার আগে কাউকে ক্ষমা করতে পারি? বরং কেউ ক্ষমা চাইলে আমরা আবার গর্ব করে বলি যে, ক্ষমা চেয়েছে, না চাইলে কি ক্ষমা করতাম? তো একজন ধোপার যদি এ চেতনা জাগ্রত হতে পারে, তাহলে আমাদের চেতনার স্তর তো আরো ভালো হওয়া উচিত।

অতএব কেউ যখন ভুল করার পর ফিরে আসে, সেটাকে সবসময় ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এটা নিজের জন্যেই কল্যাণকর।

প্রশ্ন : আমার স্বামী আমাকে পছন্দ করে না। সে তার পুরনো প্রেমিকার কাছে যেতে চায়। তাকে বিয়ে করতে চায়। তার পুরনো প্রেমিকার ডিভোর্স হয়েছে। আমার চার বছর ছয় মাসের ছেলে। আমাকে বিয়ের পরে আট বছর পড়তে দেয় নি। আমি ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও আমাকে কিছু করতে দিত না। কারণ তার প্রেমিকাও ডাক্তার। আমি তার কাছে চার বার পায়ে ধরে সংসার করতে চেয়েছি। সে আমাকে দুই বার বিদেশ থেকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার কি তার কাছে যাওয়া উচিত?

উত্তর : আসলে এখন তো প্রেম একটা রোগ। একজন একবারে তিন-চার জনের সাথে প্রেম করাটা এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে স্ট্যাটাস সিম্বল। এবং ফেসবুকে তারা স্ট্যাটাসও দেয় যে, আমার এতজন গার্লফ্রেন্ড, এতজন বয়ফ্রেন্ড আছে। তারা এদেরকে আর প্রেমিক/ প্রেমিকা বলে না।

আপনি ডাক্তার, কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারেন নি। আপনি তার কাছে চার বার পায়ে ধরে সংসার করতে চেয়েছেন, দুই বার বিদেশ থেকে আপনাকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাহলে আপনার মানসম্মান থাকে কোথায়? আরেকজনের সাথে যার প্রেম আছে তাকে যদি আপনি বিয়ে করেন, আপনি জয়ী হলেন প্রথম রাউন্ডে। কিন্তু সে-তো প্রেমিকাকে ভুলে যায় নি!

এটা শুধু আপনার সমস্যা নয়, এখনকার সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রান্ত জেনারেশনের অনেকেরই সমস্যা। কিন্তু যেহেতু বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি এখনো স্বামীকে ভালবাসেন, তো মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে গিয়ে তাকে বোঝান এবং দোয়া করুন। আমরাও দোয়া করি যেন আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং নিজের পরিচিতি ও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন। কারণ আমরা প্রত্যাশা করি, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সম্মান নিয়ে বাঁচুক। আত্মসম্মান বিকিয়ে দিয়ে কখনো সুখী হওয়া যায় না।

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী পরকীয়া করছে। গত দুই বছর ধরে তার এই সম্পর্ক। যদিও এখনো প্রাথমিক পর্যায় বলে মনে হচ্ছে। প্রথমে সে শুধু ফোনে কথা বলত এবং ইন্টারনেটে চ্যাটিং করত। ইদানীং সে তার সাথে দেখাও করছে। লোকটি অত্যন্ত সুপুরুষ এবং সামাজিক পরিচিতি আছে। তার স্ত্রী আরেক জায়গায় চাকরি করে। চার সন্তানের জনক। তবে তিনি অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। যে-কোনো মেয়ে তার চেহারা দেখে প্রেমে পড়ে যাবে। কিন্তু নিজের স্ত্রীর সাথে তার বনিবনা নেই।

উত্তর : এই যে চেহারা দেখে প্রেমে পড়ে যাওয়া—এটা কিছু মানুষের একটা রোগ। এরা চেহারা দেখে প্রেমে পড়ে যায়। নিজের স্ত্রী বা নিজের স্বামীকে ভালো লাগে না। অন্যের স্বামীর বা স্ত্রীর চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়। এটা অপসংস্কৃতি, সোশ্যাল মিডিয়া এবং টিভি সিরিয়ালের প্রভাবে হচ্ছে।

এই পরকীয়ার ফলে কী হচ্ছে—কিছুদিন আগের একটি খবরে দেখলাম, রাজধানীর উত্তরায় দুই ভাইবোন একসাথে আত্মহত্যা করল। কেন? কারণ বাবা পরকীয়া করে আরেকজনকে বিয়ে করেছে। মা চাকরি করে ছেলেমেয়ের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করেছেন বটে, কিন্তু তাদেরকে সঠিক

জীবনদৃষ্টি দিতে পারে নি। অর্থাৎ শুধু মা-বাবা হলে হয় না। শুধু ও-লেভেল, এ-লেভেল পড়ালে হয় না। শুধু ফাস্ট ফুড খাওয়ালে হয় না। সন্তানকে একটা সুন্দর জীবনদৃষ্টি দিতে হবে। সেইসাথে নিজেদেরকেও হতে হবে সন্তানের রোল মডেল। তা না করে যদি মা-বাবা পরকীয়ায় লিপ্ত হয়, তো সন্তানের পরিণতি এমনটাই হবে। আমরা আদর করি কিন্তু ছেলেমেয়ের যে শারীরিক-মানসিক শক্তি তৈরি হওয়া দরকার, তাকে যে পরিশ্রম এবং কষ্টসহিষ্ণু করা দরকার—এটা আমরা করছি না। এটা আমাদের জন্যে অত্যন্ত দুঃখজনক, অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

এখন আপনার স্ত্রীকে পরকীয়ার গজব থেকে বাঁচানোর জন্যে আপনি যা করতে পারেন, তা হলো স্ত্রীকে মেডিটেশনে মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাতে থাকুন। আপনি যে তাকে কত ভালবাসেন সেটা মমতা দিয়ে বোঝান। তার জন্যে দোয়া করুন। বাস্তবে তাকে পর্যাপ্ত সময় দিন। মন থেকে বলুন, আমি তোমাকে অনেক ভালবাসি। এভাবে কিছুদিন চেষ্টা করে দেখুন। আমরা আশা করি হয়তো পরিবর্তন হবে।

প্রশ্ন : পারিবারিক ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে, ডিজিটাল টক্সিনের প্রভাবে আজ ঘরে ঘরে পরকীয়ার বলি নারী ও পুরুষ। পারিবারিক অবক্ষয় চরমে পৌঁছেছে। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন দয়া করে?

উত্তর : আমরা এসব ব্যাপারে কোয়ান্টাম মেথডের শুরু থেকেই সচেতন করছি। কারণ মানুষের জন্যে পরিবার খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষ যখন পরিবারের সহযোগিতা পায়, তার মেধার বিকাশ ঘটানোটা সহজ হয়। যখন পরিবার সুখের হবে, পরিবার থেকে অবিদ্যা দূর হবে, তখন আমরা জাতিগতভাবে, ব্যক্তিগতভাবে একটা নতুন স্তরে উন্নীত হবো। সেটা হচ্ছে সমমর্মিতা, নৈতিকতা এবং শুদ্ধাচারের স্তর। শুদ্ধাচার, আদব-কায়দা, সবই তো আসে পরিবার থেকে। পরিবারকে ভালো রাখার জন্যে জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি লাভের জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এখন তো পরকীয়া হচ্ছে বন্ধুত্বের নামে। তাই সাধারণ ধারণা হচ্ছে, বন্ধুত্বে দোষের তো কিছু নেই। এটাকে আধুনিকতা বা একটা মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করা হচ্ছে। আসলে মানুষ যখন খারাপ জিনিসগুলো বার বার দেখতে থাকে মিডিয়ায় এবং বাস্তবে, তখন সেগুলোকে আর অপরাধ মনে হয় না। অনৈতিকতাও তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায়। এজন্যে এমন জঘন্য পাপ করেও তারা বুক ফুলিয়ে চলে।

আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে, এই ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা। এটা যে মারাত্মক অন্যায়, অনেক বড় পাপ এবং এটা যে স্বামী বা স্ত্রীর কাছে ঋণ—সে মাফ না করা পর্যন্ত মুক্তি নেই, এই বিষয়টা সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে। তার বুক ফুলিয়ে চলাটাকে আগে থামাতে হবে যে, না, পরকীয়ার মতো কবীরা গুনাহর কাজ করেও বুক ফুলিয়ে চলার কিছু নেই। এই সত্য যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তাদের ফোলা বুক বেলুনের মতো চুপসে যাবে। এ ব্যাপারে জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিক নিৎশে সুন্দর বলেছিলেন যে, এরা ভুল করে; আবার অহংকারে বক্ষ স্ফীত করে।

আসলে এদের কোনো বক্ষই নেই। কারণ সত্য ছাড়া কখনো শক্তি আসে না। মিথ্যার কোনো শক্তি নেই। এখনকার প্রজন্মের একটা অংশ, যারা নষ্ট হয়ে গেছে, তারা তাদের খারাপটুকু দেখেও না, বোঝেও না। তারা মনে করে যে, এটাই গর্ব করার মতো যে, আমার কত গার্লফ্রেন্ড আর কত বয়ফ্রেন্ড আছে! এটা যে বাহাদুরি নয়, বরং এটা যে পাপ, এই বিশ্বাসটা আগে ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মধ্যে।

তাছাড়া আমাদের সমাজে পুরুষদের 'পরকীয়া' খুব বেশি দোষের মনে করা হয় না, যতটা দোষের মনে করা হয় নারীদের ক্ষেত্রে! কিন্তু একটি পরিবারে স্বামী বা স্ত্রী যে-কোনো একজন যদি পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে, সেই সংসার ধ্বংসের মুখে পড়ে। সেখানে সন্তান থাকলে তার ভোগান্তি হয় সবচেয়ে বেশি। তাই নারী বা পুরুষ যে-ই পরকীয়া করুক, এদেরকে সমান অপরাধী হিসেবে গণ্য করব।

আমরা নিজেরা এ ব্যাপারে সচেতন হবো। কারণ 'পরকীয়া' এবং 'ব্যভিচার' এ দুটোর মধ্যে কোনো তফাত নেই। 'ব্যভিচার' যেমন শাস্তিযোগ্য অপরাধ, পরকীয়া করাটাকে একইভাবে সবাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করলে এই অভিশাপ অনেকটা কমে যাবে। শাস্তি ও অসম্মানিত হওয়ার ভয়ে হলেও মানুষ এ থেকে বিরত থাকতে সচেষ্ট হবে।

আর আপনি যখন নিজে ব্যভিচার ও পরকীয়া থেকে বিরত থাকবেন, তখন আপনার কথার মধ্যে শক্তি চলে আসবে। আপনি তখন অন্যদেরকেও সচেতন করতে পারবেন।

প্রশ্ন : গুরুজী, আমি কি আমার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি? গত ছয় মাস যাবৎ একজন পুরুষের মোহে আটকা পড়ে আছি। সর্বক্ষণ অবচেতন মনে তাকেই ভাবতে থাকি, এমনকি মেডিটেশনের সময়ও। আমি বিবাহিত। আমার এমন কেন হলো? আমি এখন কী করব?

উত্তর : আপনি বিবাহিত, আপনার স্বামী আছে। তারপরও অন্য একজন পুরুষের কথা ভাবছেন! তার মানে, শয়তান আপনাকে বিভ্রান্ত করেছে। এটা শয়তানের কাজ। কারণ পরিবার শেষ হয়ে গেলে আপনি নিজেও ভালো থাকতে পারবেন না।

অতএব যেটা হয়েছে এজন্যে তওবা করুন এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করুন। নিয়মিত মেডিটেশন করুন। সবসময় আপনার পরিবারের কথা চিন্তা করুন। পরিবারের সবার যত্ন নেয়ার কাজে সময় বাড়িয়ে দিন। স্বামীর ভালো দিকগুলোর প্রতি মনোযোগ দিন। আর আপনার পছন্দের বা শখের কাজগুলোতে ডুবে যান। ভালো কাজে নিজেকে অনেক ব্যস্ত রাখলে ধীরে ধীরে আপনার অবচেতন মন থেকে ক্ষতিকর মোহ দূর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আমার স্বামীকে নিয়ে পরিবারে খুব অশান্তিতে আছি। একটি মেয়ের সাথে সে গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে। ১২ বছর ধরে কোনো ঈদ তার সাথে ভালোভাবে কাটাই নি। করণীয় কী?

উত্তর : পরকীয়া নামক মোহগ্রস্ততা একধরনের রোগ। এই রোগে যখন কেউ আক্রান্ত হয়, তখন সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এখন আপনি হলেন ভিকটিম। আর ভিকটিম বা ভুক্তভোগীর সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে ধৈর্য এবং কৌশল। যেহেতু ১২ বছর ধরে বিয়ে এবং বোঝা যাচ্ছে যে, আপনি তাকে ছাড়তে চাচ্ছেন না, তাই তার ব্যাপারে নেতিবাচক হবেন না। দোয়া করতে থাকুন। কারণ অন্যের পাগল ছেড়ে দিলেও নিজের পাগলকে মানুষ বেঁধে রাখে।

অতএব আপনি তার ব্যাপারে ইতিবাচক থেকে তাকে বোঝাতে থাকুন কমান্ড সেন্টার মেডিটেশনে বসে। খুব মমতা দিয়ে বার বার বার বার তার সামনে তুলে ধরুন—কাজটা তার জন্যে কত ক্ষতিকর, পরিবারের জন্যে এবং সন্তানের জন্যে কী পরিমাণ ক্ষতিকর!

রাগ করে বোঝালে হবে না। কারণ রাগ করে যখন আপনি কাউকে বোঝাতে যাবেন সে আপনার কথা মেনে নেয়ার অবস্থায় থাকবে না; বরং নানা যুক্তি দিয়ে সে সবসময় নিজেকে এবং তার কাজটাকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এজন্যে বোঝাতে হবে সবসময় আলফা লেভেলে শান্ত থেকে এবং দরদ দিয়ে। আশা করি, এই রোগ থেকে তিনি মুক্ত হবেন।

প্রশ্ন : আমার বোনের দেবরের সাথে আমার বিয়ের কথা ছিল। তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়তাম, উনি অনার্সে। ধার্মিক ছিলাম বলে আমাদের মধ্যে

সেভাবে প্রেম ছিল না। ওনাকে মনে মনে খুব ভালবাসতাম। বড় হওয়ার পর বিয়ের জন্যে বলা হলে উনি এড়িয়ে গেলেন। অথচ আগে উনিসহ পরিবারের সবাই এমনভাবে কথা বলতেন, মনে হতো এখানেই বিয়েটা হবে। আমি এগুলোকে খুব সিরিয়াসলি নিতাম। কিন্তু তারা আমাকে উপেক্ষা করার পর খুব কষ্ট পেয়েছি, যদিও নিজ সম্মানের কথা ভেবে কিছু বুঝতে দেই নি। এদিকে বাবা অন্যত্র আমাকে বিয়ে দিলেন। কিন্তু আমার স্বামী বদমেজাজী। আমাদের দুই মেয়ে। বিয়ের এত বছর পরেও কোনোভাবেই ওই ভাইয়ার কথা ভুলতে পারি না। মনে হয় সব বাদ দিয়ে তার কাছে চলে যাই। সেই ভাইয়াও বিয়ে করেছেন, তাদেরও দুই সন্তান। আমি তাকে অনেক মিস করি। আমরা দুজনই চাই যে, আমাদের সংসার নষ্ট না হোক। কী করব?

উত্তর : এটা তো মনে মনে পরকীয়া করা। পরকীয়া কখনো সম্মানজনক নয়, শুভ তো নয়ই। এটা আপনার পারিবারিক অশান্তি আরো বাড়িয়ে দেবে। আর সেই ভাইয়ার সাথে আপনার বিয়ে হলেও বিয়েটা যে সুখের হতো, সেটা কি আপনি নিশ্চিত বলতে পারেন? আল্লাহ ছাড়া তা আর কেউ বলতে পারে না। বরং তার সাথে বিয়ে হয় নি বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন।

এখন আপনাদের দুজনের পরিবারেই সন্তান আছে। আপনার স্বামী আছে, তার স্ত্রী আছে। এ অবস্থায় কিছু ভাবতে গেলে দুটো পরিবার ধ্বংস হবে। যদি দুজনই সংসার ছেড়ে আসেন, আপনারা কি সুখী হবেন? এভাবে সুখী হওয়া যায় না। এটা নিয়ে নাসিরুদ্দীন হোজার গল্প আছে—

হোজা এক বিধবাকে বিয়ে করেছে। দুজন গল্প করছে বিছানায়। মহিলাটি তার আগের স্বামী কত ভালো ছিল, কী ছিল না ছিল সেসব বলছে। কিছুক্ষণ পরে হোজা তাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানা থেকে ফেলে দিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, এটা কী হলো? হোজা বলল—দেখো, বিছানা এত ছোট, এখানে তিন জন থাকার সুযোগ নেই। তুমি যখন আমাদের মাঝে তোমার পুরনো স্বামীকে নিয়ে এসেছ, ভাবলাম সেই স্বামী নিয়েই থাকো।

এখন আপনার এবং আপনার স্বামীর মাঝে যদি আরেকজন মনে মনেও থাকে, তাহলে স্বামীর তো বদমেজাজ হবেই। আপনার চিন্তায় রয়েছে আরেকজন। চিন্তার সেই তরঙ্গটা যাচ্ছে আপনার স্বামীর ব্রেনে। তাই স্বামী বা স্ত্রীর মাঝখানে এসব পুরনো ভালবাসা ঢুকাবেন না। ভালবাসা দোষের কিছু নয়। যে-কেউ যে-কাউকে ভালবাসতে পারেন। কিন্তু ভালবাসা আর বিয়ে এক নয়। বিয়ের পর দৃষ্টিভঙ্গি হবে যে, সংসারে আমার স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া আমি আর কিছু বুঝি না। তাহলে দেখবেন যে, সব ঠিক থাকছে।

অতএব তওবা করুন। ভাবুন—যা হয়েছে, হয়েছে; আমার স্বামীই আমার সব। সেই ভাই তার মতো সংসার করুক, ভালো থাকুক। অর্থাৎ আপনার চিন্তাটাকে পাল্টে দিন। আপনি কখনো ১৫ বছর আগে বা ২০ বছর আগে ফিরে যেতে পারবেন না।

আবার যেহেতু আত্মীয়, তাকে ভুলে যাওয়ারও কিছু নেই। মনে মনে বলবেন যে, তুমি আমার অতীত। তুমি আমার সামনে এসে কোনো লাভ নাই। কারণ অতীত নয়, বরং সবসময় বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে থাকতে হয়। তাহলে আপনি ভালো থাকবেন।

ডিভোর্স

প্রশ্ন : সবাই দেখেশুনে ভালো ছেলে দেখে ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর বুঝলাম, সে আসলে আমার বাবার টাকার লোভে আমাকে বিয়ে করেছে। প্রতি রাতে মদ খেয়ে বাসায় আসত। তাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। সে আমাকে সহ্যই করতে পারে না। এখন আমি বাবার বাসায় আছি। কী করব বুঝতে পারছি না। কারণ এত কিছুর পরও তাকে আমি ভালবাসি।

উত্তর : যে স্ত্রী এত কিছুর পরও স্বামীকে ভালবাসে, তাকে তো আমার পরামর্শ দেয়ার কিছু নেই। এটা আপনাদের দাম্পত্য আবেগের ব্যাপার, যেখানে স্ত্রী স্বামীর সমস্ত উপেক্ষা মেনে নিয়েও সেই স্বামীরই ভক্ত হয়ে থাকে। আপনি মা-বাবার সাথে আলাপ করতে পারেন, তাদের পরামর্শ নিয়ে দেখতে পারেন।

প্রশ্ন : সম্প্রতি আমার ডিভোর্স হয়েছে। কারো বাসায় গেলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করবে সন্তান নেই, ডিভোর্স কেন হলো ইত্যাদি। আমি কি নিঃসংকোচে বলব যে, আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে? কী উত্তর দেবো?

উত্তর : কেন ডিভোর্স হলো সেটা অহেতুক বলতে যাবেন না। বলতে হলে সহজভাবে বলবেন যে, কপালে ছিল না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কপালের দোহাই দেয়াটা খুব নিরাপদ। অর্থাৎ কোনোকিছু নিয়ে কখনো হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না। ডিভোর্স হয়েছে, তাতে কী? একজন পুরুষ তো ডিভোর্স হলে চিন্তা করে না যে, সে ডিভোর্সি। তো একজন মহিলার ডিভোর্স হয়েছে, তাতে কী

হয়েছে? সবসময় বিষয়টাকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করবেন। দেখবেন, অন্যরাও ব্যাপারটা সহজভাবে গ্রহণ করছে।

আর বিয়ে করলে যদি বলতে পারেন যে, আমি বিয়ে করেছি, তো ডিভোর্স হয়ে গেছে এটা কেন বলতে পারবেন না? অবশ্যই যা সত্য সেটাই বলবেন। আপনার তো লুকানোর কিছু নেই। বিয়ে যেমন হতে পারে, ডিভোর্সও হতে পারে। এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। দুজন ভালো মানুষ একসাথে না-ও থাকতে পারে। ভালো মানুষ হলেও তারা ভালো স্বামী বা ভালো স্ত্রী না-ও হতে পারে। অতএব ডিভোর্স হওয়াটা দোষের কিছু নয়।

প্রশ্ন : আমার স্বামী বিয়ের নয় দিন পর ইউএসএ চলে যায়। বলেছিল, খুব তাড়াতাড়ি আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘ আট মাস আমি তাদের বাসায় অবস্থান করার পর জানতে পারলাম, সে আগে বিয়ে করেছে এবং তাদের বায়োডাটা-তে অনেক মিথ্যা তথ্য ছিল। আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম। একপর্যায়ে আগের তালাকের কাগজও পেলাম তার বাসা থেকে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে সে আমার সাথে উল্টাপাল্টা করে। ১৪ মাস পর সে আমাকে একটা তালাকনামা পাঠায় যাতে কোনো সিল নেই। অনেকের কাছে আমি তালাকের কাগজের কথা বলেছি, সবাই বলেছে ভুয়া। আমি এখন কী করব?

উত্তর : এ-ক্ষেত্রে আপনার যারা অভিভাবক রয়েছেন, তাদের সাথে আলাপ করুন। তারা যা ভালো মনে করেন এবং আপনি যেটা ভালো মনে করেন, সেটাই করবেন। এ ব্যাপারে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করার স্বাধীনতা গ্রহণ করুন। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, আপনি কী করবেন। কারণ জীবন আপনার এবং কিছু বিষয় আছে, যেখানে আপনার নিজেকেই চিন্তা করতে হবে। আর আপনার এটুকু কথা শুনে পরিস্থিতি বোঝা সম্ভব নয়। তাই এ ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা উচিত নয়।

আর পাত্র বিদেশে থাকে শুনেই ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে। এ কারণে বিদেশি পাত্রের ব্যাপারে আমরা সবসময় সতর্ক করি যে, খুব ভালোমতো খোঁজ না নিয়ে বিয়ে করবেন না।

প্রশ্ন : আমার বিয়ে হয়েছে প্রায় চার বছর। আমরা দুজনই সরকারি কর্মকর্তা। বিয়ের পর থেকেই আমি স্বামীর খারাপ ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে আসছি। একপর্যায়ে তাকে কাউন্সেলিংয়ে নিয়ে যাই। সাইকিয়াট্রিস্ট বলেন, তিনি মুড ডিজঅর্ডার সমস্যায় ভুগছেন। ওষুধ ও কাউন্সেলিং লাগবে। কিন্তু আমার স্বামী

মনে করেন, তার আচরণ স্বাভাবিক এবং আমাকে এসব মেনে নিয়েই তার সংসার করতে হবে। সে তুচ্ছ কারণে বা অকারণে যে ব্যবহার আমার সাথে করে, তা দিনের পর দিন সহ্য করা কোনো স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে অনেক বুঝিয়েছি, নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করেছি, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। অভিভাবক পর্যায়ে কথা শুরু হবে খুব শিগগিরই। আল্লাহ না করুক, সম্ভবত আমার সংসার টিকবে না। আমার প্রশ্ন, কোনো অন্যায় না করেও কেন এত কষ্ট পাব? কেন আমাকে সংসার ভাঙার অপমান সইতে হবে?

উত্তর : এখানে প্রশ্ন অনেকগুলো। প্রথমত, চার বছর হলো আপনারা বিয়ে করেছেন। বিয়ে কিন্তু একক কোনো ব্যাপার নয়। বিয়েতে দুটো পক্ষ থাকে। একজন স্ত্রী, একজন স্বামী। এর মধ্যে আপনার স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে যদি কোনো সমস্যা থাকে, তার জন্যে আপনি দায়ী নন। কিন্তু কষ্টটা তো আপনাকে ভোগ করতে হচ্ছে, যেহেতু আপনি তাকে বিয়ে করেছেন। এর আনন্দটুকু যে-রকম আপনার, কষ্টটুকুও আপনাকে ভোগ করতে হবে।

দুই, যদি মুড ডিজঅর্ডার থেকে থাকে, তাহলে এর যে পরিণতি, তা ভোগ করতে হবে, যতক্ষণ না তিনি সুস্থ হচ্ছেন। মানসিকভাবে অসুস্থ একজন মানুষের সেবা করা যায়, কিন্তু তার সাথে ঘর করা খুব কঠিন। প্রতিনিয়ত কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়।

তিন, বিয়েটা কোনো জোরপূর্বক চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। বিয়ে হচ্ছে একটা কন্ট্রাক্ট, একটা চুক্তি। এ-ক্ষেত্রে যদি দুজনের মধ্যে বোঝাপড়ায় মিল না হয়, দুজন যদি খাপ খাওয়াতে না পারেন, পরস্পর পরস্পরের প্রতি টান এবং ভালবাসা সমভাবে অনুভব না করেন—একপক্ষ যদি বঞ্চিত মনে করে, আর একপক্ষ যদি সম্পর্কটা কষ্টের মনে করে, তখন ডিভোর্স খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এর মধ্যে সামাজিক কোনো অসম্মানের ব্যাপার নেই। রসুলুল্লাহর (স) যুগে সাহাবীদের মধ্যেও ডিভোর্স হয়েছে। অতএব ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করা উচিত।

আপনি বললেন, কোনো অন্যায় না করেও কেন এত কষ্ট পাব? আসলে কষ্ট পাওয়ার জন্যে অন্যায় করার কোনো প্রয়োজন হয় না। একজন সাধারণ নিরীহ মানুষকে সন্ত্রাসীরা যখন পেটায়, তার কী অন্যায় ছিল? একজন নারী যখন আরেকজনের হাতে অপমানিত হন, সেই নারীর কি কোনো অন্যায় ছিল? কষ্ট শুধু অন্যায়ের শাস্তিস্বরূপ আসে না। এটা হচ্ছে ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি বা প্রতিক্রিয়া।

অতএব আপনি কোনো অন্যায় করেছেন, এটা মনে করার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা কোনো অন্যায়ের শাস্তি নয়। এ সবগুলো বিষয় ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করে ও অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ করে আপনি আপনার সিদ্ধান্ত নিন।

প্রশ্ন : যদি এমন হয়, শুধু লোক দেখানোর জন্যে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে, তাহলে সে অবস্থা থেকে সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কে ফিরে আসা কি সম্ভব?

উত্তর : যে-কোনো অবস্থা থেকে একজন মানুষ যদি সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কে ফিরে আসতে চায়, তবে তা সম্ভব। কারণ সম্পর্ক তো একসময় ছিল। দেখা যায়, বিরোধের সময় সাধারণত স্বামী ও স্ত্রী দুজনই তাদের ঝগড়া এবং দুর্ব্যবহারের স্মৃতিগুলো বার বার মনে করতে থাকেন। সম্পর্কের আনন্দময় ঘটনাগুলো তখন আর মনে পড়ে না।

মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে স্বামী বা স্ত্রীকে নিয়ে আসুন। আপনাদের সম্পর্কের আনন্দময় স্মৃতিগুলোর কথা তাকে মনে করিয়ে দিন। এভাবে নিয়মিত করতে থাকুন। দেখবেন, পরিবর্তন আসছে। ৯৯% ক্ষেত্রেই এ প্রক্রিয়া সফল হয়েছে। আর সম্পর্কের উন্নতি তখনই বাধাগ্রস্ত হয়, যখন তৃতীয় পক্ষ এতে নাক গলায়। তাই তৃতীয় পক্ষকে এড়িয়ে আপনি যদি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগোতে পারেন, ইনশাআল্লাহ পরিবর্তন আসবে।

প্রশ্ন : পারিবারিক অশান্তি চরমে ওঠায় বর্তমানে সন্তান নিয়ে মায়ের বাসায় আছি। অশান্তির কারণে ইচ্ছে হয় ডিভোর্স দেই। কিন্তু সাড়ে ছয় বছরের বড় বাচ্চাটা তার বাবার জন্যে কাঁদছে। কীভাবে সন্তানদের জীবনে তাদের বাবাকে দিতে পারি? আমি কি এই স্বামীর কাছে ফিরে যাব? আমার কী করা উচিত?

উত্তর : এটা দুর্ভাগ্য যে, মা-বাবা যখন ঝগড়া করে, পরিবারে যখন অশান্তি হয়, তাদের বাচ্চাদের জীবন হয় খুব কষ্টের। মাকে যেমন তাদের দরকার, দরকার বাবাকেও। আপনি এখন শারীরিকভাবে মায়ের বাসায় কিন্তু আপনার মন তো পড়ে আছে স্বামীর বাসায়। বাচ্চা যতটা চায়, তার চেয়ে আপনার চাওয়াটাও মোটেই কম নয়।

যেহেতু আপনি স্বামীকে ছাড়তে চাচ্ছেন না, কেন আলাদা থাকবেন? সুযোগ-সুবিধামতো আবার সংসারে ফিরে যান। নিয়মিত মেডিটেশন করুন, মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে স্বামীকে বোঝান। যে কারণগুলোতে অশান্তির

সৃষ্টি হয়, নিজের দিক থেকে যতটা পারেন সেই কারণগুলোকে এড়িয়ে চলুন। যে সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না, সেখানে দেয়াল তোলার কোনো প্রয়োজন নেই। আর একহাতে কখনো তালি বাজে না। আপনার ভুলগুলোকে শনাক্ত করার চেষ্টা করুন। অন্তত আপনার ভুলগুলো তো আপনি কমাতে পারবেন। তাতে আপনার অশান্তি কমবে।

প্রশ্ন : আমার বিয়ে হয়েছে চার মাস। এমনিতে আমরা বেশ ভালো আছি। কিন্তু মাঝে মাঝে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে সে বার বার ডিভোর্সের হুমকি দেয় এবং বলে জোর করে সংসার করব না। কথা কাটাকাটি হলেই ডিভোর্স। জিনিসটা তার ব্রেনেও সেট হয়ে আছে। আমার তো মনে হয়, ভবিষ্যতে যে-কোনো মনোমালিন্যে সে এই সিদ্ধান্তে যাবে। বিষয়টা নিয়ে আমি চিন্তিত এবং ভয় কাজ করে। তালাক শব্দটা তার মেমোরি থেকে মুছে ফেলতে হবে।

উত্তর : খারাপ শব্দ যত কম উচ্চারণ করা যায়, তত ভালো। খারাপ শব্দ বার বার উচ্চারণ করতে করতে সেটা ঘটে যেতে পারে। বাস্তবে কখনো কখনো ডিভোর্সের প্রয়োজন হয়, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এটা মুখে বার বার উচ্চারণের বিষয় নয়। কোনো পুরুষ বা কোনো নারীর এ শব্দটি উচ্চারণ করা উচিত নয়। ভালো বা মন্দ শব্দ বা বাক্য যত বেশি উচ্চারণ করবেন, তত আপনার জীবনে তার প্রভাব বাড়তে থাকবে। আপনি এ কথাগুলোই তাকে প্রতিদিন মেডিটেশনের কমান্ড সেন্টারে এনে মমতা দিয়ে বোঝান।

প্রশ্ন : আমার স্বামী খুবই বদমেজাজী। আমার মানসম্মানের কথা চিন্তা না করেই অনেক মানুষের মধ্যে আমাকে অপমান করে। আজ ১৫ বছর ধরে এমনটা করছে। বার বার মনে হয় ডিভোর্স দিয়ে দেই।

উত্তর : দীর্ঘদিন ধরে নারীর প্রতি যে অন্যায়, অপমান—এটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল। সাধারণভাবে আমরা জেনেছি, হাওয়ার (আ) প্ররোচনায় আদম (আ) গন্ধম খেয়েছিলেন। অর্থাৎ আদমের (আ) স্বর্গচ্যুতির জন্যে দায়ী হচ্ছেন হাওয়া (আ)। কিন্তু কোরআনে কোথাও তা বলা হয় নি। তবুও নারীকে অহেতুক অপবাদ দিয়ে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা সবসময়ের। আর এজন্যে কতভাবে যে নারীকে অপমান করা হয়েছে, তার শেষ নেই।

গ্রামবাংলায় তো ছড়া আছে, ‘অভাগার মরে গরু, ভাগ্যবানের মরে জরু’

অর্থাৎ গরু মারা যাওয়াটা ক্ষতিকর কিন্তু জরু বা স্ত্রী মারা যাওয়া লাভজনক। তাতে নতুন স্ত্রী পাওয়া যাবে এবং বিয়ের সময় যৌতুকও পাওয়া যাবে। আরেকটা কথা আছে, যে স্ত্রীর কথা শোনে, সেই স্বামীকে বলা হয়েছে আহাম্মক নম্বর দশ। একটা চীনা প্রবাদ হচ্ছে, 'প্রতি তিন দিনে একবার বউ না পেটালে সে মাথায় উঠে বসবে।' আধুনিক সমাজের কোনো কোনো কবি-সাহিত্যিকও নারীকে অশ্রদ্ধা করে সাহিত্য রচনা করেছেন।

অথচ স্ত্রীকে দাসী বানিয়ে রাখার পরিণাম হচ্ছে, সেই পরিবারে কখনো শান্তি থাকে না এবং নারীর মধ্যে বিদ্রোহপ্রবণতা দেখা দেয়। সে তখন পরিবার ভাঙতে উদ্বুদ্ধ হয়। পাশ্চাত্যে এখন এই সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সেখানে বিবাহবিচ্ছেদ, পারিবারিক নির্যাতন, মারপিট খুবই সাধারণ ঘটনা। সেখানে পুরুষ ও নারী যেন এক চিরস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত।

ডাচ-আমেরিকান সাইকিয়াট্রিস্ট ও গবেষক বেসেল ভেন ডার কক (Bessel van der Kolk) এর *The Body Keeps the Score* নামে একটি বহুল পরিচিত বই আছে। বইটিতে সেন্টার অব ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন-এর একটি গবেষণা রিপোর্ট দেয়া হয়েছে যে, 'প্রতি পাঁচ জনে একজন আমেরিকান শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। প্রতি চার জনে একজন শিশুকে পরিবারে এমনভাবে প্রহার করা হয় যে, তার শরীরে দাগ পড়ে যায়। প্রতি তিন দম্পতির এক দম্পতি মারপিট করে এবং প্রতি আট শিশুর মধ্যে একজন দেখেছে যে, তার মাকে প্রহার করা হয়েছে।'

আমাদের দেশেও পারিবারিক সহিংসতা এবং বিচ্ছেদের ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে। 'বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স' অনুযায়ী ২০১১ সালে দেশে ডিভোর্সের হার ছিল প্রতি হাজারে ০.৭, যা ২০২১ সালে বেড়ে হয়েছে প্রতি হাজারে ১.৪।

২০২২ সালে রাজধানীতে প্রতি ৪০ মিনিটে ১টি করে ডিভোর্স হয়েছে। ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এবং জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে ডিভোর্সের এই চিত্র পাওয়া গেছে।

তবে নির্যাতিতা নারীদের এক বিপুল অংশ ডিভোর্স থেকে বিরত থাকেন। এর কারণ হতে পারে দুটো। এক—নিজস্ব 'শিকড়' না থাকা; দুই—নির্যাতনের পরও স্বামীর প্রতি একধরনের আকর্ষণ। এজন্যেই বার বার ডিভোর্সের কথা মনে হলেও ডিভোর্স দেয়া হয় না। এখন আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে যে, ১৫ বছর সংসার করার পর আপনি কি আসলেই ডিভোর্স চান? চাইলে বাধাটা কোথায়? বাধা অতিক্রমের সাহস বা উপকরণ আপনার আছে কিনা? যদি না থাকে, তাহলে সবর করাটাই উত্তম।

প্রশ্ন : স্বামী আমাকে ও আমার ছেলেকে শত্রুর মতো দেখেন। উনি প্রচুর উপার্জন করেন ও বিদেশে ঘোরেন। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার সময় টাকা ও চেক বই ভাতিজাকে দিয়ে যান। অন্যদের জন্যে টাকাপয়সা বেহিসেবী খরচ করলেও আমাদের জন্যে ন্যূনতম হাতখরচ দিতেও তার অনীহা। পরকাল, সমাজ ও সংসারের ভয়ে ডিভোর্স দেই নি।

উত্তর : আসলে সমাজ, সংসার বা পরকাল—এগুলোর অজুহাত দেয়া অর্থহীন। স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার ক্ষেত্রে আপনার মূল বাধা হলো আপনি হয়তো অবচেতনভাবে তাকে ভালবাসেন বা আপনার অর্থনৈতিক অবলম্বনের অভাব। আর্থিক নিশ্চয়তা এবং আত্মপরিচয় থাকলে, একজন স্ত্রী কেন মুখ বুজে অবহেলা-অপমান সহ্য করবেন?

কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে মর্যাদা না দেয়, তাকে ক্রমাগত দাবিয়ে রাখে, তাহলে সেই অসম্মানের জীবন থেকে বেরিয়ে আসাই সম্মানজনক। কারণ আত্মসম্মানবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে কখনো মানুষের মতো জীবন যাপন করা যায় না। কিন্তু আপনাকে তা-ই করতে হচ্ছে এবং স্বামীকে ডিভোর্স না দেয়ার জন্যে সমাজ, সংসার বা পরকালের মতো অজুহাত দেখাতে হচ্ছে। হয়তো এ-ছাড়া আপনার আর কোনো উপায় নেই। এজন্যেই লেখাপড়া শিখে প্রত্যেক নারীর যোগ্য হওয়া এবং আত্মপরিচয় সৃষ্টি করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

এখন আপনি কী করবেন? স্বামী যেন আপনাকে ভালবাসতে পারে এবং আপনার ওপর আস্থা রাখতে পারে, এমন গুণ নিজের মধ্যে তৈরি করুন। আপনার মধ্যে যদি অপচয়ের প্রবণতা থাকে, তাহলে সেটা সংশোধন করুন। সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলুন। আর দোয়া করুন।

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয়া এবং তার স্বামী কর্মসূত্রে একই অফিসে ছিলেন। পদমর্যাদায় স্ত্রী ছিলেন স্বামীর সিনিয়র। দুজনই বদমেজাজী। কর্মক্ষেত্রে ব্যবধানের কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে সংসার ভেঙে যায়। কর্মক্ষেত্রে এরকম অসমতা থাকলে স্বামী/ স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত?

উত্তর : স্ত্রী তার চেয়ে ওপরে উঠে গেছে—এ নিয়ে অধিকাংশ স্বামীই হীনম্মন্যতায় ভোগেন। এসব স্বামীদের ধারণা হলো, স্ত্রীরা তাদের চেয়ে ইনফিরিয়র হবে। তারা স্ত্রীকে সহযোদ্ধা মনে করতে পারেন না। যদি মনে করতেন, তাহলে স্ত্রীর সম্মানকে নিজের সম্মান মনে করতেন। স্ত্রী যদি স্বামীর চেয়েও বেশি পরিচিত হন, তাহলে তো স্বামীরই আনন্দিত হওয়া উচিত

সবচেয়ে বেশি। এজন্যে সবসময় শোকরগোজার হওয়া উচিত। আপনি যদি স্ত্রীকে যথাযথ সম্মান করতে পারেন, তাহলে আপনার হীনম্মন্যতায় ভোগার কোনো কারণ নেই।

আর স্ত্রী স্বামীর চেয়ে উঁচু পদমর্যাদার হলেও স্বামীকে সহযোদ্ধা মনে করবেন, সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবেন—অর্থাৎ পারস্পরিক সম্মানবোধ থাকতে হবে। এটাই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রশ্ন : আমার স্বামী খুব রাগী। রেগে গেলে সবকিছুই করতে পারে। রাগের মাথায় সে আমাকে ডিভোর্সও দিয়ে দেয়। কিছুদিন পর এসে বলে, 'আমি রাগের মাথায় দিয়েছি, আমার মনের ভেতর ছিল না।' আমি তাকে খুব ভালবাসি। বুঝি, এরকম মানুষের কাছে থাকতে পারব না, তাই চেষ্টা করে তাকে ভুলে যাই। আবার যখন ও আসে, তখন বুঝতে পারি না কী করব।

উত্তর : ডিভোর্স কোনো ছেলেখেলা নয়। স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে যদি কোনোভাবেই আর একসাথে থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে ইসলামে তালাক বা ডিভোর্সের বিধান আছে, যার মাধ্যমে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে আলাদা হয়ে যাবেন। কিন্তু এটি এত বড় একটি সিদ্ধান্ত যে, রাগের মাথায় তো নয়ই; অনেক ভেবেচিন্তে, সময় নিয়ে এ প্রক্রিয়ায় যেতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রথম তালাক দেয়ার তিন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে এবং তারপর চূড়ান্ত তালাক দিতে।

একবারে তিন তালাক দিলে তা কার্যকরী হবে। কিন্তু সেজন্যে স্বামীকে শাস্তি পেতে হবে। ওমরের (রা) সময় একজন তার স্ত্রীকে রাগের মাথায় একবারেই তিন তালাক দিয়ে ফেলল। ওমর (রা) ঘটনা শুনে রায় দিলেন, তাকে শাস্তি পেতে হবে। কারণ সে তার স্ত্রীর তিন মাসের অধিকারকে লঙ্ঘন করেছে। তার শাস্তি হলো ৮০ দোররা। খেলাফত আমলে পরবর্তীকালে আর কখনো আরবে এ ধরনের ঘটনা ঘটে নি।

ফকীহদের অভিমত হচ্ছে, রাগের মাথায়ও যদি ডিভোর্স দেয়া হয়, ইসলামি আইন অনুযায়ী তা কার্যকরী হয়ে যায়। এটা অনেকটা এরকম যে, আপনি রাগের মাথায় খুন করে এসে বলছেন, আমি তো রাগের মাথায় খুন করে ফেলেছি, এখন বুঝতে পারছি, এটা ঠিক করি নি। তুমি আবার বেঁচে ওঠো! তখন কি সে বেঁচে ওঠে, না খুনের শাস্তি থেকে খুনি রেহাই পায়?

তবে আমাদের দেশে প্রচলিত পারিবারিক আইন অনুযায়ী, তালাক কার্যকর হতে হলে তা লিখিত হতে হবে এবং তিন মাস সময় দিতে হবে। এই তিন মাসের মধ্যে যে-কোনো সময় তা প্রত্যাহার করেও নেয়া যাবে।

কিন্তু এখানে মানসিকতাটা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো পুরুষের তিন বার তালাকের অপেক্ষা না করে একবার তালাক বলার পরই তো একজন মর্যাদাসম্পন্ন নারীর সেখান থেকে চলে যাওয়ার কথা। যেখানে সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ নেই সেখানে একজন নারী কেন থাকবে? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি পারস্পরিক সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ না থাকে, সেখানে কখনো শান্তি আসে না।

এখন এত কিছুর পরও আপনি যেহেতু স্বামীকে ভালবাসেন, যেহেতু তাকে ভুলতে পারছেন না, অতএব কষ্ট বলুন, দুর্ভোগ বলুন—সব আপনাকেই সহ্য করতে হবে। এখানে অন্য কেউ সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার রাখে না।

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয়া বেশ কয়েক বছর ধরে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন। তার স্বামী বেশ রঙিন মেজাজের। বার বার প্রেমে পড়েন। সম্প্রতি তিনি নাকি বিয়েও করেছেন। কিন্তু মেয়েটির আত্মীয়রা তাকে বলছে, শেষমেশ ও তোমার কাছে ফিরবে, যদিও তার ফেরার কোনো লক্ষণ নেই। তবে মেয়েটি তার স্বামীকে মনে মনে ক্ষমা করেছে। এখন স্বামী যদি ফিরে আসে, মেয়েটির তাহলে কী করণীয়? সে কি তাকে গ্রহণ করবে?

উত্তর : চিন্তা তো মেয়েটির চেয়ে আপনারই বেশি দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির স্বামী অন্যত্র বিয়ে করেছে। পরনারীতে আসক্ত। তার ফেরার কোনো লক্ষণ নেই। মেয়েটি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। তারপরও সেই স্বামী ফিরতে পারে এবং ফিরলে মেয়েটি তাকে গ্রহণ করবে কিনা—এরকম সুদূরপরাহত সম্ভাবনা এবং ভাবনা নিয়ে তো অন্যদের বিচলিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পুরো সিদ্ধান্তই মেয়েটির এবং সে যা চাইবে, তা-ই হবে। অন্যদের এ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই; বরং দোয়া করতে পারেন।

প্রশ্ন : রাগান্বিত অবস্থায় একসাথে তিন তালাক দিয়ে পুনরায় সে স্ত্রীকে বিয়ে করা কি ইসলামে জায়েয আছে? বর্তমানে আলেমরা বলেন জায়েয নেই।

উত্তর : আমাদের দেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে একসাথে তিন তালাক কার্যকর হবে না। যেহেতু বিয়ে নিবন্ধিত হয়, তাই তালাকের নোটিশ দিতে হবে নির্ধারিত অফিসের মাধ্যমে। নোটিশ দেয়ার তিন মাস পর তালাক কার্যকর হবে।

তিন মাসের মধ্যে সমঝোতা হলে তা সংশ্লিষ্ট দফতরে অবহিত করে তালাকের নোটিশ প্রত্যাহার করে নেয়া যেতে পারে। আইনসম্মতভাবেই

তখন তারা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে জীবনযাপন করতে পারবেন। তাছাড়া যে-কোনো কারণে তালাক কার্যকরী হওয়ার পর সে স্ত্রীর যদি অন্যত্র বিয়ে হয় এবং সেখানেও যদি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ডিভোর্স হয়, তবে প্রথম স্বামীর সাথে তার বিয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কোন পর্যায়ে গেলে ডিভোর্স হওয়া উচিত? এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

উত্তর : ডিভোর্স সবসময় অপছন্দনীয় একটি বিষয়। তারপরও যদি বাধ্য হতে হয়, তাহলে তো কিছু করার নেই। তবে বিয়েটা যদি সুখের না হয়, ডিভোর্সের চিন্তাভাবনা যদি আসেই, তাহলে সন্তান হওয়ার আগে করাটাই ভালো। কারণ সন্তানের জন্যে ব্রোকেন ফ্যামিলির চেয়ে বড় অভিশাপ আর নেই। অনেকে মনে করেন, বাচ্চা হলে বোধহয় ঠিক হয়ে যাবে। আপনাকে দেখে যদি ঠিক না হয়, বাচ্চাকে দেখে কি ঠিক হবে? আর যদি বাচ্চা হয়েই যায়, তাহলে ডিভোর্সটাকে এড়াতে চেষ্টা করবেন।

ডিভোর্স দেবেন কি দেবেন না—এ সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণ আপনার বা আপনাদের ব্যক্তিগত। এ সিদ্ধান্ত অন্য কারো ওপর ছেড়ে দেবেন না। আসলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা একটা আবেগীয় সম্পর্ক। আপনি যদি মনে করেন, কোনোভাবেই আর সম্ভব না, তখন সিদ্ধান্ত নেবেন।

প্রশ্ন : আমার বয়স ২৮। আমি চার বছর বয়সের এক ছেলে সন্তানের মা। মাত্র সাত মাস আগে স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ হয়েছে। আমার সংসার আর পরিবারকে আমি খুব ভালবাসতাম। মানসিকভাবে আমি এখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। মনের বাড়ির দরবার হলের একটি অংশ ছিল আমার সেই প্রিয় সংসার। এখন সেখানে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু আসে না। মনছবি কী দেখব তা-ও বুঝি না। জীবনে পেছন দিকে ফিরে যেতে পারব না। সামনেও এগোতে পারছি না। কী করব? আমাদের বিচ্ছেদ মূলত আমার স্বামীর কারণে। দয়া করে সমাধান বলবেন।

উত্তর : আপনি অতীতে ফিরে যেতে পারবেন না। অতীত অতীতই। কিন্তু চাইলে নতুনভাবে জীবন সাজাতে পারবেন। কারণ সংসার শুধু স্ত্রীর ওপরে নির্ভর করে না, শুধু স্বামীর ওপরে নির্ভর করে না। নির্ভর করে দুজনের ওপরে। এই দুজনের একজন যদি না চান, আরেকজন যতই চান সেই

চাওয়াটা অর্থহীন হয়ে যায়। আর একটি কথা সবসময় মনে রাখবেন, আল্লাহর দুনিয়া অনেক বড়। বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে তো কী হয়েছে? আপনার একটা ছেলে আছে। আপনার জীবন আপনার। নতুন করে জীবন শুরু করুন। নিজের পরিচয় সৃষ্টি করুন। নিজের একটা পেশা গড়ে নিন। আল্লাহর কাছে চান, তাঁর কাছে কান্নাকাটি করুন। আল্লাহ তায়ালা চাইলে আবার এমন কাউকে পেয়ে যেতে পারেন, যে আপনাকে খুব ভালো বুঝবে।

আপনার জীবন আপনাকে গড়তে হবে। বিধ্বস্ত হয়ে বা ভেঙে পড়লে চলবে না। যে যাওয়ার সে চলে গেছে। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ এর চেয়ে খারাপ কিছুও হতে পারত। আমরা আপনার জন্যে দোয়া করি—সন্তানকে নিয়ে আপনি এগিয়ে যান। নিজেকে কখনো একা মনে করবেন না। কোয়ান্টামে একাত্ম হোন। সৃষ্টির কল্যাণে সৎসঙ্ঘে সঙ্ঘবদ্ধ থাকুন। আপনি নতুন করে জীবন শুরু করার অনুপ্রেরণা লাভ করবেন।

প্রশ্ন : আমার স্বামীর সাথে আমি পৃথক হই কিছুদিন আগে। এখন সে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। মানুষ তার কথা বিশ্বাস করছে। আমি চুপ থাকছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

উত্তর : যত বদনাম করুক আর অপবাদ দিক, আপনি চুপ থাকবেন। কিছু বলার দরকার নেই। কারণ আপনি যত বলতে যাবেন, অপবাদটা আরো ছড়াবে। মানুষ এমনিতেই এসব ভুলে যাবে কদিন পরে। কিন্তু আপনি প্রতিবাদ করতে গেলেই অপবাদটা আরো শক্তি পাবে। তাই আপনি উপেক্ষা করুন। আর অপপ্রচারের একটা বিশেষত্ব আছে। মানুষের স্মৃতি খুব দুর্বল। সে বেশিদিন কিছু মনে রাখে না, তাই অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় 'অপ'টা কয়েকদিন পরে হারিয়ে যায়, থাকে শুধু প্রচার।

অতএব আপনার বিরুদ্ধে যে যত কথা বলছে, বলতে দিন। আপনি যত উপেক্ষা করবেন, চুপ থাকবেন ও ধৈর্য ধরবেন, অপপ্রচার তত ঝুলে যাবে। সবসময় মনে রাখবেন, একহাতে তালি বাজে না। আপনি হাতটা বাড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত অপপ্রচারের কোনো প্রভাব নেই। সাধারণ মানুষ প্রথম ভুল করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে, প্রতিবাদ করতে গিয়ে। এটা করেই সে অপপ্রচারের গতিটা আরো বাড়িয়ে দেয় এবং নিজের ক্ষতি করে।

কোয়ান্টামে আমরা কখনো এ ধরনের কোনো কথার জবাব দেই নি। শুধু নীরবে মানুষের কল্যাণে নিজেদের কাজ করে গেছি। সবসময় মনে রাখবেন, যার অন্তরে কালিমা নেই, পাপ নেই, কলঙ্ক কখনো তাকে স্পর্শ করে না। এই

কথাটি মহামতি বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগে বলে গেছেন। আপনি নবী-রসুল, অলি-বুজুর্গ, মহামানবদের জীবন দেখুন। তারা কখনো অপবাদে বিচলিত হন নি, এসব নিয়ে মাথা ঘামান নি। তারা তাদের কাজ করে গেছেন। কারণ সত্য সবসময় সত্য। সত্যকে বেশিক্ষণ মিথ্যা দিয়ে চাপা দেয়া যায় না। আপনি যত চুপ থাকবেন, মিথ্যা তত তার শক্তি হারাবে।

প্রশ্ন : পরিচিত একজনকে তার পরিবার বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তার স্বামী তাকে অনেক নির্যাতন করত। তাই তাদের ডিভোর্স হয়ে যায়। বর্তমানে প্রাক্তন স্বামী তাকে আবার বিয়ে করতে চাচ্ছে। তার পরিবারও তাকে ফিরে যেতে জোর করছে। কারণ সে ধনাঢ্য ও তথাকথিত ভদ্রলোক। মহিলা জানতে চাচ্ছেন সেই সংসারে ফিরে যেতে হলে তাকে অন্য কাউকে হিল্লা বিয়ে করে তালাক নিয়ে প্রথমজনকে আবার বিয়ে করতে হবে কিনা। মহিলা চাকরি করে পরিবারের ভরণপোষণ করেন, ভাইবোনের পড়ার খরচ দেন। কিন্তু প্রাক্তন স্বামী মহিলাকে শর্ত দিচ্ছে যে, বিয়ের পর পরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখতে পারবে না। অফিস এবং বাসা ছাড়া মহিলাকে আর কোথাও যেতে দেবেন না। এত শর্ত সত্ত্বেও তার পরিবার জোর করছে সেই লোকের সাথে সংসার করতে। কারণ হিসেবে বলছে দরিদ্র মেয়েদের বিয়ে ভেঙে গেলে বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ তাকে বিয়ে করবে না। অনুগ্রহ করে কিছু বললে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : এখানে অনেকগুলো বিষয়। প্রথমত, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কারণে ডিভোর্স হয়েছে। এখন আবার প্রাক্তন স্বামী তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে এবং শর্ত হচ্ছে যে, বিয়ের পরে মেয়ের পরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ থাকতে পারবে না, শুধু অফিস এবং বাসা ছাড়া আর কোথাও যেতে পারবে না। কত জঘন্য এবং অমানবিক প্রস্তাব! অফিসে কেন যেতে দেবে? নিশ্চয়ই টাকার জন্যে। এত যদি ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়, তো স্ত্রীকে অফিসে পাঠানোর দরকারটা কী? এরা জঘন্য চরিত্রের মানুষ। যে পুরুষ এরকম প্রস্তাব দেয় সে-তো একটা অমানুষ। আর যে মহিলার পরিবার এত অমানবিক শর্তে রাজি হয়ে থাকে, তাদের কী বলা উচিত? ঊনমানুষ?

এরকম জঘন্য শর্তে কি কোনো বিয়ে হয়? বিয়ে আর দাসী কেনা তো এক নয়। আর দাস কেনাবেচার প্রথাও নেই এখন। আগে দাস-দাসী বিক্রি করলে তবুও পয়সা পাওয়া যেত। এই পরিবার তো মেয়েটিকে কোনোকিছু ছাড়া বিক্রি করে দিতে চাচ্ছে। এটা কোনো বিয়ে হলো?

বিয়ে খুব পবিত্র একটা সম্পর্ক। এটা সম্মানের সম্পর্ক, ভালবাসার সম্পর্ক। দুটো পরিবারের মধ্যে সম্মানজনকভাবে বিয়ে হবে। অমানবিকতার জীবন কখনোই জীবন নয়। আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, একজন মানুষের আত্মসম্মানবোধ থাকা উচিত। আত্মসম্মানবোধ যার থাকে না, তিনি নারী হোন অথবা পুরুষ, তিনি কি আসলে মনুষ্য পদবাচ্য? আত্মসম্মানবোধ আছে এমন মানুষের এরকম অমানবিক প্রস্তাবে রাজি হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : স্বামী আমাকে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়েছেন। আমার শাশুড়ি নিজ হাতে সংসারটা ভেঙে দিচ্ছেন। আমার দুই বছরের সংসারের কি কোনো মূল্য নেই? সবই কি মিথ্যা? স্বামীর ওপর কি আমার কোনো অধিকার নেই? একটা কাগজ পাঠালেই কি সব শেষ হয়ে যায়? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কি তবে ভিত্তিহীন? আমার অন্যায় আমি শুধরে নেব। সেই সুযোগ তো আমাকে দিতে হবে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে শাশুড়ি মাকে আমি কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। কারণ তিনি আমাকে মানসিক নির্যাতন করতেন। অতিষ্ঠ হয়ে শাশুড়িকে বাসায় আসতে দিতে চাই নি। রাগের সময় আমি স্বামীকে যা বলেছিলাম, এখন সেগুলোর রেকর্ড সবাইকে দেখাচ্ছেন। আমাকে তারা ক্ষমা করছেন না। সংসার কি ছেলেখেলা যে, আজ একটা বিয়ে করব তো কাল আরেকটা? এখানে দুটো জীবনের এবং দুটো পরিবারের সম্মান জড়িত। মায়ের জন্যে বউকে ছেড়ে দেয়ার নিয়ম কোথাও আছে কি? আমি কোনোভাবেই ডিভোর্স চাই না। আমি অনুতপ্ত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। সংসারে ভুল হয়, আবার সেটা মিটেও যায়। আমার মা হলে কি আমি তাকে ফেলে দিতাম? আমার ভুলটা দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছি। আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আমার শাশুড়ি এবং স্বামীও যেন ক্ষমা করে আমাকে বুকে টেনে নেন। ডিভোর্স তুলে নিয়ে সম্মানের সাথে আমাকে সংসারে ফিরিয়ে নেন। বাকিটা জীবন শাশুড়ির সেবা করে আমার ভুলটাকে শোধরাতে চাই। দোয়া করবেন গুরুজী।

উত্তর : আমরা সবসময় ঘর রাখার পক্ষে, ভাঙার পক্ষে না। নবীজী (স) বলেন, 'আল্লাহর কাছে বৈধ বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হচ্ছে তালাক' [আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা); *আবু দাউদ; হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী : ৯০৮*]। কিন্তু সমস্যাটা হয়ে যায় তখনই, যখন আমরা আমাদের আবেগটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।

মনে রাখতে হবে যে, আমাদের আচরণ এবং কথার একটা বর্ডারলাইন থাকতে হবে, যেখান থেকে ফিরে আসা যায়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মানে এই না

যে, কথারও ব্যালেন্স থাকবে না। কিন্তু অনেক সময় অনেকে এমন এক্সট্রিম কথাবার্তা বলে ফেলে, যেখান থেকে অপরপক্ষ আর ফিরে আসতে চায় না। রাগের মাথায় এতটা দুর্ব্যবহার কেন করবেন যেটার জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে? তা-ও এমন পর্যায়ে যে, ক্ষমা চেয়েও ক্ষমা পাওয়া যাচ্ছে না? খারাপ আচরণ এত বেশি হয়েছে যে, অনুশোচনা করেও কাজ হচ্ছে না। অপরপক্ষ কতটা বিরক্ত হলে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়!

আপনার ভুল আচরণে কেউ কষ্ট পেলে তা বুমেরাং হয়ে আপনার দিকেই ফিরে আসবে। তাই ভুল করে ফেললে ক্ষমা চাইতে হয় কোনোরকম দেরি না করে। মানে অনুশোচনা করবেন সাথে সাথে যে, আমি তো ভুল করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন। তাহলে অন্তত সম্পর্কটা একেবারে নষ্ট করার সিদ্ধান্ত না নিয়ে তারা হয়তো ক্ষমাও করে দিতে পারেন।

অনেক সময় রাগ ঠান্ডা হতেও কয়েকদিন লাগে। এই রাগটা সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং এটা শয়তানের অস্ত্র। আমরা যেন সবসময় রাগ থেকে দূরে থাকি। একজন সহনশীল সমমর্মী ভালো মানুষের কাছে তো তার নিজের কষ্টের চেয়ে অন্যের কষ্টটা বেশি মনে হওয়া উচিত। একজন সমর্পিত ভালো মানুষের বিশেষত্ব এটা। কেন দুর্ব্যবহার করে অন্যকে কষ্ট দেবেন?

আমাদের অনেকেই বাইরে ইতিবাচক থাকি, কিন্তু যেখানে আমাদের ইতিবাচক থাকা এবং সবর করাটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেখানে আমরা রাগের প্রকাশ ঘটাই। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সবসময় সচেতন থাকতে হবে, সতর্ক থাকতে হবে। রাগের মাথায় এমন কিছু বলা যাবে না, যেটার জন্যে পরে অনুশোচনা করতে হয়, ক্ষমা চাইতে হয়। এটা বলার কারণ হচ্ছে যে, কেউ যেন কখনো এমন কাজ না করে।

আপনি দেরিতে হলেও ভুল বুঝতে পারছেন; আমরা আপনার প্রতি সমব্যথী। দোয়া করি—আপনাদের এই ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যাক, পরস্পরকে ক্ষমা করে নতুনভাবে সুন্দর জীবন যেন শুরু করতে পারেন।

প্রশ্ন : আড়াই বছর আগে আমার ডিভোর্স হয়ে যায়। নিজেকে অনেক শুধরে নিয়েও আমি সংসার টেকাতে পারি নি। ভীষণ সংকটময় সেই সময়ে আমাকে নতুনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখায় কোয়ান্টাম। কঠোর সংগ্রাম করে আমি এখন মর্যাদাপূর্ণ একটি জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কয়েক মাস পর পিএইচডি শুরু করব। এমন সময় আমার অতীত জীবনের কালো অধ্যায়গুলো আবার আমার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে চাইছে। ভয় হয় যদি তা আবারও আমার জীবনে ঝড় তোলে, যদি মা-বাবাও তাদের মনে স্থান না দেন,

পরিবার-পরিজনও যদি হারাতে হয়, তখন আমি কীভাবে বেঁচে থাকব? পরিবার যে আমার শেষ আশ্রয়স্থল। কেমন করে অতীত ঘটনাগুলো থেকে মুক্তি পাব? ভুলতে চাইলেও সমাজ আমাকে ভুলতে দেয় না কেন?

উত্তর : ডিভোর্স নিয়ে কখনো হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না। মনে করবেন যে, এই সংসার কপালে ছিল না বলেই তাদের ক্ষমা পাই নি। আসলে যে-কারো জীবনে ভুল হতেই পারে। যখন কেউ আন্তরিক অনুশোচনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কারণ কেউ ভুল করার পর সেটা নিয়ে অনুশোচনা করলে এবং সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করলে, সেটাই আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট।

তবে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া গেলেও অনেক সময় মানুষের ক্ষমা অত সহজে পাওয়া যায় না। সেটা নিয়ে আফসোসেরও কিছু নেই। কারণ অতীত নিয়ে নয়, বাঁচতে হয় বর্তমান নিয়ে। তাতে যদি মা-বাবা, পরিবার-পরিজনকে সমব্যথী হিসেবে পাওয়া যায়, তারা যদি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে আপনার সহযোগী হতে পারে, তাহলে খুব ভালো। অন্যথায় বাঁচতে হবে বর্তমানে, নিজের কাজের মধ্য দিয়ে। বাঁচতে হবে আত্মপরিচয়ে।

আসলে পরিবার নয়, বংশ পরিচয় নয়, সমাজের সবার আপাত প্রশংসা বা স্বীকৃতি নয়; মহান কাজই মানুষকে অমর করে, শ্রদ্ধেয় করে। অতএব আপনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভবিষ্যৎ। এটা নির্ধারিত হবে আপনি মেধাকে কতটা বিশ্বাসের সাথে কাজে লাগালেন তার ওপর। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন করুন। কোয়ান্টামে একাত্ম থাকুন। সাদাকায়নে আসুন। সৃষ্টির সেবায় কাজ করলে আপনার সমস্ত দুঃখ-গ্লানি ভেসে যাবে।

বিবিধ

প্রশ্ন : বিয়ের পর একটি ছেলে তার মা-বাবার সাথেই থাকছে। অথচ কনেকে তার মা-বাবা থেকে পৃথক থাকতে হয়। এটা কি ন্যায়সঙ্গত?

উত্তর : বিয়ের পর হয় ছেলেকে মেয়ের বাসায় থাকতে হবে, নয়তো মেয়েকে ছেলের বাসায় থাকতে হবে। মেয়ের বাসায় যদি ছেলে থাকে, তাহলে ছেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব মেয়েকে নিতে হবে। ছেলেকে তখন হতে হবে ঘরজামাই। আমাদের সমাজে একটি ছেলে একটি মেয়েকে বিয়ে করছে তার

ভরণপোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে। এজন্যে বিয়ের পর ছেলের বাড়িতে মেয়েকে যেতে হচ্ছে।

আবার দেখুন, মাতৃতান্ত্রিক সমাজে উল্টো নিয়ম। সেখানে বিয়ের পর ছেলেরা মেয়ের বাড়ি যায়। কারণ ছেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব মেয়ের। অর্থাৎ যে সমাজে যে রেওয়াজ সেভাবেই যাওয়া-আসা হয়।

প্রশ্ন : পরিবারেই যেখানে ঐক্য ঘটানো এত কঠিন, পরিবারের বাইরে সেটা তো আরো দুরূহ। বাস্তব জীবনে চেতনার মিল কি সত্যিই সম্ভব?

উত্তর : বাস্তব জীবনেই তো চেতনার মিল হবে, কল্পনায় বা স্বপ্নে তো হবে না। আর বাস্তব জীবনে যদি সম্ভব না হতো, তাহলে আমরা এত মানুষ এই ফাউন্ডেশনে সমবেত হলাম কীভাবে? আসলে চেতনার মিল মানে কিন্তু এই নয় যে, আরেকজন আমার সব কথাই মেনে নেবে, তার সাথে আমার ১০০% মিল হবে। চেতনার মিল মানে লক্ষ্যের মিল, আদর্শের মিল এবং জীবনের মৌলিক বিষয়গুলোতে দৃষ্টিভঙ্গির মিল। কিন্তু ছোটখাটো ব্যাপারে পার্থক্য থাকবেই এবং সেজন্যে কিছু ছাড় দিতে হবে, কিছু মেনে নিতে হবে। অর্থাৎ মিল যদি ৬০ ভাগ ক্ষেত্রে হয় আর ৪০ ভাগ ক্ষেত্রে মতভেদ থাকে, তাহলে সেটা একটা প্রাণবন্ত, গতিশীল, স্বাভাবিক সম্পর্ক।

প্রশ্ন : কোনো মেয়ের যদি বিয়ের ইচ্ছা থাকে এবং সে যদি মাস্টার্স পাশ করেও তেমন কোনো চাকরি না পায়, সে পরিবারে বাবা না থাকলে, ভাইয়েরা গুরুত্ব না দিলে, বিয়ের কোনো প্রস্তাব না এলে তার কী করণীয়? মেয়ের বয়সও তো বেড়ে যাচ্ছে।

উত্তর : এ-ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে মনছবি দেখা। আর যে-সব বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে তাদেরকে দিয়ে যাকে পছন্দ, তার খোঁজখবর নেয়াতে পারেন। বিয়ের ইচ্ছা থাকলে এ-ক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে হবে।

প্রশ্ন : আমার পরিচিত এক ভদ্রমহিলার ১৭/১৮ বছরের মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করে এক সন্তানের মা হয়েছে। সন্তানের বয়স দুই বছর। এই বিয়ে অসমভাবে হয়েছে। মেয়েটির মা বার বার আমাকে অনুরোধ করে, আমি যেন মেডিটেশন করে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। বিবাহিত মেয়ে এবং মায়ের জন্যে কী প্রার্থনা করব?

উত্তর : এই মায়ের জন্যে একটাই প্রার্থনা করবেন, তিনি যেন তার এ সন্তান-আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। কারণ ১৭/১৮ বছরের মেয়ে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে, সন্তানের মা হয়েছে। এখন সেই মেয়েকে কেন ফিরিয়ে আনতে হবে? মেয়ে তার জীবনকে বেছে নিয়েছে। সে যদি ভালো থাকে, আপনি তাকে কেন নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন?

আর এ-ক্ষেত্রে আপনার তো মেডিটেশনের শক্তি প্রয়োগ করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মেয়ে আসবে না যাবে, এটা নিয়ে চিন্তা না করে আপনি বরং দোয়া করবেন, যেন তারা ভালো থাকে এবং যা তাদের জন্যে মঙ্গলজনক, তা-ই যেন হয়।

প্রশ্ন : উপহার দেয়ার সামর্থ্য নেই বলে নানা অজুহাত দেখিয়ে দাওয়াতে যাচ্ছি না। উপহার না দিলে সমাজ ভালো মনে করে না। কী করা উচিত?

উত্তর : এই যে সামাজিক উপহার, এই প্রথা বর্জন করা উচিত। আমরা কিন্তু এখন বিয়েতে কোনো উপহার দেই না এবং কোনো উপহার প্রত্যাশাও করি না। কোয়ান্টাম সদস্যরা বিভিন্ন বিয়ের অনুষ্ঠানে যান কোনোরকম উপহার না নিয়ে। অতএব বিয়ের অনুষ্ঠানে যান, তৃপ্তিসহকারে খান, প্রাণভরে দোয়া করে আনন্দিতচিত্তে ফিরে আসুন।

বিয়ের অনুষ্ঠানে উপহার—এটা গজব ছাড়া আর কিছু না। এই উপহারগুলো কোনো কাজে আসে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলো বন্ধ অবস্থাতেই থাকে। সেগুলো আবার অন্য কারো বিয়েতে দেয়া হয়। এটা একটা সামাজিক অপচয়, যার আসলে কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা সব ধরনের সামাজিক অপচয়, সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে। আমরা এই অবস্থার পরিবর্তন চাই।

অতএব আপনারা নিজেরা বিয়ের অনুষ্ঠানে গিফট নিয়ে যাবেন না। আর নিজেদের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আগেই বলে দেবেন যে, ভাই, গিফট আনার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা গিফট দেইও না, গিফট নিইও না। আসলে এই গিফট কিনতে গিয়ে অনেক সময় আত্মীয়স্বজনের যে দুর্দশা হয়, সেটা ভাবা হয় না। দেখলে কষ্ট হয়। অথচ কী আশ্চর্য! গিফট নেয়ার জন্যে আলাদা টেবিল থাকে, সেখানে আবার লিখে রাখা হয় কে কে গিফট দিয়েছে। ওটা যখন খোলা হয়, তখন এগুলো নিয়ে আবার কথা হয়—দেয়া উচিত ছিল সোনার চেইন, দিয়েছে কাচের মগ। এটা লিখে রাখো। ওর মেয়ের বিয়েতেও কাচের মগ দেবো।

গিফট হচ্ছে আপনার ইচ্ছা হলে আপনার মাকে, বাবাকে, স্বামী/ স্ত্রী, সন্তান, ভাইবোনকে বন্ধুকে আপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু দিচ্ছেন। সেটা আলাদা বিষয়। সেটা হচ্ছে উপহার। উপহারকে রসুলুল্লাহ (স) খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু এখন যে সামাজিক উপহার দেয়ার বাধ্যবাধকতা এটা সামাজিক অনাচার ছাড়া আর কিছু না।

প্রশ্ন : আমি একটা মেয়েকে আট বছর ধরে ভালবাসি। আমার মা-বাবা তাকে পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দ করছে না। কারণ মেয়েটির গায়ের রং কালো। যদিও সে শিক্ষিত। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান। আমি মেয়েটিকে ছাড়তে পারি না এবং মা-বাবার অবাধ্যও হতে পারি না। এখন কী করব?

উত্তর : একমাত্র ছেলে আপনি। সমাজে যাকে বলে বংশের চেরাগ। আপনি যা বলবেন, মা-বাবা তো তা-ই করবেন—শুধু একটু কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। যদি এটাই হয় যে, শুধু গায়ের রঙের কারণেই পছন্দ করছেন না, তাহলে তো দৃষ্টিভঙ্গির গ্যাপ। আরে, কালো তো জগতের আলো! ব্ল্যাক ডায়মন্ডের দাম হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি।

আট বছর পরে যদি বলেন মা-বাবা রাজি হয় না, এটা ঠিক নয়। আপনার আগেই বোঝা উচিত ছিল। যা হওয়ার হয়েছে। আমি মনে করি, মা-বাবাকে বোঝানো তেমন কঠিন কিছু নয়। একমাত্র ছেলে হওয়ায় মা-বাবার কাছ থেকে কিছু আদায় করা তো সহজ। মা-বাবার পা ধরে বসে থাকুন। কারণ বিয়ে মা-বাবার সম্মতিতেই হওয়া উচিত।

সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে আজকালকার ছেলেমেয়েদের সুবিধা তো অনেক। আগে এত সুবিধা ছিল না। কারণ অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। একটা মারা গেলেও আরো তো পাঁচ-সাতটা থাকে। এখনকার মা-বাবাদের এভাবে বলার কোনো উপায় নেই। অতএব মা-বাবাকে সম্মত করিয়ে বিয়ে করবেন।

প্রশ্ন : আমি ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী। সেকেন্ড ইয়ারের এক ছাত্র জানিয়েছিল, সে আমাকে অনেক পছন্দ করে। সে এটাও বলেছে, তার ভাই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। তাই তার ওপর অনেক দায়িত্ব। তার প্রতিষ্ঠিত হতে দেরি হবে। সেজন্যে আমার সাথে সে কোনো প্রেমের সম্পর্কে জড়াবে না। যদিও আমি তাকে পছন্দ করতাম, কিন্তু ভেবেছিলাম প্রেম না হওয়া ভালো। এদিকে মা-বাবা আমার জন্যে পাত্র দেখছেন। অথচ ছেলেটির কথা আমার খুব মনে পড়ছে। আমি কি তাকে জানাব যে, আমিও তাকে পছন্দ করি?

উত্তর : এ-ক্ষেত্রে আবেগকে প্রশ্রয় দেবেন না। বিয়ে মানে কিন্তু শুধু প্রেম নয়, রোমান্টিকতা নয়। বাস্তব বিয়ে তো সিনেমার বিয়ের মতো নয়। এখন আরেক জায়গায় পাত্র দেখছে বলে তার কথা মনে পড়ছে—এই দোটানার মধ্যে থাকবেন না। বিয়েটা নিছক পছন্দের ব্যাপার নয়, এটা দায়িত্ব।

অতএব গুরুত্বের সাথে চিন্তা করবেন, আপনি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন কিনা, যেহেতু তার এক ভাই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। কিন্তু দোদুল্যমানতায় থাকবেন না। পছন্দ করার কথা এতদিন বলেন নি, এখন হঠাৎ করে পছন্দ করি বলতে গেলে আপনার জন্যেই ঝামেলা বাড়বে। আর ছেলের বয়স যেহেতু আপনার চেয়ে কম, ঝামেলা একটু বেশিই হবে। অতএব বাস্তবতার আলোকে সিদ্ধান্ত নিন।

প্রশ্ন : আমি গত বছর বিয়ে করি, কিন্তু পরিবারে জানাই নি এবং সংসারও শুরু করি নি। কারণ আমি এখনো ছাত্র, মাস্টার্স করছি, চাকরি পাই নি। আমার কি এখন সংসার শুরু করা উচিত?

উত্তর : আপনার সাহসিকতার প্রশংসা করি। আজকাল তো অধিকাংশ ছেলে দায়িত্ব নিতে চায় না। শুধু ঘুরে বেড়াতে চায়। আপনি যে দায়িত্ব নিয়েছেন, বিয়ে করে একজন নারীকে সম্মানিত করেছেন, এজন্যে আমাদের দোয়া থাকছে। আল্লাহকে বলুন—এখন সংসার শুরু করতে চাই। তুমি রিজিকের ব্যবস্থা করো। ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে পরিবারকে না জানিয়ে বিয়ে করা মানে পরিবারের দোয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

প্রশ্ন : ম্যারেজ মিডিয়া নাম নিবন্ধনেই ৮০০০+ চাচ্ছে। তাদের কাছে অনেক পাত্রের প্রোফাইল আছে। টাকা দিলে তারা আমাকে খবর দেবে। আমার কী করা উচিত বুঝতে পারছি না। মিডিয়া সেন্টারগুলো কি নির্ভরযোগ্য?

উত্তর : আমরা দোয়া করি যেন আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আসলে ম্যারেজ মিডিয়া একটা ব্যবসা। এ-ক্ষেত্রে ভুল তথ্যের ব্যাপারে আপনাকে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। মিডিয়া সেন্টার হোক অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব আসুক, সবসময় ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নেয়া উচিত।

প্রশ্ন : সঙ্গত কারণে বিয়ের কথা পাকাপাকি অবস্থায় বিয়ে ভেঙে দেই। আমি জানি, বিয়েটা আমার জন্যে ভালো হতো না। কিন্তু ছেলেটিকে ভুলতে আমার

প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। পাঁচ বছরের সম্পর্ক ছিল তার সাথে। পরিবার অন্যত্র বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছে। কিন্তু অন্য কাউকে মেনেও নিতে পারছি না। আমার জন্যে দোয়া করবেন। করণীয় জানাবেন।

উত্তর : করণীয় খুব সহজ। চেতনার সাথে মিল নেই এমন কারো সাথে বিয়ে আসলেই কষ্টকর। আর ভুলে যাওয়াটা শুধু সময়ের ব্যাপার। একসময় এমনিই ভুলে যাবেন। মেয়েদের ভুলতে একটু বেশি সময় লাগে। কারণ মেয়েরা বিয়েটাকেই তাদের জীবন মনে করে। আর ছেলেদের কাছে বিয়েটা হলো জীবনের আনন্দ। তাই ছেলেরা সহজে ভুলতে পারে। সেই সময় মনে হয় যে, তাহাকে না পাইলে বাঁচিব না। কিছুদিন পরে ভুলে যায়।

এটা হচ্ছে বাস্তবতা। কারো জন্যে পৃথিবী থেমে থাকে না এবং কারো জন্যে কারো জীবন থেমে থাকে না। এটা ভালো হয়েছে, আপনি বিয়ের আগেই বুঝতে পেরেছেন যে, বিয়েটা আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হতো না। এজন্যে আপনি শুকরিয়া আদায় করুন এবং নতুনভাবে জীবন শুরু করুন। আমাদের সবার দোয়া থাকবে।

প্রশ্ন : নতুন বিয়ে করেছি। বিয়ের কথা মা ছাড়া পরিবারের অন্য সদস্যরা জানে না। আমরা দুজন মাস্টার্স শেষ করেছি। চাকরি নেই। টিউশনি করে চলি। চাকরি ছাড়া বিয়ে বাসা থেকে মেনে নিতে চায় না। এখন এই বিয়ের কথা কি পরিবারের সবাইকে জানাব? বাসা নিয়ে একসাথে থাকি অথচ ভাই প্রশ্ন করলে বলি, বান্ধবীর সাথে। গুরুজী, এই অবস্থা থেকে মুক্তি চাই।

উত্তর : বিয়ে যখন করে ফেলতে পেরেছেন, তো এটা বলতে দোষ কোথায়? আপনি কেন মিথ্যা বলবেন? বলুন, আমি বিয়ে করেছি, স্বামীর সাথে থাকি। ভয়ে তোমাদের বলতে পারি নি। এখন ভুল করলেও করেছি, ঠিক করলেও করেছি, করে তো ফেলেছি। ভাইকে মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই। বিনয়ের সাথে সত্য বলুন।

মনে রাখবেন, বিয়েটা সবসময় পারিবারিকভাবে হওয়া উচিত। দুজনে করে ফেললে পারিবারিক সমর্থন পাওয়াটা খুব কঠিন। শ্বশুরবাড়িতে সেই মর্যাদা পাবেন না—না ছেলে না মেয়ে। কিন্তু যেহেতু বিয়ে করে ফেলেছেন, তার সাথে থাকছেন। অতএব এই সহজ সত্যটাকে যত দ্রুত বলতে পারেন তত ভালো। কারণ যখন একজন মানুষ মিথ্যা বলে, তখন সে তার ভেতরের শক্তিটাকে হারিয়ে ফেলে। তার মেরুদণ্ডটা আর সোজা থাকে না।

প্রশ্ন : জন্মদিনে রক্তদান করতে ও মৃত্যুবার্ষিকীতে মৃত ব্যক্তির নামে কোরআনের মর্মবাণী বিতরণ করতে কোয়ান্টাম উদ্বুদ্ধ করে। পারিবারিক জীবনে বিয়ের দিনটিও আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিবাহবার্ষিকীতে আমরা কী কী ভালো কাজ করতে পারি?

উত্তর : বিবাহবার্ষিকীতেও আপনি *আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী* এবং *হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী* বিতরণ করতে পারেন। এ-ছাড়া রক্তদানও করতে পারেন। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. আহমদ মরতুজা চৌধুরী এবং তার স্ত্রী অধ্যাপক হাসনে আরা বেগম বিবাহবার্ষিকীর দিনটিতে কোয়ান্টাম ল্যাবে এসে একসাথে রক্তদান করেছেন। এখানে তারা ৩৯ বার রক্তদান করার পর বয়সের কারণে আর দিতে পারেন নি। এভাবে মানুষের কল্যাণে যত কাজ করতে পারেন, নিজেদের জন্যে সেটা তত কল্যাণকর।

বোঝা যাচ্ছে, আপনি সংসারে খুব সুখী। আল্লাহ যেন এই সুখ ইহকাল-পরকাল সবকালে স্থায়ী করেন, এই নিয়তে মর্মবাণী বিতরণ করুন। শুধু নিজের বিবাহবার্ষিকীতে নয়, মা-বাবার বিবাহবার্ষিকীতেও আপনি মর্মবাণী বিতরণ করতে পারেন। কারণ মা-বাবার মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হলে তা সন্তানদের জন্যে অনেক কষ্টের। অর্থাৎ আপনি যে ধর্মেরই হোন, যে-কোনো কাজে আপনি আপনার পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বিতরণ করুন। এর চেয়ে ভালো কাজ তো আর হতে পারে না।

প্রশ্ন : পুরুষরা চারটা বিয়ে করতে পারলে মহিলারা কেন পারবে না?

উত্তর : মহাভারতে দ্রৌপদী পঞ্চস্বামী পেয়ে বড় বিপদে ছিলেন। আর কোনো মহিলা চার স্বামী একসাথে পেতে চান আজ পর্যন্ত এরকম শোনা যায় নি। এখন চারটা বিয়ে করতে চায় এরকম পুরুষ পাওয়াও খুব দুর্লভ। এক স্ত্রীকে সামলাতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা। কোরআনেও যখন চারটি বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে, ... তবে যদি আশঙ্কা হয় যে, একাধিক স্ত্রীর সাথে তোমরা ‘ইনসাফ’পূর্ণ আচরণ করতে পারবে না, তাহলে একজনকে বা অধিকারভুক্ত দাসীকে বিয়ে করাই যথেষ্ট। সম্ভবত এ পন্থায় তোমরা পক্ষপাতিত্ব করার অপরাধ থেকে রক্ষা পাবে (সূরা নিসা, আয়াত : ৩)।

অর্থাৎ চার বিয়ে করা গেলেও ইসলাম একে প্রকারান্তরে নিরুৎসাহিত করেছে। আর পুরুষদের আবেগ অপেক্ষাকৃত কম। আবেগপ্রবণ কোনো নারী যদি চার স্বামীর পাল্লায় পড়েন, তার অবস্থা যে কী হবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন : বিয়ে করা কি ফরজ, ওয়াজিব, না সুন্নত? বিয়ে না করলে সে কি নবীজীর (স) উম্মত নয়? সে কি বেহেশতে যাবে না?

উত্তর : আসলে বিয়ে করা ফরজও না, ওয়াজিবও না। বিয়ে করা হচ্ছে সুন্নত। সুন্নত পালন করলে পুণ্য আছে, কিন্তু বেহেশতে কে যাবে আর কে যাবে না—এটা কারো পক্ষে বলা সম্ভব না। এটা আল্লাহর ইচ্ছা। আমরা বলতে পারি যে, নবীজীর (স) উম্মত হওয়ার জন্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'—বাক্যটা বলা এবং এটাকে বিশ্বাস করা, সে অনুসারে ভালো কাজ করা ও মন্দ থেকে বিরত থাকা হচ্ছে অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন : আমার বিয়ের ১৫ বছর পর আমি জানতে পারলাম যে, আমাকে সে প্রতারণা করে বিয়ে করেছে এবং আগের স্ত্রীর সাথে ডিভোর্স হওয়ার পরও সম্পর্ক রাখছে। আমি তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সন্তানদের কথা চিন্তা করে যদিও-বা মেনে নিয়েছি, তবে তাকে মন থেকে মাফ করতে পারছি না। তার পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করেও পারছি না। কারণ এত বড় অন্যায়ের পরও তারা তার ছেলের কোনো সমস্যা বা দোষ দেখে না। এখন আমি কী করব?

উত্তর : বাস্তবতা হচ্ছে, ছেলের পরিবার আপনার প্রতি সমব্যথী হবে না। সমব্যথী হবে ছেলের প্রতি। এটা হচ্ছে নির্মম সত্য। কারণ আমাদের পরিবারগুলোতে আদর্শিক চেতনার চেয়ে রক্তের সম্পর্কটা বেশি গুরুত্ব পায়।

২০০৪ সালে সাভারে রাহেলা নামের গার্মেন্টস কর্মীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। তাকে ছুরিকাঘাত করে স্পাইনাল কর্ড কেটে মৃত মনে করে জাহাঙ্গীরনগরে একটা ঝোপে ফেলে দিয়েছিল। দুই দিন পরে অপরাধীরা গিয়ে দেখে যে, এত রক্তক্ষরণের পরও সে বেঁচে আছে। তখন আবার দাহ্য পদার্থ ঢেলে তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় দিন যখন তাকে উদ্ধার করা হয়, সে কিন্তু ধর্ষকদের নাম বলেছে।

এত বছর পার হলো, ধর্ষকরা কি ধরা পড়েছে? প্রথম প্রটেকশন পেয়েছে কার কাছে? তার মায়ের কাছ থেকেই। তার মা-ই হয়তো লুকিয়ে রেখে তাকে খাবার পাঠিয়েছে। কেন? আমার ছেলে তো! আজ পর্যন্ত পুলিশ তাকে ধরতে পারে নি। অথবা ধরে নি। মা-বাবা তাদের অপরাধী ছেলেকে প্রটেকশন কেন দিয়েছে? কারণ আমাদের কাছে রক্তের সম্পর্ক অন্য সবকিছুর চেয়ে এখনো অনেক বেশি শক্তিশালী।

যদি চেতনা শক্তিশালী হতো, অপরাধী ছেলেকে মা নিজে শাস্তি দিতেন। তখন মা আর তাকে ছেলে হিসেবে মনে করতেন না, অপরাধী মনে করতেন। অন্যের ছেলে হলেই আমরা শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু নিজের ছেলেকে শাস্তি দিতে পারি না। কারণ আমাদের আদর্শিক চেতনা তত শক্তিশালী নয়।

আবার ওমরকে (রা) দেখুন, তার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো এবং অভিযোগে শাস্তি ছিল ৮০ দোররা। অর্ধেক দোররা মারার পরে ছেলে মারা গেল। হযরত ওমরের নির্দেশে কবরের ওপরে বাকি দোররা মারা হলো। রাতের বেলা কবরে গিয়ে কেঁদেছেন তিনি ছেলের জন্যে। কিন্তু শাস্তি থেকে রেহাই দেন নি। এটা হচ্ছে আদর্শিক চেতনা। আইন শুধু অন্যের জন্যে, নিজের আত্মীয়স্বজন অন্যায় করলে আইন নেই, তা নয়।

বাস্তবতা হচ্ছে, তার মা-বাবা ছেলের পক্ষেই থাকবে। ছেলের কলঙ্ক নিয়ে কবিতা আছে যে, ছেলের কালি হচ্ছে গঙ্গা জলের বালি। গঙ্গা জলে যে-রকম বালি ভেসে চলে যায়, ছেলের কলঙ্ক একইভাবে ভেসে যায়। কলঙ্ক তো মেয়েদের। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা এখনো সে-রকম। এজন্যে মেয়েদেরকেই এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

আর বিয়ের ১৫ বছর পর আজ আর আপনার করার কিছু নেই। অতএব যত ভুলে যেতে পারেন তত ভালো—যেহেতু আপনার সন্তান আছে। কে কী করল না করল সেটা আর দেখবেন না। সন্তানদের মানুষ করার চেষ্টা করুন। এর মধ্যেই আপনার কল্যাণ।

প্রশ্ন : লোকে বলে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে আল্লাহর হাতে। আসলেই কি এগুলো নির্ধারিত? তবে যে লোক স্ত্রীকে ঠকিয়ে অনেকগুলো বিবাহ করে সেগুলোও কি আল্লাহর হুকুমে? একজন যদি কোনো নারীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে যৌনসঙ্গী করে কিন্তু পরবর্তীকালে বিয়ে না করে, তবে পাপী কি শুধু ওই নারীই হবেন? সেই নারী তওবা করলে কি আল্লাহ মাফ করবেন?

উত্তর : এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট। এক হচ্ছে—জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে নির্ধারিত কিনা। জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারটা ভিন্ন। কিন্তু বিয়ে যদি নির্ধারিতই থাকত, তাহলে তো কোনো সমস্যা থাকত না। বিয়ে একটা প্রয়োজন, যা পূরণে উদ্যোগী হতে হয়। সময়মতো উদ্যোগ নেয়ার ওপরই নির্ভর করে সাফল্য।

আর কাউকে ঠকানো আল্লাহর হুকুমের খেলাফ। এটা শয়তানের কাজ। কোনো নারীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌনসঙ্গী করাটা অবশ্যই পাপের। সেটা পুরুষের জন্যে, নারীর জন্যেও। কিন্তু প্রশ্ন হলো, একজন নারী

কেন এ প্রলোভনে পড়বে! এর চেয়ে বড় বোকামি তো আর কিছু নেই! আসলে মহিলারা এই জায়গায় ভুল করে। কোনো নারীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে একজন পুরুষ অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু নারীকে তো সতর্ক হতে হবে। অর্থাৎ পুরুষটি নিশ্চয়ই অন্যায় করছে, কিন্তু অন্যায়ের শিকার যিনি হচ্ছে, সে-ও পুণ্য করছে না।

এসব ক্ষেত্রে কষ্টটা পুরুষের চেয়ে নারীরই বেশি হয়। অতএব কখনো এসব মিষ্টি কথায় ভুলবেন না যে, 'তোমাকে তো বিয়ে করবই'। কেউ এমনটা বললে তাকে বলুন, আগে বিয়ে করো। তারপরে আমি তোমার। বিয়ের আগে আমি তোমার হই কীভাবে? আজকাল পুরুষ বা নারী—কেউই সংযমী হতে পারছে না। এখন তো বিয়ের প্রতিশ্রুতিও লাগছে না। হোটেল বা রিসোর্টে রুম-ডেট এর নামে অবাধে মেলামেশা চলছে।

আর যে-কেউ ভুল বুঝতে পেরে তওবা করলে এবং অনুশোচনা করলে আল্লাহ যে-কোনো কিছু মাফ করতে পারেন। মাফ করার মালিক তো আল্লাহ।

প্রশ্ন : বিয়ের জন্যে কোনো মেয়ে অস্থির না হয়ে যদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে বেশি আগ্রহী থাকে, তখন তাকে শুনতে হয় যে, হয়তো তোমার কোনো ঘাটতির কারণে বিয়ে হচ্ছে না। এ-ক্ষেত্রে মেয়েটি কী জবাব দিতে পারে?

উত্তর : আপনি যদি অস্থির না হন, তাহলে কারো কিছু বলা, না-বলায় কিছু আসে-যায় না। এ-ক্ষেত্রে সমুচিত জবাব একটাই—জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করা। আর আপনি যদি বিয়েতে আগ্রহ না পান, তাহলে বিয়ে করা মানে হচ্ছে আরেকজনকে প্রতারিত করা।

প্রশ্ন : একটি বিয়ে একযুগেরও বেশি পার হওয়ার পরও যদি মন-মানসিকতার মিল না ঘটে, তাহলে সেই সংসার কি সমাজ ও সন্তানের জন্যে আমরণ টেনে নিয়ে যেতে হবে? এই দীর্ঘশ্বাসটা কি না-শুকরিয়া?

উত্তর : মন-মানসিকতার মিল অনেক সময় যুগ যুগ ধরে না-ও হতে পারে। আর কোথাও না কোথাও মিল আছে বলেই তো ১২ বছর একসাথে থাকতে পেরেছেন। যেটুকু মিল আছে, সেটার জন্যে শুকরিয়া আদায় করুন। বাকি আরো কিছু মিল বাড়ানো যায় কিনা সেই চিন্তা করুন। যত দীর্ঘশ্বাস ছাড়বেন, তত অমিল-অশান্তি বাড়তে থাকবে। যত শোকরগোজার হবেন, তত মনে হবে—এটুকু তো আছে, অনেকের তো এটুকুও নেই।

আপনি বলছেন যে, সমাজ এবং সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু করতে পারছেন না। আসলে বিষয়টি কিন্তু তা নয়। যে-কোনো কারণে হোক আপনি তাকে এখনো ভালবাসেন। আপনার যদি তার প্রতি ভালবাসা না থাকত, তাহলে সমাজ বা সন্তান আপনাকে আটকে রাখতে পারত না। আপনি অনেক আগে চলে যেতেন।

এজন্যে শোকরগোজারি করুন। আর ভালবাসাটা সবসময় দেয়ার নাম, পাওয়ার নাম না। এখন একতরফা ভালবাসা দিয়ে যেতে হবে। কারণ তার প্রতি যদি ভালবাসা না থাকত, তাহলে তো আপনার এই অভিযোগ থাকত না। অতএব যা আছে সেটার জন্যে সবসময় শুকরিয়া আদায় করবেন। নেতিবাচক হবেন না। নেতিবাচক জীবনদৃষ্টি নিজের জন্যে এবং চারপাশের মানুষের জন্যে ক্ষতিকর।

প্রশ্ন : সাত বছর হলো আমার বিয়ে হয়েছে। তিন বছরের এক পুত্র সন্তান আছে। কিন্তু আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ি পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করে নেয় নি। সাত বছর ধরে মনছবি দেখে যাচ্ছি। গুরুজী, আর কত অপেক্ষা করব?

উত্তর : এই চিন্তাটা তো করা উচিত ছিল বিয়ের আগে। চিন্তা আসলে সবাই করে। বুদ্ধিমান চিন্তা করে কাজ করার আগে আর আহাম্মক চিন্তা করে কাজ করার পরে। বিয়ে একটা সামাজিক সম্পর্ক। গোপনে একা একা প্রেম করা যায়, কিন্তু গোপনে দুজনে মিলে সংসার করা যায় না। কাউকে ভালো লাগতেই পারে, কিন্তু এটাই সব নয়। তার পরিবারের সাথে আপনার পরিবারের মিল হবে কিনা, পারস্পরিক গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু হবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে এরকম আহাজারি করতে হবে। এখন তো অপেক্ষা আর দোয়া করা ছাড়া আপনার কিছুই করার নেই।

প্রশ্ন : আমি ৩৩৫ ব্যাচের কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। কিন্তু মেডিটেশনে নিয়মিত নই। তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করার ফলে বর্তমানে স্ত্রীর সাথে বনিবনা হচ্ছে না। নিজের ভুলের কারণে আমার পছন্দের মেয়েকে হারিয়েছি। সেই অনুশোচনায় দুই বছর পরও স্বাভাবিক হতে পারছি না। কী করব?

উত্তর : যদি আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করতেন এবং প্রজ্ঞা জালালি-তে নিয়মিত অংশ নিতেন, তাহলে আজকের এই অনুশোচনা হয়তো করতে হতো না। তবে মনে রাখবেন—যা হারিয়ে গেছে, সেটা আপনার ছিল না। আপনি

মেয়েটিকে পছন্দ করতে পারেন, কিন্তু আপনার হলে তো সে আপনারই থাকত। অতএব যে চলে গেছে, সে অন্যের। আপনি যাকে পেয়েছেন, সে-ই আপনার। তাই তার সাথে বনিবনা করার চেষ্টা করুন।

বনিবনা হয় না নেতিবাচকতার কারণে। আপনি পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে বসে আছেন—আহারে! সে থাকলে কত না ভালো হতো! এসব অলীক চিন্তায় বর্তমানকে নষ্ট করবেন না। যাকে হারিয়েছেন, তার সাথে তো আপনি সংসার করেন নি। সে যে আপনাকে পেটাত না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। অতএব এই চিন্তা হারাম। কারণ আপনি এখন বিবাহিত।

যা হারিয়ে গেছে সেই চিন্তায় যদি এখনো অস্থির থাকেন, তাহলে আপনার মতো আহাম্মক দ্বিতীয়টা নেই। এখন যে আছে তাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। তার গুণগুলোর সমাদর করবেন। সে যাতে দোষগুলো শুধরে নিতে পারে, সেজন্যে দোয়া করবেন।

মনে রাখবেন—বনিবনা কখনো হয় না, বনিবনা করে নিতে হয়। এটা মায়ের হাতের মোয়া নয় যে, মা বানিয়ে দিলেন আর আপনি খেয়ে ফেললেন। বনিবনা বা অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্যে আপনাকে মাথা খাটাতে হবে, বুদ্ধি খরচ করতে হবে।

একধরনের পুরুষ আছে, যারা কর্তৃত্বপরায়ণ। তারা মনে করে, স্ত্রী সব কথায় হাঁ বলবে। কিন্তু সব কথায় হাঁ বললে কি সে স্ত্রী হলো? সব কথা মেনে নিলে বুঝতে হবে—সে স্ত্রী না, সে দাসী। কিছু কথায় আপনি হাঁ বলবেন, কিছু কথায় স্ত্রী হাঁ বলবেন। এটাই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। এই সম্পর্কে পারস্পরিক সম্মান থাকতে হবে, দায়িত্ববোধ থাকতে হবে, বিশ্বাস থাকতে হবে। এটাই অ্যাডজাস্টমেন্ট বা বনিবনা।

আর আপনার জন্যে বনিবনা করাটা অন্যদের চেয়ে সহজ। কারণ আপনি মেডিটেশন জানেন। আপনি নিয়মিত মেডিটেশন করুন এবং লামা কোয়ান্টায়নে অংশ নিন। মাথাটাকে ঠান্ডা করুন। স্থির হোন। ইনশাআল্লাহ আপনি সফল হবেন।

প্রশ্ন : আমার ভেতর লোকভয় খুব বেশি। এজন্যে সব ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে বিরত রাখি। এ-ছাড়া ভয়ের কারণে নেতিবাচকতা হীনম্মন্যতাও আমার মধ্যে কাজ করছে। ফলে আলোকিত মানুষ হওয়ার পথে নিজেকে এগিয়ে নিতে পারছি না। এই ভয় ও হীনম্মন্যতার কারণে আমার অনেক ক্ষতি হচ্ছে। এমনকি লোকভয়ের জন্যে বিয়ে করার সিদ্ধান্তও নিতে পারছি না। আপনার সদয় পরামর্শ কামনা করছি।

উত্তর : ভয় পাওয়ার কারণে সময়মতো যদি বিয়ে করার সিদ্ধান্তও নিতে না পারেন, তাহলে তো পরে পস্তাতে হবে। আসলে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই লোকভয় আমাদের জন্যে খুব ক্ষতিকর। এটাকে জয় করতে হবে। এখন থেকে আপনি সেটাই করবেন যেটা করা আপনার জন্যে যুক্তিযুক্ত, যেটা করা আপনার জন্যে প্রয়োজন। কে কী বলল, এটা গুরুত্বহীন। কারো কথা গায়ে মাখার তো কোনো প্রয়োজন আপনার নেই।

এই লোকভয়ের কারণে আমরা মানুষ থেকে বানর হয়ে যাচ্ছি। আমরা অনুকরণপ্রিয় হয়ে যাচ্ছি। আমরা নিজেদের মতো চলতে পারি না। এমনকি পোশাকও নিজের মতো পরতে পারি না। কেন পারবেন না? লোকভয় দূর করার জন্যে আপনি আপনার মতো চলবেন। প্রথম প্রথম আপনাকে দেখে অনেকে হয়তো হাসিঠাট্টাও করতে পারে। পরে একসময় আপনার দৃঢ়তার জন্যে আপনাকে সম্মান করবে।

দ্বিতীয়ত, মেডিটেশনে মনের বাড়িতে সব ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে যাবেন। সেই অনুষ্ঠানে কী হয় না হয়, এ ব্যাপারে আগে বাস্তবে খোঁজখবর নেবেন। সেখানে গিয়ে আপনি কী করবেন আগে থেকে পরিকল্পনা করবেন। তারপর মনের বাড়িতে দেখবেন, সে-ধরনের অনুষ্ঠানে আপনি যাচ্ছেন এবং খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবার সাথে মিশছেন।

মনের বাড়িতে সবসময় দেখবেন, আপনি সবাইকে হাসিমুখে আগে সালাম দিচ্ছেন এবং সবার সাথে কথা বলছেন। দেখুন তারাও আপনাকে সালাম দিচ্ছে, আপনার সাথে কথা বলছে। অর্থাৎ জড়তা ভাঙার যা-কিছু রিহার্সেল সব মনের বাড়িতে দিয়ে নেবেন। প্রতিদিন মনে মনে শতবার বলবেন 'আমি সাহসী'। যে কাজটা করতে ভয় পান, মনের বাড়িতে গিয়ে সাহসের সাথে সে কাজটা বার বার করবেন। দেখবেন, বাস্তবে আপনি তখন সেটা করতে পারছেন। কোনো জড়তা সংকোচ ভয় কিছুই থাকবে না।

আসলে লোকভয়ের কারণেই আমরা পিছিয়ে থাকি। কারো কোনো মন্তব্য নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই, যতক্ষণ আপনি সঠিক। আপনি তা-ই করবেন যা সত্য, যা কল্যাণকর, যা উপকারী। আত্মজাগরণ অডিও ট্র্যাকটি ৪০ দিন শুনবেন। ইনশাআল্লাহ এই জড়তা-সংকোচ আপনি কাটিয়ে উঠবেন এবং ভেতর থেকে আপনার সাহস সৃষ্টি হবে। সবসময় মনে রাখবেন, পৃথিবী সাহসী মানুষের জন্যে।

প্রশ্ন : শিক্ষার্থী জীবনে একজন অবিবাহিতা ছাত্রীর জন্যে কোনো বিবাহিত মেধাবী ছাত্রের বাসায় পড়াশোনার ব্যাপারে ফোন করাও কি অন্যায়? আমাকে

সেই ছাত্রের স্ত্রীর কাছে শুনতে হয়েছে, 'আপনি কি মেয়ে নন? আপনি কেন ফোন করেন? আপনার লজ্জা করে না?' আমি স্তম্ভিত বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম তার এমন আচরণে। উপযুক্ত পরামর্শ চাই।

উত্তর : স্থানকালপাত্র বিবেচনা করে আচরণ করা উচিত। যদি সেই মেধাবী ছাত্রের সাথে যোগাযোগ করতেই হয়, তাহলে তা করতে হবে তার স্ত্রীর মাধ্যমে। আপনাকে বুঝতে হবে কীভাবে যোগাযোগ করবেন, যেন তার স্ত্রী নিজেই সাহায্য করার জন্যে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তা না হলে তাদের পারিবারিক জীবনে অশান্তি তৈরি হবে।

আমরা আসলে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেখতে চাই। অন্যের অবস্থান থেকে চিন্তা করি না। সেভাবে চিন্তা করলে এ প্রশ্ন আসত না। কারণ কোনো মহিলাই তার স্বামীর সাথে অবিবাহিতা কেন, বিবাহিতা মেয়ের সম্পর্কও পছন্দ করবে না। তাছাড়া আরো তো অনেক মেধাবী সহপাঠী আছে, বিবাহিত ছাত্রের সাথেই কেন যোগাযোগ করতে হবে। তার মানে হয়তো এখানে লেখাপড়াটাও অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। হতে পারে লেখাপড়াটা একটা বাহানা।

এরকম বোকামি কেউ করতে যাবেন না। একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটকে সবসময় চিন্তা করতে হবে, তার আচরণের স্থানকালপাত্র ঠিক আছে কিনা। কার সাথে যোগাযোগ করা সমীচীন আর কার সাথে না করাটা সমীচীন, তা নিজেদের বুঝতে হবে। তাহলেই এ ধরনের সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন : যাদের বিয়ে হয় নি, তারা বিয়ের জন্যে কেন মনছবি দেখছি না, কেন হিলিংয়ে নাম দিচ্ছি না, বিয়ে হলেও তাড়াতাড়ি বাচ্চা কেন নিচ্ছি না, এ ধরনের কথা বলে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে কাউকে ফেলা কি উচিত? আমি আপনার কাছে ভালো ও কল্যাণকর বিয়ের জন্যে দোয়া চাচ্ছি।

উত্তর : আমরা আপনার জন্যে দোয়া করছি। কিন্তু যিনি এ ধরনের প্রশ্ন করেন এবং উপযাচক হয়ে কাউকে ব্যক্তিগত বিষয়ে কিছু বলতে যান, তিনি মানুষের বিরক্তি উৎপাদনকারী। আসলে তার নিজের মনের মধ্যে অনেক কালিমা রয়েছে। আরেকজনকে হেয় করা এবং ছোট করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য।

সবসময় মনে রাখবেন, কেউ কোনো ব্যাপারে পরামর্শ না চাইলে তাকে পরামর্শ দেয়া অপরাধ। একজন বিয়ে করবে কি করবে না, বাচ্চা হবে কি হবে না, বাচ্চা নেবে কি নেবে না, এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যরা তো জানে না—কেন তার বাচ্চা হচ্ছে না।

এসব প্রশ্ন করে কাউকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলাটা অন্যায়। এটা অশুদ্ধাচার। যদি কারো মনে হয় যে, আহারে অমুকের বিয়ে হচ্ছে না, অমুকের বিয়ে হলেও বাচ্চা হচ্ছে না, তার জন্যে সে মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারে। কিন্তু তাকে কখনো কোনো পরামর্শ বা খোঁচা দেয়া যাবে না। কারণ এতে মানুষ মনে কষ্ট পায়। আর কাউকে কষ্ট দেয়াটা একটা ঋণ। তিনি ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহও ক্ষমা করেন না।

প্রশ্ন : আমার কাছে এক বন্ধু তার জীবনের একটা স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে পরামর্শ চাচ্ছে। বিষয়টা হলো সে পুরুষে পুরুষে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী (এমএসএম) গ্রুপের একজন। পুরুষ হলেও সে মেয়েদের প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করে না। তার পরিবার তাকে বিয়ে করাতে চাচ্ছে। কিন্তু সে কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে না। সে অলরেডি একটা ছেলের সাথে রিলেশনে আছে। সে শুধু তার মাকে এটা জানিয়েছে। তার মা নাকি বলেছে, তাদের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করার পর সব ঠিক হয়ে যাবে। এ নিয়ে তার বাসায় থমথমে অবস্থা। এতদিন আমি তার মধ্যে এমন কিছু খেয়াল করি নি যে, সে এলজিবিটিকিউ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। আপনার মতামত জানবেন প্লিজ।

উত্তর : এটা নতুন কিছু নয়। এটা নিয়ে কোরআনে বহু আগেই সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কুকর্ম হিসেবে এটার অবধারিত শাস্তি সম্পর্কেও মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। শুধু ইসলাম ধর্ম নয়, সব ধর্মগ্রন্থে এসেছে যে, সমকামিতা একটি গুরুতর পাপ।

সূরা আরাফ-এর ৮০-৮১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আর আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের কাছে। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা এমন বেহায়ার কাজ করছ, যা এর আগে দুনিয়ায় কেউ করে নি। তোমরা তো কাম-নিবৃত্তির জন্যে নারী বাদ দিয়ে পুরুষের কাছে যাচ্ছ! তোমরা নিশ্চিতই সীমালঙ্ঘনকারী।’

‘ওরা আগে থেকেই কুকর্মে (সমকামিতায়) আসক্ত ছিল’ (সূরা হুদ, আয়াত ৭৮)। সূরা আম্বিয়ার ৭৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘আমি লূতকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম। তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যার অধিবাসীরা কুকর্মে (সমকামিতায়) লিপ্ত ছিল। মূলত ওরা ছিল বিকৃত, ভ্রষ্ট ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (আমি ওদের ধ্বংস করেছিলাম)।’

এরকম আরো অনেক বর্ণনা আছে। অতএব পুরুষে পুরুষে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারীদের নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই—যাদেরকে কোরআনে

স্পষ্টভাবে বিকৃত, ভ্রষ্ট ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায় হিসেবে বলা হয়েছে। আর যেটা বলতে পারি সেটা হলো, এরকম কারো তথ্য গোপন করে বিয়ে করানোটা একটা জঘন্য অপরাধ। কোনো মা জেনেশুনে আরেকটা ইনোসেন্ট মেয়ের জীবন নষ্ট করবেন না। বিয়ের আগেই মেয়েটাকে ছেলের অবস্থা জানাতে হবে। এরপরও মেয়ে রাজি হলে ভিন্ন কথা।

আর সন্তান বিয়ের জন্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত নয় জেনেও মায়ের জোর করাটা উচিত নয়। জোর করে কোনো সন্তানকে বিয়ে কেন, কোনোকিছুই করানো উচিত নয়। এর ফল কখনো ভালো হয় না। কারণ বিয়ে করলে সব ঠিক হয়ে যাবে, এমন না-ও হতে পারে।

আমাদের কাছে এরকম ঘটনাও এসেছে যে, খুব ঘটা করে দুজনের বিয়ে হলো। দুই পক্ষের শিক্ষা, অর্থ, সামাজিক অবস্থান সবই ভালো। কিন্তু বিয়ের তিন মাস পরও মেয়েটা দেখল যে, তার স্বামীর সাথে কোনো সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে না। তখন তারা হানিমুনে গেল। সেখানে গিয়ে ছেলেটা তাকে জানাল যে, পরিবার তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করিয়েছে। মেয়েদের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। তাদের বিয়ের আগে থেকেই তার ছেলেসঙ্গী আছে এবং সে ওই সঙ্গীর সাথে থাকতেই পছন্দ করে। হানিমুন থেকে ফিরে এসে মেয়েটা ডিভোর্স দিয়েছে সেই ছেলেকে।

কানাডা, স্পেন, নেদারল্যান্ডস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমলিঙ্গের সম্পর্ক এমনকি বিয়েও বৈধ। পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণে ও উৎসাহে আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদের একটা অংশ এলজিবিটিকিউ (লেসবিয়ান, গে, বাই-সেক্সুয়াল, ট্রান্স জেন্ডার এবং কুইয়ার/ কোয়েশ্চনিং)—এসব দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কিন্তু আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই—এটা নৈতিকতাবিরুদ্ধ, ধর্মবিরুদ্ধ, প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণ।

আমাদের দেশে এটা আইনসম্মতও নয়। ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী সমকামিতা বা অপ্রকৃতিস্থ যৌনাচার দণ্ডনীয় অপরাধ। এর জন্যে ১০ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। কিছু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এর শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ড!

সমলিঙ্গের কাউকে যদি ভালোও লাগে, তাকে শারীরিকভাবে কামনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। ধরুন, কারো কাছে একটা দামী কিছু দেখে সেটা পাওয়ার ইচ্ছা মনে জাগলেই কি সেটা নেয়া যাবে? এরকম যে-কোনো গর্হিত কাজ থেকে আমরা যেভাবে নিজেকে সংবরণ করি, তেমনি এই মহাপাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসা এবং কাউন্সেলিং নিতে হবে। নইলে প্রকৃতির শাস্তি কিন্তু বড় নির্মম!

প্রশ্ন : একজন সতী নারী আমার জীবনে আসবে, এই বাসনা লালন করে আমি সারাজীবন কোনো সম্পর্কে জড়াই নি, জড়াবও না। কিন্তু কোনো মেয়ে যদি এমন কোনো ভুল করে, যা কাউকে বলা সম্ভব নয় আর সেই মেয়ে যদি আমার জীবনে আসে, তাহলে কী করব? ডিভোর্স হলে তবুও জানাজানি হয়। কিন্তু গোপনে কোনো পাপ করলে বা কারো দ্বারা অ্যাবিউজড হলে সেটা তো জানা সম্ভব হয় না। বিয়ের পরে যখন তার সবই জানলাম, তখন তো আমার কিছুই করার থাকবে না। তখন কি আমাকে কোনো সমাধানমূলক কথা প্রশান্তি দিতে পারবে? মনে কিছুটা হতাশা তো কাজ করবেই। দয়া করে বলবেন বিষয়টি আপনার দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : কারো অতীতে কী ঘটেছিল এটা আপনার জানার প্রয়োজনটা কী? আপনার দরকার তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। সবকিছু জানতে চাইবেন না। অনেক কিছু জানার চেয়ে না জানা ভালো। আল্লাহর রসুল পর্যন্ত পানাহ চেয়েছেন যে, উপকারী নয় এমন সমস্ত জ্ঞান থেকে প্রভু আমাকে পানাহ দাও। আসলে যেটা জানার মধ্যে আপনার কোনো কল্যাণ নেই সেটা জানতে চাওয়াটা বোকামি। নারী হোন অথবা পুরুষ, অনেকে এই ভুল করে যে, বিয়ের প্রথম রাতে অতীতের সব বলে দেয়। এতে বরং সঙ্গীর মনে আরো সন্দেহ তৈরি হয় যে, আচ্ছা, শুধু এটুকুই, নাকি আরো কিছু ছিল?

কখনো সঙ্গীর অতীত জানতে চাইবেন না এবং নিজের অতীতের কোনো সম্পর্কের কথাও বলতে যাবেন না। আল্লাহ যা গোপন রেখেছেন সেটা গোপন থাকতে দেবেন। ডিভোর্স আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু ভুল তো আল্লাহ প্রকাশ করেন নি। আপনি কেন সেটা প্রকাশ করতে যাবেন? কারণ কিছু ভুল আছে, যেটা সংশোধন করার সুযোগ নেই। সেটা নিয়ে যত ঘাটাঘাটি করবেন তত দুর্গন্ধ ছড়াবে। আপনার জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জীবনসঙ্গীও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুটো পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সবসময় মানুষকে সম্মান করবেন, বিশ্বাস করবেন। ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। যত আপনি সহনশীল সহমর্মী ও ক্ষমাশীল হবেন, তত আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীলতা পছন্দ করেন। খুঁতখুঁতানি পছন্দ করেন না। কখনো কোনো ব্যাপারে এরকম খুঁতখুঁতে হবেন না। খুঁতখুঁতে মানুষ কখনো সুখী হয় না। আর নিজের ভুলের কথাও অন্যকে বলে বেড়াবেন না। শুধু ক্ষমা চাইবেন, আন্তরিক অনুশোচনা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। নবীজীর (স) সামনে একজন মহিলা এসে বললেন যে, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার ব্যভিচার হয়ে গেছে।

নবীজী (স) না শোনার ভান করে আরেকজনের সাথে কথা বলছেন। মহিলা আবার বলল, আমার এই পাপের জন্যে আমায় শাস্তি দিন। এভাবে তৃতীয় বার বলার পর নবীজী (স) সাড়া দিলেন। মহিলা বললেন, আমি শাস্তি কামনা করছি, যাতে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন। মহিলা তখন প্রেগনেন্ট। তাই নবীজী (স) বললেন যে, সন্তান জন্মদানের পর তুমি এসো। সন্তান হওয়ার পরে মহিলা যখন এলেন, তখন নবীজী (স) বললেন, শিশুটিকে দুধ খাওয়াও দুই বছর।

দুই বছর পর মহিলা আবার এলেন। তখন নবীজী (স) বললেন যে, তুমি যেহেতু আমাকে সাক্ষী বানিয়ে ফেলেছ এবং পাপের শাস্তি চাচ্ছ, ঠিক আছে, তা-ই হবে। ব্যভিচারের শাস্তির নিয়ম ছিল প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা। সেই শাস্তিই দেয়া হলো। মহিলাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হলো। সেসময় মহিলার রক্তের ছিটা একজনের গায়ে লাগলে সে খুব বিরক্তি দেখিয়েছিল। তার বিরক্তি দেখে নবীজী (স) বললেন, মহিলাটির এই অনুশোচনার রক্ত হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র রক্ত। যদি কোনো তওবাকারী দেখতে হয় তো এই মহিলার দিকে তাকাও। নবীজী (স) নিজে মহিলার জানাজা পড়ালেন।

খেয়াল করবেন, ব্যভিচারের মতো পাপ করার পরও আল্লাহর নবী সেটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দার মতো শাস্তি কামনা করলেন। তিনি মনে করলেন, এই পাপের নির্ধারিত শাস্তি ছাড়া আমার কোনো পথ নেই। এটাই অনুশোচনার একমাত্র পথ। তখন নবীজী (স) তাকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করলেন। দেখুন, তিনি মহিলাকে কত সময় দিয়েছেন!

অতএব সবসময় মনে রাখবেন, অপরাধটা নিন্দনীয়, অপরাধী নয়। একজন মানুষ ভুল করতেই পারে। ভুলের জন্যে সে যখন নিজে অনুতপ্ত হয়, অন্তর থেকে অনুশোচনা করে, তখন সে ততটাই পবিত্র হয়ে যায়, যতটা সে ভুল না করলে পবিত্র থাকত। অর্থাৎ অপরাধী যখন সত্যিকারের অনুশোচনা করে, সে ঠিক আগের মতো পবিত্র হয়ে যায়। এজন্যে মানুষকে মানুষ হিসেবে নেবেন। ভুলভ্রান্তিতে মিলে মানুষ। যত ক্ষমাশীল হতে পারবেন তত আল্লাহর ক্ষমা পাবেন। যত একজনের গোপন ভুলটাকে আপনি গোপন রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার ভুলত্রুটি গোপন রাখবেন।

প্রশ্ন : আমি দাম্পত্য জীবনে সুখী। তারপরও আমার কেন যেন বেঁচে থাকতে ভালো লাগে না। আমি আল্লাহকে বলি, আমাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যাও। আমার এই চাওয়াটা অন্যায় হচ্ছে কিনা? মানসিকভাবে ভালো থাকার জন্যে আমি কী করতে পারি?

উত্তর : বিবাহিত, দাম্পত্য জীবনে সুখী, তারপরও বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না! কথায় আছে 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়'। আপনার অবস্থা হয়েছে তা-ই। আসলে আপনার কোনো কাজ নেই। যে কারণে আপনি বাঁচার প্রয়োজনীয়তা ও উদ্যম অনুভব করছেন না। কারণ প্রত্যেকটা মানুষ এটা অনুভব করতে চায় যে, পৃথিবীতে তাকে প্রয়োজন। সে যখন অনুভব করে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই, এটাই হচ্ছে তার জীবনের সবচেয়ে বিষণ্ন মুহূর্ত। অর্থাৎ মানুষ যত আরামের মধ্যেই থাকুক, তার যদি কিছু করার না থাকে, সে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না।

আপনি যেহেতু সবদিক থেকে সুখী, এখন নিয়মিত সাদাকায়নে আসুন। অন্যের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করুন। দেখবেন যম এলেও আপনি বলছেন, আমি একটু সাদাকায়নটা শেষ করি। মানুষের জন্যে কাজ করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা শুধু আমাদের কথা নয়, সাম্প্রতিককালের চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও মনোবিদদের চমকপ্রদ সব গবেষণা প্রতিবেদনগুলোও একথাই বলছে।

প্রতিদানের প্রত্যাশা ছাড়াই চারপাশের মানুষ ও সমাজের কল্যাণে যারা নিয়মিত কাজ করেন, তাদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা বাড়ে। কমে হতাশা ও একাকিত্বের অনুভূতি। তাদের পেশাজীবনেও সৃষ্টি হয় অনবদ্য সাফল্য-সম্ভাবনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, চিকিৎসকদের উচিত সুস্থতার জন্যে রোগীদের সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণে কাজ করার পরামর্শ দেয়া।

সাইকোলজি টুডে সাময়িকীর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্যের কল্যাণে কাজ করে যে নির্মল সুখানুভূতি আমরা লাভ করি, তাতে সেরোটনিন-এন্ডোরফিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটার ও হরমোনের প্রবাহ বাড়ে। ফলে বিষণ্নতা-দুশ্চিন্তার মতো নেতিবাচক আবেগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে। সেইসাথে বাড়ে রোগ প্রতিরোধ শক্তি। সংহত হয় আবেগীয় ভারসাম্য। আর মানবকল্যাণে কাজ স্ট্রেস কমায় বলে তা মানুষের রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

অতএব আপনি মন ভালো রাখার জন্যে কোয়ান্টামে একাত্ম হয়ে মানুষের কল্যাণে—পরার্থে কাজ করুন। যতদিন জীবন আছে—শুকরিয়ার সাথে সৃষ্টির সেবায় কাজ করুন। এতে করে মৃত্যুর পরও আপনার সৎকর্মের মধ্য দিয়ে আপনি বেঁচে থাকবেন, আপনার পদচিহ্ন রেখে যেতে পারবেন। মনে রাখবেন, জীবনটা কর্মের জন্যে। আর ভালো কাজের মধ্যে বেঁচে থাকলেই জীবন আনন্দময় হয়, সার্থক হয়।

বিবাহ কণিকা

- ☐ বিয়ে হোক প্রতিদিন একই ব্যক্তির সঙ্গে নতুন করে প্রেমে পড়া।
- ☐ নিঃশর্ত ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার নামই প্রেম। এই প্রেমই মানুষের ভেতরের ভালো সত্তাকে জাগ্রত করে।
- ☐ মা-বাবার সম্মতি ও দোয়া ছাড়া বিয়ে কখনো সুখের হয় না। সেখানে সবসময় একটা শূন্যতা থেকে যায়।
- ☐ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকলে জীবনের যে-কোনো পর্যায়ে বিয়ে করা যেতে পারে।
- ☐ বিয়ের আগেই বিবাহ-পরবর্তী আচরণে জড়াবেন না।
- ☐ বিয়ে পারিবারিকভাবে অভিভাবকের সম্মতিতে হওয়া উচিত। তবে বিয়ে করবে কিনা, আর করলে কাকে করবে সে ব্যাপারে ছেলে/ মেয়ের সিদ্ধান্ত বা পছন্দ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
- ☐ জোর করে বিয়ে দেয়া খুন করার চেয়েও বড় অপরাধ। বিয়েতে ছেলে/ মেয়ের শারীরিক বা মানসিক অনাগ্রহ বা অক্ষমতা বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।
- ☐ প্রতিটি মানুষই আলাদা। কিন্তু চেতনা ও জীবনদৃষ্টির সাথে মিল রয়েছে—এমন কাউকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করুন।
- ☐ এমন কাউকে বিয়ে করুন যাকে আপনি সম্মান করতে পারবেন, সহযোদ্ধা হিসেবে সবসময় পাশে পাবেন।
- ☐ মেয়ে ফর্সা, সুন্দরী, কম বয়সী আর ছেলে ভালো বেতনের চাকুরে, প্রবাসী বা পয়সাওয়ালা ব্যবসায়ী—বিয়ের পাত্র/ পাত্রী পছন্দে সবচেয়ে খোঁড়া যুক্তি।
- ☐ সম-সামাজিক, সম-সাংস্কৃতিক, সম-আর্থিক ও সম-ধর্মীয় পরিমণ্ডলের এমন কাউকে বিয়ে করুন, যার সম্পর্কে আপনি জানেন।
- ☐ বিয়ের ব্যাপারে আকাশকুসুম কল্পনা করবেন না। কাল্পনিক বর বা কনের আদলে কাউকে বিচার করবেন না। বাস্তবতা এবং কল্পনায় প্রায়ই অনেক ফাঁক থাকে।
- ☐ সিনেমার নায়ক/ নায়িকা বা কাল্পনিক চরিত্রের আসনে স্বামী/ স্ত্রীকে বসাবেন না। বাস্তবতাকে সহজভাবে মেনে নিন।

- ☐ নারী অর্ধেক নয়, পরিপূরক—মনে করলেই পরিবারে পূর্ণ একাত্মতা সৃষ্টি হবে।
- ☐ বিয়ের সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। পাত্র/ পাত্রী পক্ষের লৌকিক আচরণ দেখেই মুগ্ধ হবেন না। সব ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিন।
- ☐ বিয়ের সময় মেয়ে ছাড়া শ্বশুরবাড়ি থেকে একটি সুতো নেয়াও যৌতুক। যৌতুক নেয়া কাপুরুষতা। যৌতুক গ্রহণকারী পুরুষ নামের যোগ্য নয়। প্রতিটি পুরুষের উচিত সবিনয়ে তা ফিরিয়ে দেয়া।
- ☐ যৌতুক নেয়া যেমন অপরাধ তেমনি দেয়াও অপরাধ। এতে নিজেদের মেয়েকে ও পরিবারকেই অপমান করা হয়।
- ☐ বিয়ের আয়োজনে খরচের প্রতিযোগিতায় নামবেন না। যে বিয়েতে ধুমধাম ও অপচয় যত বেশি, সে বিয়েতে সুখের পরিমাণ তত কম।
- ☐ একটিমাত্র বিয়েতে একাধিক অনুষ্ঠান করে টাকার শ্রাদ্ধ করবেন না। ঋণ করে হলেও বিয়ের এ লৌকিকতা পরিবারকে দুর্দশায় নিপতিত করে।
- ☐ বিয়ের তারিখ ভুলে যাবেন না। বিয়েবার্ষিকী বা যে-কোনো উৎসবে স্ত্রী/ স্বামীকে আপনার সামর্থ্যের মধ্যে উপহার দিন।
- ☐ আপনার জীবনসঙ্গী/ সঙ্গিনীকে বিয়ের প্রথমদিন থেকেই দিনে অন্তত একবার বলুন, 'আমি তোমাকে ভালবাসি'।
- ☐ চাওয়া এবং প্রত্যাশার মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিবারকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। তাই সুখী পরিবারের জন্যে পারিবারিক মনছবি নির্মাণ করুন। যে-কোনো প্রতিকূলতা অতিক্রমে এ মনছবি প্রেরণা জোগাবে।
- ☐ পারস্পরিক ইতিবাচক ও ভালো ধারণাগুলোকে সবসময় লালন করুন। বাস্তবেও সম্পর্ক হবে ইতিবাচক।
- ☐ স্বামী/ স্ত্রীর ব্যাপারে অহেতুক খুঁতখুঁতে হবেন না। কঠোর ভাষায় কখনো তার ভুল ধরিয়ে দেবেন না। ভুলগুলোকে সময়-সুযোগমতো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিন।
- ☐ শুধু জৈবিক প্রয়োজন পূরণ বা বংশধারা রক্ষা নয়, আত্মিক-আধ্যাত্মিক চেতনা সুখী পরিবারের অন্যতম ভিত্তি। প্রথমটি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়ায়। আর দ্বিতীয়টি দেয়ার আকুতি সৃষ্টি করে।
- ☐ স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে কখনো সুখী হওয়া যায় না। সচেতনভাবে নিজ পিতৃ-পরিবারের সাথে বাহ্যিক সম্পর্ক যতই ছিন্ন করুন না কেন, ভেতরের সম্পর্ক থেকেই যায়।

- ☐ চুক্তির স্থায়িত্ব সবসময় নির্ভর করে সততা ও বিশ্বস্ততার ওপর। বিয়েও একটি চুক্তি। এ চুক্তিতে প্রতারণা বা তথ্যের গোপনীয়তা পরে অশান্তি বা বিচ্ছেদের কারণ হতে পারে।
- ☐ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করুন। একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে শোভন আচরণের সীমাকে বজায় রাখুন।
- ☐ সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু সম্পর্ক বর্জন করুন। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এমন সম্পর্ক এড়িয়ে চলুন।
- ☐ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বলে তাকে খোঁটা দেবেন না, কটুকথা শোনাবেন না। তার প্রতি সমমর্মিতা পোষণ করুন।
- ☐ বিয়ে বিলম্বিত হচ্ছে বলে হতাশ হবেন না। হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না। চেহারা, গুণ, যোগ্যতা—সব মিলিয়ে আগে নিজেকে নিজে গ্রহণ করুন। এতে অন্যদের কাছেও আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।
- ☐ বর্তমানকে নিয়ে বাঁচুন। অতীতে আপনার কী কষ্ট ছিল বা কী পান নি তা নিয়ে আফসোস না করে বর্তমানকে আনন্দময় করে তুলুন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করুন।
- ☐ রূপের প্রশংসা সাময়িক। গুণের কদর চিরন্তন। তাই গুণকে বিকশিত করুন। পরিবারে ও পরিবারের বাইরে আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে।
- ☐ প্রতিটি ছেলে এবং মেয়ের শিকড় তার বাবা-মায়ের পরিবার। অতএব বিয়ের কারণে একটি মেয়ে তার শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

বিয়ের অনুষ্ঠানে নবদম্পতির জন্যে প্রার্থনা

হে মহামহান স্রষ্টা!
তুমি সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছ।
হে মহামিলনের মালিক! নবদম্পতির বন্ধনকে তুমি
আনন্দময় স্থায়ী আত্মিক মিলনে রূপান্তরিত করো।
পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত ও সমমর্মী থাকার তওফিক তাদের দান করো।
উভয় পরিবারের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা সৃষ্টি করো।
তাদের মানবীয় গুণাবলিতে প্রোজ্জ্বল মেধাবী সন্তান দান করো।
তাদের পরিবারকে সমৃদ্ধ ও সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত পরিবারে
রূপান্তরিত করো। আমিন!

বিয়ের কিছু শুদ্ধাচার

- ☐ পাত্র/ পাত্রী পছন্দের ক্ষেত্রে মুরুব্বি/ আত্মীয়-পরিজনের সাহায্য বা পরামর্শ নিন। তবে নিজে পাত্র/ পাত্রীকে সরাসরি দেখুন, কথা বলে সিদ্ধান্ত নিন।
- ☐ পাত্র/ পাত্রীর রূপ, সম্পদ ও সামাজিক অবস্থানের চেয়েও গুরুত্ব দিন সুশিক্ষা, আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে। খোঁজ নিন, তিনি জুয়া মাদক ঋণ ও ভার্চুয়াল ভাইরাস-সহ যে-কোনো ধরনের আসক্তি থেকে মুক্ত কিনা।
- ☐ বিয়ে করার সাথে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। শারীরিক-মানসিক ও আইনগতভাবে সাবালক হলে আপনি আপনার প্রয়োজনমতো সময়ে বিয়ে করতে পারেন।
- ☐ পাত্র/ পাত্রীর নিকটাত্মীয় বা প্রতিবেশী হিসেবে কেউ আপনার কাছে পাত্রী/ পাত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে আপনি যতটুকু জানেন, ততটুকুই বলুন। অতিপ্রশংসা বা অহেতুক নিন্দা—কোনোটিই করবেন না।
- ☐ পাত্র/ পাত্রীর বায়োডাটা ও ছবি দেখেই পছন্দ বা নাকচ করবেন না। অভিভাবকদের কেউ তার সাথে দেখা করে এলে সে অভিজ্ঞতা শুনুন। তারপর নিজে দেখা করবেন কিনা সিদ্ধান্ত নিন। ছবি আর কাগজের তথ্যের চেয়ে বাস্তব মানুষটির সাথে সাক্ষাৎ আপনার সিদ্ধান্ত নেয়াকে সহজ করবে।
- ☐ পাত্র/ পাত্রীর বায়োডাটা দেখে উভয়ের সম্মতি থাকলে এপয়েন্টমেন্টের ভিত্তিতে সামনাসামনি দেখার ব্যবস্থা করুন। হঠাৎ করে পাত্র বা পাত্রীর কর্মক্ষেত্রে/ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তাকে অপ্রস্তুত করবেন না।
- ☐ দেনমোহর স্ত্রীর কাছে স্বামীর ঋণ। এটি পাত্রের সাধ্যের মধ্যে নির্ধারণ করুন। দাম্পত্য জীবন শুরুর আগে দেনমোহর পুরোপুরি শোধ করুন। বাস্তব কারণে সম্ভব না হলে স্বল্পতম সময়ে স্ত্রীকে তা পরিশোধ করুন।
- ☐ বিয়ের নিমন্ত্রণ মুখে জানানোই যথেষ্ট। সেইসাথে টেক্সট মেসেজ বা ই-মেইলও করে রাখতে পারেন। আর কার্ড করতে চাইলে পরিমিত খরচ করুন এবং তা সরাসরি সাক্ষাৎ করে দিন।
- ☐ দাওয়াত করলে পুরো পরিবারকে করুন। পরিবারের একজন/ দুজন বা শুধু স্বামী-স্ত্রীকে দাওয়াত দেয়ার মানসিকতা পরিহার করুন। নিজেরাও পারতপক্ষে এ ধরনের দাওয়াতে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকুন।

- ☐ বিয়ের দিনটি হলো দায়িত্বপূর্ণ দীর্ঘ যাত্রার প্রথমদিন। তাই শুধু বিয়ের দিনটির সব আয়োজন, জল্পনা-কল্পনায় বিভোর না হয়ে বিবাহিত জীবন কীভাবে সুন্দর করা যায় তা নিয়ে ভাবুন।
- ☐ বিয়ের অনুষ্ঠানে বর-কনের উপস্থিতি, অতিথি আপ্যায়ন ও যাবতীয় আয়োজনে নির্ধারিত সময়সূচি অনুসরণ করুন।
- ☐ বিয়ের আনুষ্ঠানিকতায় জাঁকজমক করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হবেন না এবং অপচয় করবেন না। মনে রাখুন, যে বিয়েতে অপচয় ও হইহল্লা যত বেশি সে বিয়েতে সুখের পরিমাণ তত কম।
- ☐ বিয়েতে একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে অর্থের অপচয় না করে দুপক্ষ মিলে যৌথ খরচে একটি অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করুন।
- ☐ বিয়ে জীবনের একটি সহজ-স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু মিডিয়া, পণ্য আগ্রাসন, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক কুসংস্কার একে করেছে জটিল ও ভারাক্রান্ত। সুখী হতে হলে অপ্রয়োজনীয় লোকাচার ও সংস্কার বর্জন করুন।
- ☐ বিয়েতে অঢেল খরচ করলে সমাজের কাছে মাথা উঁচু হবে আর না করলে 'ছোট মনের' পরিচয় ফুটে উঠবে, সবাই খোঁটা দেবে—এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসুন।
- ☐ বিয়ের অনুষ্ঠান ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম ও ফটোগ্রাফারের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেবেন না। বর-কনে শুধু নিজেদের ছবি তোলায় ব্যস্ত না থেকে অতিথিদের শুভকামনা ও দোয়া নিতে মনোযোগী হোন।
- ☐ অনুষ্ঠানের ভেন্যু নির্বাচনে মেহমানের সংখ্যা বিবেচনা করুন।
- ☐ অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণপত্রের সময়সূচি অনুসরণে আন্তরিক হোন।
- ☐ আত্মীয়স্বজন বিয়েবাড়িতে রাত্রিযাপন করলে তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখুন।
- ☐ অতিরিক্ত মেহমান চলে এলে অস্থিরতা বা বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। একে বাড়তি বরকত বা আশীর্বাদ মনে করুন।
- ☐ বিয়ের অনুষ্ঠানে উভয়পক্ষই নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি অতিথি বা বরযাত্রী নেয়া থেকে বিরত থাকুন। তবে কোনো কারণে অতিথির সংখ্যা অতিরিক্ত হয়ে গেলে আগেই মেজবানের সম্মতি নিন।
- ☐ সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্যে স্রষ্টার রহমত সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই

অনুষ্ঠান আয়োজন করতে গিয়ে প্রাত্যহিক ইবাদত/ উপাসনায় যাতে ছেদ না পড়ে, সেদিকে নজর রাখুন।

- ☐ বিয়েতে উপহার না দেয়ার জন্যে নিমন্ত্রিতদের অনুরোধ করুন। তারপরও কেউ উপহার নিয়ে এলে তা এমন কাউকে দিয়ে দিন যার প্রয়োজন আছে।
- ☐ বিয়ের আনন্দের সাথে মিষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই। তাই বিয়ের অনুষ্ঠানে ও অতিথি আপ্যায়নে কাউকে 'মিষ্টি' নামের 'বিষ' না খাইয়ে মৌসুমি ফল, খেজুর বা বাদাম পরিবেশন করুন।
- ☐ কাবিন/ আকদ হয়ে যাওয়ার পর বর-কনের একসাথে থাকতে কোনো বাধা নেই। তাই পরে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা থাকলেও কাবিন হয়ে গেলে কনেকে (বরপক্ষের) বাড়িতে নিয়ে আসুন।
- ☐ বিয়ের অনুষ্ঠানে অবিবাহিত কাউকে 'বিয়ে করেন নি কেন/ বিয়ে হচ্ছে না কেন'—এ ধরনের বিব্রতকর প্রশ্ন করবেন না। উপযুক্ত পাত্র/ পাত্রীর খোঁজ জানা থাকলে পরবর্তী সময়ে তার অভিভাবকদের সাথে কথা বলুন।
- ☐ বর-কনের গায়ের রং, চেহারা, উচ্চতা, বয়স, ডিগ্রি, সামাজিক মর্যাদা, সাজসজ্জা, পোশাক ও আপ্যায়নের ভুলত্রুটিসহ সব ধরনের নেতিবাচক আলাপ থেকে বিরত থাকুন।
- ☐ কারো বিয়ের দাওয়াত না পেলে পরবর্তী সময়ে দেখা হলে কখনো রসিকতা করেও এ প্রসঙ্গ তুলবেন না। বরং বিয়ের খবরে যে খুশি হয়েছেন, তা বলুন। নবদম্পতির জন্যে দোয়া করুন।
- ☐ বিয়ের পরে স্বামী/ স্ত্রী শুধু নিজেদের মধ্যে নয়, দুই পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথেও সময় কাটান। তাদেরকে বোঝার চেষ্টা করুন। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক সুন্দর হবে।

প্রিয় পাঠক,

এ বইয়ের কোনো বিষয় সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে পারেন :

মহাজাতক
যোগ ফাউন্ডেশন
৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
E-mail : info@quantummethod.org.bd

পরিশীলিত মানুষ হতে হলে প্রয়োজন
সঠিক আচার-আচরণ ও করণীয়-বর্জনীয় সম্পর্কে
সুস্পষ্ট ধারণা। এ বিষয়গুলোই **শুদ্ধাচার**
বইতে রয়েছে সহজ-সাবলীল ভাষায়।
পড়ুন। অনুশীলন করুন। শুদ্ধাচারী হোন।
তাহলেই ধীরে ধীরে চারপাশের মানুষের
প্রিয় হয়ে উঠবেন আপনি।

মহাজাতক

শহীদ আল বোখারী মহাজাতক বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক মেডিটেশন ও পজিটিভ লাইফস্টাইল চর্চার পথিকৃৎ। জীবনযাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে ৩৩ বছর ধরে তিনি ৪ দিনে ৪০ ঘণ্টার ৪৯৯+ কোর্সে কোয়ান্টাম মেথড প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন।

তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত নন-ফিকশন গ্রন্থ কোয়ান্টাম মেথডসহ তার রচিত সবগুলো বই ব্যাপকভাবে পাঠক সমাদৃত হয়েছে।

২০১৪ সালে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী এবং ২০২১ সালে হাদীস শরীফ বাংলা মর্মবাণী প্রকাশিত হওয়ার পর তা পেয়েছে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা।

কোয়ান্টাম ভালো ভাবার, ভালো বলার,
ভালো করার, ভালো থাকার বিজ্ঞান।
আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

কী চান আপনি?
আত্মবিশ্বাস? অস্থিরতা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও
বিষণ্নতা থেকে মুক্তি? প্রশান্তি? সুস্বাস্থ্য? বর্ণিল জীবন?
উপচে-পড়া প্রাচুর্য? ঈর্ষণীয় অর্জন? সুখ?

চাওয়া যা-ই হোক, আসুন, মেডিটেশন চর্চা করুন।
মাইন্ড সেট করুন। আপনার মধ্যে বিশ্বাস ও
ইতিবাচক শক্তির স্ফুরণ ঘটবে।

আপনি অর্জন করবেন
নিজের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করার সামর্থ্য।
চারপাশের মানুষ ভাবতে শুরু করবে—
আপনি সৌভাগ্যের বরপুত্র। আপনার আন্তরিক চাওয়া
স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিণত হবে পাওয়ায়।

লাখো মানুষের মতো আপনিও বলবেন—
ইনশাআল্লাহ সব সম্ভব!
আপনার কণ্ঠেও ধ্বনিত হবে—
ভালো মানুষ ভালো দেশ! স্বর্গভূমি বাংলাদেশ!

quantummethod.org.bd

978-984-35-8445-8

978-984-35-8445-8